১ম বর্ষ] ১৩২৯ [১ম সংখ্যা

সচিত্র পাক্ষিক পত্র

কার্য্যালয়	প্রতিসংখ্যা	বার্ষিক মূল্য ২৵০
২০৮।২এফ্ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	এক আনা	দুই টাকা দুই আনা।

১ম বর্ষ] ১৩২৯ [১ম সংখ্যা

সচিত্র পাক্ষিক পত্র

কার্য্যালয়	প্রতিসংখ্যা	বার্ষিক মূল্য ২৵০
২০৮।২এফ্, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	এক আনা	দুই টাকা দুই আনা।

বৈঠকের নিয়মাবলী

বৈঠকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ দুই টাকা দুই আনা; ভিঃ পিঃ মাশুল স্বতন্ত্র। প্রতি সংখ্যার জন্য এক আনা। নমুনারও মূল্য লাগে। যে কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া চলে। মূল্য সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়।

রিপ্লাইকার্ড কিংবা টিকিট না পাঠাইলে কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রবন্ধাদি বৈঠকের দুই পৃষ্ঠা বড় জোর আড়াই পৃষ্ঠা অপেক্ষা দীর্ঘ না হয়। টিকিট পাঠাইলে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে কিনা তাহা জানানো হয়। মনোনীত অথবা অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত পাঠান হয় না।

বিজ্ঞাপন

মলাটের চারের পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যা—৮৲
অন্যান্য পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যা—৬৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—৩৷৹

কলমের প্রতি ইঞ্চি একবৎসরের চুক্তিতে প্রতিসংখ্যা—১৲

কল[illegible] প্রতি ইঞ্চি প্রতিসংখ্যা—২৲

[illegible]জ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়

ম্যানেজার বৈঠক
২০৮।২ এফ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বৈঠক

১ম বর্ষ]　　১৫ই আষাঢ়, ১৩২৯　　[১ম সংখ্যা

গাল-গল্প

জপেন। গুরুদাস দিব্যি একটা টুপি মাথায় দিয়েছে হে, দেখছো?

গজেন। দেখেছি, কিন্তু দোকানদার এখনও টুপির দাম পায়নি।

জপেন। একেই বলে দেনায় মাথা বিক্রী।

অভিলাষ। গণৎকার বলে দিয়েছে যে, যোগীনের ভবিষ্যতটি একেবারে অন্ধকার।

হরিদাস। গণৎকার বোধহয় যোগীনের ভাবী পত্নীর রংয়ের কথা জানতে পেরেছে।

নরেন আর সুরেন এক মেসে এক ঘরে থাকে। সেদিন রাতে বাতি নিবিয়ে দেবার কিছু পরে সুরেন ডাকলে—নরেন ভায়া জেগে আছ?

নরেন। হ্যাঁ ভাই কি বলতো?

সুরেন। আমায় গোটা পাঁচেক টাকা দিতে পার?

নরেন। আমি ঘুমিয়ে পড়েছি ভাই।

ভুলো সেদিন ইস্কুল পালিয়ে সারাদিন মাছ ধরে, পুকুরে নেয়ে বিকেল বেলায় বাড়ীতে আসা মাত্র তার মা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—ভুলো আজ তোর চোখ এত লাল কেন রে?

ভুলো। টিফিনের সময় আমরা আজ কানামাছি খেলেছিলুম কিনা—

(ভুলোর মা নিকটে এসে তার গা শুঁকে)—তোর গা দিয়ে এত আঁসটে গন্ধ বেরুচ্ছে কেন রে?

ভুলো। আজ আমাদের যে "ধীবর ও জলদেবতা" পড়ানো হোলো।

নফরবাবু। আমার বাবা তাঁর অসাধারণ ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের গুণে বিস্তর সম্পত্তি করেছিলেন। তাঁর অধ্যবসায়ের গল্প একটা শুনবে?

ভাবী জামাই। আজ্ঞে না, তাঁর বিষয় থেকে আমায় কত দেবেন সেইটে শুনেই এবার বিদায় হবো।

স্বামী খেতে বসেছেন, আর স্ত্রী কাছে বসে বাতাস করছেন আর মধ্যে মধ্যে একখানা খবরের কাগজ তুলে তাতে চোখ বুলোচ্ছেন।

স্ত্রী। দেখ লেডলের ওখানে সেল্ হচ্ছে, জুতো বেশ সস্তায় দিচ্ছে।

স্বামী। (ভাতের মধ্যে একখানা জুতোর সুখতলা পেয়ে) লেডলের "সুখতলা-ভাতে" সস্তা হোলেও কিন্তু তোমার হাতের মত মিষ্টি নয়।-

স্ত্রী। ! ! !

সতীনাথ। তোমায় একটা গোপনীয় কথা বলছি, একটা সৎপরামর্শ দিতে হবে।

দুর্গাপদ। কি বলতো?

সতীনাথ। কাল রাতে আমার স্ত্রী আমার মাথায় একটা কাচের প্লেট

দুর্গাপদ। (একটু চিন্তা কোরে) দেখ এবার থেকে কলাই করা প্লেটে কিনো, মাথা ভাঙবে বটে কিন্তু প্লেট বাঁচবে।

বাঙালীর ছেলে জাহাজে চাকরী নিয়েছে। সমুদ্রে জাহাজ পড়ার পর কাপ্তেন তাকে ডেকে হুকুম দিচ্ছে ;—

কাপ্তেন। দেখ এই দড়ির সিঁড়ি বয়ে সব থেকে উঁচু মাস্তুলটায় উঠে হাওয়া কত জোরে বইচে তা দেখ্বে, তারপর এটা থেকে লাফিয়ে ঐ মাস্তুলটায় গিয়ে পড়বে ; সেখানে মাথা নীচু কোরে পা দিয়ে ঐ দড়ির গেরোটা খুলে নিয়ে একটা সমারসল্ট খেয়ে ঐ ছোট মাস্তুলে গিয়ে পড়বে। সেখানে ঐ আংটায় দড়িটা শক্ত কোরে বেঁধে সড়্ সড়্ কোরে নেমে আসবে। এ কাজটা সারা হোয়ে গেলে কোথাও ইয়ার্কি দিতে যেওনা যেন। কাজ সেরেই আমার সঙ্গে দেখা করবে বুঝলে? যাও তাড়াতাড়ি যাও—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? কি চাই আবার—?

বাঙালী ছোকরা। আজ্ঞে একটা দোয়াত, একটা কলম আর এক-টুক্রো কাগজ চাই।

কাপ্তেন। কাজের সময় আবার এ-সব কি হবে?

বাঙালী ছোকরা। আজ্ঞে আমি কাজে

ছুটো খবর

হাওয়া যদি খুব জোরে আর বিপরীত দিকে না বয় তা হোলে সাধারণ পায়রারা ঘণ্টায় অতি সহজেই পঞ্চাশ মাইল উড়ে চলতে পারে।

মার্কিনে "মোটর পুশ বল" নামে এক-রকম নতুন খেলা বেরিয়েছে। এই খেলায় মোটর গাড়ী চালিয়ে একটা বিরাট বলকে ঠেলে ঠেলে প্রতিপক্ষকে গোল দিতে হয়। প্রত্যেক দিকে তিনটে মোটর ও প্রত্যেক মোটরে একজন কোরে লোক থাকে।

কলকাতায় ডকের ও জাহাজের মুটেরা ধর্ম্মঘট কোরে কাজ বন্ধ করায় জাহাজওয়ালা ও অন্য অন্য সওদাগরদের মহা অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। কিন্তু বিলেতে গত এপ্রিল মাসে জাহাজে মাল ওঠা নামা ও অন্যান্য কাজের এক লক্ষ ত্রিশ হাজার লোক শ্রেফ বেকার বসেছিল।

মার্কিনে এক রকম ছাতা বেরিয়েছে তার কাপড়টা টপ্ কোরে বদলে ফেলা যায়। মার্কিন-রমণীরা একই রংয়ের জুতো থেকে আরম্ভ কোরে টুপী পর্য্যন্ত ব্যবহার করছিলেন, এখন থেকে যখন যে রকম পোষাক পরবেন ছাতার কাপড়ের রংও সেই রকম হবে। এই আবিষ্কার করেছেন একটি মার্কিন-রমণী।

গত ১৯১৪ অব্দে দক্ষিণ আফ্রিকার খাদ্যের যে মূল্য ছিল এখন তা থেকে শতকরা উনিশ টাকা, মার্কিনে শতকরা ছত্রিশ টাকা, অষ্ট্রেলিয়ায় শতকরা চল্লিশ টাকা, এবং কানাডায় শতকরা বিয়াল্লিশ টাকা চড়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষে খাবারের দর কর্ত্তাদের মেজাজের ওপর চড়ে ও নামে।

গুরুমশায়ের গল্প

পাড়াগাঁয়ে এক পাঠশালার গুরুমশাই ছেলেদের আঁক কসাচ্ছেন ;—

ছটার দাম কত হবে বল্‌তো ভুতো ?

ভুতো চম্‌কে উঠে ফ্যাল ফ্যাল কোরে পণ্ডিতের মুখের দিকে চেয়ে দু-বার ঢোঁক গিলে বল্লে—কিসের দাম গুরুমশাই ?

গুরুমশাই বল্লেন—যদি চারটে কলার দাম তিন পয়সা হয় তাহলে ছটার দাম কত হবে ?

ভুতো হাঁ কোরে খড়ের চালের দিকে চেয়ে মাথা চুলকুতে লাগলো। পণ্ডিতমশাই খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে শেষে বল্লেন—হুঁ! বুঝেছি তোর বিদ্যে—নে

তারপর পাঠশালার সব ছেলেকেই ওই অঙ্কটা কসতে দিয়ে গুরুমশাই এক ছিলিম তামাক সেজে টিকে ধরাতে চলে গেলেন। কল্‌কেতে ফুঁ দিতে দিতে তিনি ফিরে এসে বল্লেন -কইরে কসেছিস? নিয়ে আয় শেলেট নিয়ে আয়, দেখি কার কত হোলো?—

কোনও ছেলেই ওঠে না, শেষে ভুতো উঠে পেন্সিলটা চুষতে চুষতে শেলেটখানা দু-হাতে তুলে ধরে বল্লে—হয়েছে গুরু মশাই!

—কত রে?

—আজ্ঞে ছটার দাম সাড়ে বারো পয়সা হবে।

—তোমার মাথা হবে! এক গণ্ডা ভুলে মরেছিস্! আঁক তুলতে ভুলেছিস বোধ হয়? আর একবার বল্‌বো?

—বলুন—গুরুমশাই!

—যদি চারটে কলার দাম তিন পয়সা হয়—

বাধা দিয়ে ভুতো বলে উঠলো! এইখানেই যে ভুলে মরেছি গুরুমশাই। আপনি চারটে কলা বলেছিলেন বুঝি? আমি চল্লিশটা কলার দাম কসে ফেলেছি!—

গাঁয়ের জমিদার গদাধর মাইতি সেদিন পাঠশালা দেখতে এসেছেন। [illegible] লেখাপড়া জানেন না, মূর্খ মানুষ, কোনও রকমে বানান কোরে বাংলা খবরের কাগজ পড়তে পারেন। গুরুমশাই তাঁকে খুব খাতির কোরে নিয়ে এসে পাঠশালার দুরবস্থা দেখিয়ে কিছু অর্থ সাহায্য চাইলেন। গদাধর মাইতি খুব গম্ভীর হোয়ে বল্লেন—ছেলেদের পড়াশুনো এখানে কি রকম হয়, না জেনে তো কিছু দিতে পারিনি!

গুরুমশায়ের মুখটি শুখিয়ে গেল, তিনি একটু কাষ্ঠ-হাসি হেসে বল্লেন—বেশ তো, সে তো খুব ভাল কথা, আপনি ছেলেদের কিছু পড়াশুনো জিজ্ঞেস কোরে দেখুন না।

জমিদার গদাধর মাইতি তখন জামার পকেট থেকে একখানা বাংলা খবরের কাগজ বার কোরে চশমা চোখে দিয়ে সেখানা উল্টে-পাল্টে দেখে হাসতে হাসতে ছেলেদের ডেকে বল্লেন—বানান কর দেখি তোমরা কে পারো—"অন্ধর্পদেশ"

একজন ছেলে এগিয়ে এসে বল্‌লে "গন্ধর্ব্ব দেশ ত! আমি বানান করছি রাজাবাবু!

গ—ন্ধ—র্ব্ব—দে—!

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে হো হো কোরে হাসতে হাসতে গদাধর বল্লে—হয় নি! আর কে জানো?

তখন আর একজন ছেলে এসে বানান করলে—"কন্দর্পদেশ!"

এবার গদাধর একেবারে হেসে লুটিয়ে পড়ে বল্লে—হোলো না!

তখন আর একজন ছেলে এগিয়ে এসে বানান করলে—"অন্ধর্প দেশ"

গদাধর এবারও উচ্চহাস্য কোরে মাথা নেড়ে বল্লে—উঁহু, হোলো না! এ বড় শক্ত বানান, তোমরা কেউ পার্ব্বে না; আমি খড়ি দিয়ে বোর্ডে লিখে দিচ্ছি, তোমরা দেখে নাও!

এই বলে খড়ি হাতে কোরে খবরের কাগজখানা দেখে দেখে বোর্ডের গায়ে তিনি এঁকাবেঁকা ছোট বড় হরফে লিখলেন—অন্ধ্ প্রদেশ।

মূর্খ গদাধর এই কথাটা অনেক কষ্টে বানান কোরে পড়েছিল "অন্ধর্পদেশ"!

গুরুমশাই ছেলেদের শরীর-তত্ত্ব শেখাচ্ছেন। জিজ্ঞেস করলেন—বল দেখি আমি যদি মাথা নীচু কোরে পা দুটো ওপোর দিকে তুলে দিই তাহলে আমার মুখ লাল হোয়ে ওঠে কেন?

একজন ছেলে বল্লে—ওপোর দিকে পা আর নীচের দিকে মাথা করলে মাথায় রক্ত এসে জমে বলে মুখ চোখ লাল হোয়ে ওঠে!

গুরুমশাই খুসি হোয়ে বল্লেন—বেশ তোমার বুদ্ধি আছে দেখচি! আচ্ছা এইবার বল দেখি, আমার মাথা ওপোর দিকে আর পা নীচে দিকে থাকলে পা লাল হোয়ে ওঠে না কেন? পায়ে কি তবে রক্ত এসে জমে না?

ছেলেটি বল্লে—আজ্ঞে না, পা তো আপনার মাথার মতন ফাঁপা নয়!

গুরুমশাই আগের দিন ছেলেদের বাড়ী থেকে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখে আনতে দিয়েছিলেন। তাই সেদিন কে কি লিখে এনেছে দেখছিলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে অধরের খাতাখানা নিয়ে তিনবার হাতের তেলোয় আছাড় মেরে তিনি ভয়ানক রেগে উঠে বল্লেন—অধরা! এই কি বাংলা লেখা হয়েছে। গাঁয়ের ছেলে চাষের কথা জানোনা? রোসো, আজই আমি তোমার বাবাকে তোমার এই বিদ্যে নিয়ে দেখাচ্ছি!

অধর একটুও ভীত না হোয়ে বল্লে—বেশতো যান না, আমি ত আর লিখিনি! ওতো বাবাই লিখে দিয়েছেন!

পাঠশালের এক পুরান ছাত্র বাবা মার সঙ্গে হঠাৎ বিদেশে চলে গিয়েছিল। অনেক দিন পরে আবার সে গাঁয়ে ফিরে আসায় সকালেই একদিন গুরুমশায়ের সঙ্গে দেখা হোলো। গুরুমশাই তখন খুব বুড়ো হোয়ে পড়েছেন, সব কথা তাঁর মনে থাকে না তাই ছাত্র গিয়ে তাঁকে প্রণাম কোরে পায়ের ধূলো নিতেই তিনি তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন এবং অমুকের ছেলে শুনে তার বাবা কেমন আছেন জিজ্ঞেস করলেন!

ছেলেটি কাঁদ কাঁদ ভাবে জানালে যে

বিকেলে দীঘির ধারে বেড়াতে গিয়ে আবার গুরুমশায়ের সঙ্গে তার দেখা হোলো। কাজেই সে আবার তাঁকে প্রণাম করলে; গুরুমশায়ের অনেক বয়েস হয়েছে বলে কিছু মনে থাকে না কিনা, কাজেই অমুকের ছেলে শুনেই তার বাবা কোথায় আছেন খবর নিলেন। ছাত্রটি গুরুমশায়ের এই ভুলে যাওয়ার কথা জানতো না সে বল্লে,—তিনি তো এখনও স্বর্গেই রয়েছেন!

ছেলেরা যে আড়ালে তাঁকে 'বুড়ো' বলে এ কথাটা কেমন কোরে একদিন গুরুমশায়ের কাণে গেল। তাঁর মাথার চুলগুলো পেকে গিয়েছিল বটে কিন্তু তাঁর বয়স বেশি হয়নি, সম্প্রতি তাঁর প্রথম পরিবার মারা যেতে তিনি আবার নতুন বিয়ে করেছেন। পাছে কনে বৌয়ের কাণে এ কথাটা ওঠে এই ভয়ে তিনি স্থির কোরে ফেললেন যে, আজ ছেলেদের বুঝিয়ে দেবেন তাঁর বয়স বেশি নয় এবং তিনি এখনও বুড়ো হন-নি। এই মতলবে সেদিন পাঠশালে এসেই তিনি একটি ছোট ছেলেকে ডেকে বল্লেন—তোমার বয়স কত বাপু?

—ছ-বছর গুরুমশাই।

—তোমার বাবার বয়স কত জানো?

—ছত্রিশ বছর!

—তোমার বাবা কি বুড়ো হোয়ে গেছেন?

—না গুরুমশাই! তাঁর এখনও একটিও চুল পাকেনি!

—আমার মেয়ে পুঁটিও ঠিক তোমার বয়সী!

—তাকে তো দেখিনি গুরুমশাই।

—সে তার মামার বাড়ী থাকে যে! আচ্ছা আমার বয়স কত বল্‌তে পার?

—না গুরুমশাই!

—কেন! তোমার বয়স ছ-বছর, তোমার বাবার বয়স ছত্রিশ বছর, এ যদি জানো তাহলে আমার মেয়ে তোমার বয়সী হোলে আমার বয়স কত হোতে পারে আন্দাজ করতে পার না?

ছেলেটি ভয়ে ভয়ে বল্লে—আমি যে এখনও ষাটের বেশি গুণতে শিখিনি!

গুরুমশাই হতাশ হোয়ে আর কোনও চেষ্টা করলেন না।

একদিন পাঠশালে একটা ছেলে এল কাঁদতে কাঁদতে! গুরুমশাই জিজ্ঞেস করলেন—কি হয়েছে রে?—কাঁদছিস্ কেন? ছেলেটা চোখ মুছতে মুছতে বল্লে—বাবার হাতে লেগেছে গুরুমশাই!

গুরুমশাই তাঁকে কাছে ডেকে এনে আদর কোরে বল্লেন—আহা! বাবার লেগেছে বলে বুঝি তোমার মনে কষ্ট হয়েছে? তা ভয় নেই, ভাল হোয়ে যাবে এখন, কোথায় লেগেছে বল্‌তো!—

ছেলেটা নাক ঝেড়ে তখনও নাকি কান্নার সুরে বল্লে—সকালে বাবা পেরেক পুঁতে ছবি টাঙাচ্ছিল, আমায় হাতুড়ী এনে দিতে বল্লে আমি এনে দিলুম তাই তো—

গুরুমশাই বল্লেন—তাতে কি হয়েছে? তুমি তো আর তাঁর হাতে লাগিয়ে দাও নি, তুমি তো শুধু হাতুড়িটি এনে দিয়েছিলে?

ছেলেটা চোখ মুছতে মুছতে বল্লে —হ্যাঁ!

গুরু। তবে আর তোমার দোষ কি? তুমি সেজন্যে কাঁদছ কেন? তোমার বাবার হাতে বড্ড লেগেছে বুঝি?—

ছে। কই না, বাবা তো আমাকে তখনি সেই হাতেই আবার--ধরে মারলে!

গুরু। কেন, তোমায় মারলেন কেন? তুমি সেই হাতুড়িটা তাঁকে দিয়ে এসেছিলে বলে?

ছে। না-না,—তিনি হাতুড়িটা ধরে পেরেকের মাথায় বাগ কোরে মারতে গিয়ে—দুম্ কোরে নিজের হাতের ওপরে বসিয়ে দিয়ে যেমন উঃ! কোরে উঠেছেন আমি অমনি হো হো কোরে হেসে উঠেছিলুম, তাই রেগে উঠে বাবা আমাকে সেই হাতুড়ীর বাড়ি পিটিয়ে দিয়েছেন—

—বেশ করেছেন, যাও বসগে যাও— বলে গুরুমশাই অন্য কাজে মন দিলেন।

গুরুমশাই একদিন জীবে দয়া সম্বন্ধে ছেলেদের খুব উপদেশ দিয়ে বলে দিলেন যে, আজ থেকে তোমরা আর কেউ পশু পক্ষী কুকুর বেরালটিকে পর্য্যন্ত কষ্ট দিওনা। পশুপক্ষীরা মুখে কিছু বলতে পারে না বটে, কিন্তু ওদের প্রতি অত্যাচার করলে ওদের প্রাণে তোমার আমার মতই ব্যথা লাগে।

তারপর পুজোর ছুটিতে পাঠশালা বন্ধ হোয়ে গেল। ছুটির পর পাঠশালা খুলতেই গুরুমশাই আগেই ডেকে সবাইকে বল্লেন,— ছুটিতে তোমরা কেউ পশু পক্ষীর প্রতি কিছু অত্যাচার করনি বোধ হয়, আমার জীবে দয়া সম্বন্ধে উপদেশটি তোমাদের মনে আছে তো!

একজন ছেলে তৎক্ষণাৎ উঠে বল্লে— আমি একটুও ভুলিনি গুরুমশাই! কালই আমি মার ময়না পাখীটা খাঁচা থেকে ছেড়ে দিয়েছিলুম। খাঁচার ভেতর পাখীটা বড্ড ছট্‌ফট্ করছিল—দেখলুম তার ভারি কষ্ট হচ্ছে—তাই আমি ছেড়ে দিলুম। কিন্তু ছেড়ে দিতে না দিতেই —পুসী বেড়ালটা তেড়ে গিয়ে তার ঘাড়ে কামড়ে ধরলে, পাখীটা চেঁচাতে লাগলো, আমি কত বকলুম সে তবু ছাড়লে না দেখে তখন আমাদের 'বাবা' কুকুরটাকে নিয়ে এসে পুসীর পেছনে লেলিয়ে দিলুম! বাবা কিন্তু গুরুমশাই, পুসীকে মেরে ফেলে ময়নাটাকে কেড়ে নিয়ে ভুলে খেয়ে ফেল্লে!

তস্কর-বিশ্ব-বিদ্যালয়

পৃথিবীর নানাদেশে নানা বিশ্ব-বিদ্যালয় আছে। এক একটি বিশ্ব-বিদ্যালয় এক একটি বিশেষ শিক্ষার কেন্দ্র। যেমন অক্সফোর্ডে ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস। কেম্ব্রিজে বিজ্ঞান; লণ্ডন এডিনবর্গ ও মার্কিনের জন হপকিন্সে চিকিৎসা-বিদ্যা, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ওপর-চালাকি ইত্যাদি। পাঠক বোধহয় জানেন না যে, চুরিবিদ্যা শিক্ষা দেবার জন্য মার্কিনে একটি বড় গোছের বিশ্ব-বিদ্যালয় আছে। সেখানে নানারকমের তালা, সিন্দুক ভাঙা, সিঁদকাটা ও চুরি ডাকাতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করবার জন্য আর যে সব বিদ্যার প্রয়োজন হয়—তা শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব এতদিন জানা ছিল না। কিছুদিন আগে আমেরিকার গোয়েন্দা পুলিশ যোসেফ লজন নামক একজন চোরকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ ওয়াশিংটন সহরে লজনের বাড়ী খানাতল্লাসী কোরে অন্যান্য মালের সঙ্গে এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একখানি সার্টিফিকেট আবিষ্কার করেছে। এই সার্টিফিকেটে লেখা আছে যে, লজন এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সিন্দুক, তালা ইত্যাদি ভাঙা কাজে বেশ পরিপক্ক হোয়ে উঠেছে; সিঁদকাটা প্রভৃতি বিদ্যায়ও সে বেশ ওস্তাদী দেখতে পারে। হোলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আশা করেন যে, সে এর সম্মান রক্ষা করবে।

পুলিশে ধরা পড়বার ঠিক আগেই লজন এক জায়গা থেকে দু-লক্ষ টাকা চুরি কোরে উধাও হয়েছিল। লজন পুলিশকে বলেছে যে, তার সঙ্গে অন্য যে-সব ছাত্রেরা একসঙ্গে পাশ কোরে বেরিয়েছে, তারা নিউইয়র্ক ও অন্য অন্য বড় সহরে বেশ দু-পয়সা রোজগার করছে।

চুম্ ঘড়ি

মার্কিনের ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক একটা আশ্চর্য্য রকমের যন্ত্র বার করেছেন। যন্ত্রটির নাম চুম্-ঘড়ি। যন্ত্রটির কাজ হচ্ছে, চুমু ওজন করা। চুম্বনের সময়ে শরীর ও মনে যে অনুভূতি হয় তার মাত্রা ও মাপ এই ঘড়ির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। চুম্বনের সময় উভয়পক্ষের অঙ্গে একটা কোরে তার লাগিয়ে দিতে হয়, এই তার দুটোর সঙ্গে একটা ঘড়ির যোগ আছে। তড়িতের সাহায্যে চুম্বনের ওজন সেই তার বয়ে নেমে আসে আর ঘড়ির কাঁটা সেই সঙ্গে ঘুরতে থাকে। এই যন্ত্রে দায়-সারা চুমু, আধা-খেঁচড়া চুমু, ভালবাসার চুমু সব স্পষ্ট কোরে ধরা পড়ে।

বিশ্ব-ভারতী

জগৎ-বরেণ্য মহাকবি রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন আজ সফল হয়েছে। তাঁর অন্তরের একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, শিক্ষার মিলন-ক্ষেত্রে তিনি বিশ্বের সঙ্গে
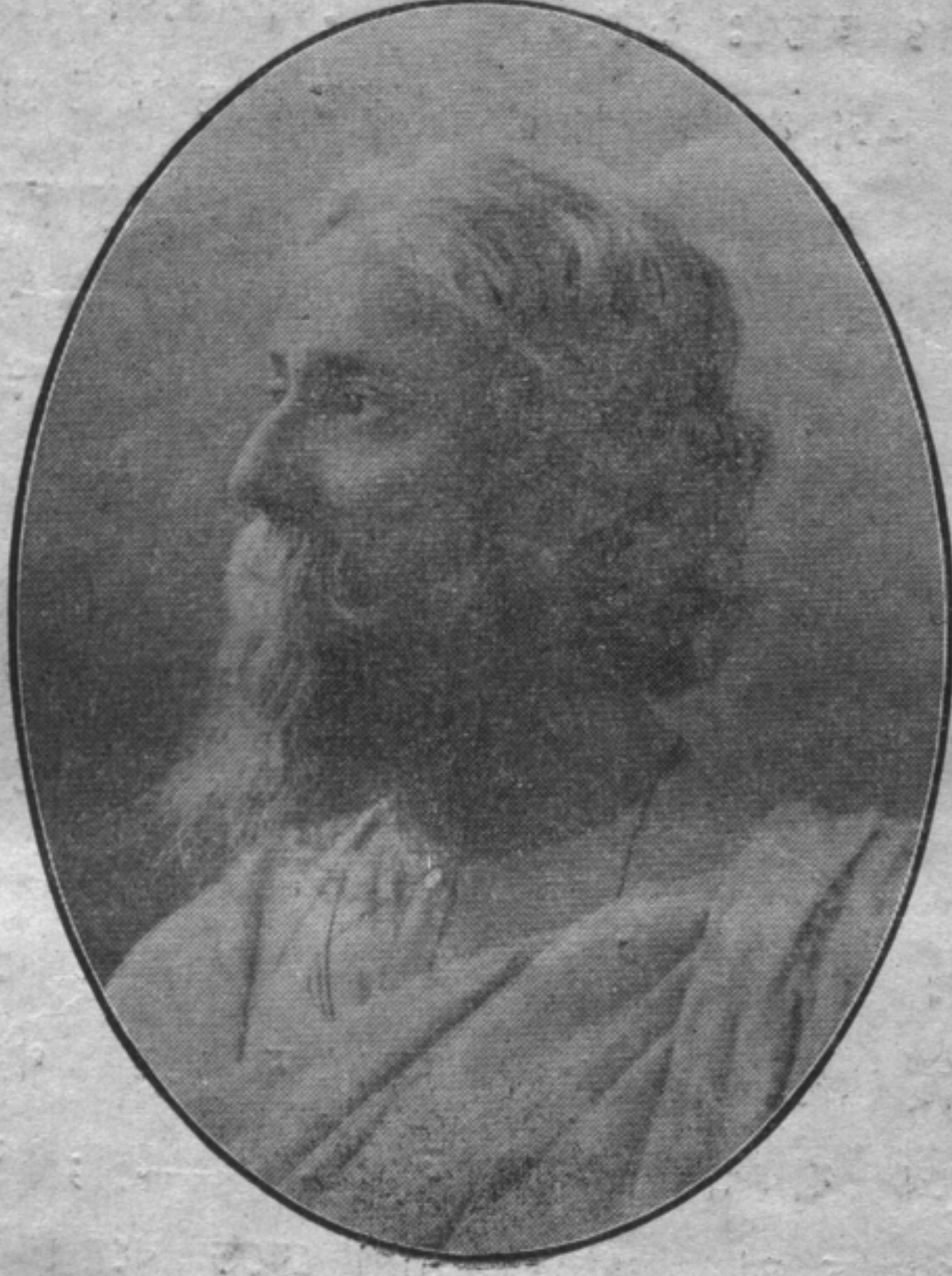
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের যোগসাধন করবেন। আজ তাঁর সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হতে চলেছে। বহুকাল আগে বোলপুর শান্তিনিকেতনে কবির তপোবনের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে দেশের তরুণ সন্তানগণের জাতীয় শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে যে ছোটখাটো-পাঠশালাটি স্থাপিত হয়েছিল, আজ তার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে সেখানে 'বিশ্বভারতী'র প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

বিশ্বভারতীতে যে মহা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সূচনা হয়েছে—আশা হয় একদিন নালান্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মতই তার সুনাম ত্রিভুবনে ছড়িয়ে পড়বে। ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ-দেশান্তর থেকে সিল্‌ভা লেভী-প্রমুখাৎ বড় বড় মনীষিরা এসে আজ এই বিশ্বভারতীর ছাত্রদের কাছে তাঁদের অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত কোরে ধরেছেন। বাঙলার ছাত্র-সমাজ যেন এ অপূর্ব্ব সুযোগ উপেক্ষা না কোরে পরিশেষে অনুতাপে কাতর না হয়—এই আমাদের অনুরোধ। বাঙলার ছেলেরা দলে দলে গিয়ে নিখিল বাগ্‌সিদ্ধগণের এই সম্মিলিত মধুচক্র বিশ্বভারতী থেকে জ্ঞানসঞ্চয় কোরে নিক্।

আমোদ-প্রমোদ

গান-বাজনা আমোদ-আহ্লাদ বৈঠকের একটি প্রধান অঙ্গ, কাজেই এদিকে লক্ষ্য না রাখলে আমাদের অঙ্গহানি হবে। অন্য প্রয়োজন বাদ দিলেও অন্ততঃ বৈঠকের ঠাট বজায়ের জন্যেও এটাকে আমাদের রাখা চাই।

আমোদ-প্রমোদ জিনিষটা একেবারে বাজে নয়, এ কথাটা সকলকে না হলেও কাউকে-কাউকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় কারণ এমন শুচিবায়ুগ্রস্ত বিরল নয় যাঁরা ওর নামেই নাক না সিঁটকে পারেন না।

আমোদ ব্যাপারটার অপব্যবহার অনেক স্থানেই হয় তা জানা আছে—এমন কি সেটা কুৎসিত জঘন্যতায় রূপান্তরিত হয়ে উঠে তাও স্বচক্ষে দেখেছি কিন্তু তাই ব'লে ঐ জিনিষটা থেকে দূরে থাকবার জন্যে কাউকে উপদেশ দিতে পারছি না। কারণ ওটা না থাকলে মানুষের জীবনধারণই অনেকখানি বৃথা। অপব্যবহারে কোন্ জিনিষ না বিকৃত হয়?

পেটের খোরাক যেমন চাই, মনের খোরাকও তার বেশী বই কম হলে চল্‌বে না। তবে খাদ্যটা যাতে বিশুদ্ধ এবং স্বাস্থ্যের উপযোগী হয় তার দিকে নজর রাখা চাই। অনেক সময় আমরা সুবোধ বালকের মতো যা পাই তাই খেয়ে ফেলি।

সুবিধের নয়--তাতে নিজেও মজি, আর পাঁচ জনকেও মজাই, এবং যারা নির্ব্বোধ নয় কেবল সেই সব ব্যবসাদারদের সুসার করি।

কোনো-কোনো রোগের লক্ষণ এই যে, অখাদ্য খাওয়ার উপর বেজায় ঝোঁক বাড়ে। এ রোগ যে শুধু দেহের হয় তা নয়, মনেও এ রোগ ধরে। তখন মানুষের রুচি হয় জঘন্য, অপদার্থ জিনিষও লোকের মূল্যবান মনে হয়, যার স্বাদ বিশ্রী তার নামেই মুখে জল আসে। মনের এ ব্যাধি কখনো-কখনো সংক্রামক হয়ে প্রায় দেশব্যাপী হয়ে ওঠে; তখন বোঝা যায় না কোন্‌টা সত্যিকার রসালো, কোন্‌টা কর্কশ। তখন হাটে-বাজারে যত ভেজাল-দেওয়া জিনিষের আমদানি হতে থাকে—চারিদিকে তারই ঢাক পেটা চলে; সারালো রসালো জিনিষ মারা যেতে বসে। তখনই বিশেষ দরকার হয় ভেজাল জিনিষের ফাঁকি ধরে দেবার এবং সত্যকার রসের উৎস কোথায় তার সন্ধান বাৎলে দেবার। আমাদের দেশে এ প্রয়োজন হয়েছে কিনা তাই বোঝবার জন্যে আমাদের এখানে আমোদ প্রমোদের যে সমস্ত অনুষ্ঠান আছে সেগুলোকে একবার ঘেঁটে-ঘুঁটে আলোচনা কোরে দেখা দরকার। আমরা সেই আলোচনায় সাহায্য কর্‌বার চেষ্টা করব।

বৈঠক

লোকে বলে, আর চোখেও দেখতে পাওয়া যায় যে, বাংলা দেশে দৈনিক সংবাদ পত্র থেকে আরম্ভ কোরে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, দ্বৈমাসিক ত্রৈমাসিক কোন পত্রিকাই চলার মতন চলে না। শুধু পত্রিকা নয় সাহিত্য ও সুকুমার সাহিত্যেরও এই দুর্দ্দশা। রবীন্দ্রনাথের তর্জ্জমা যা ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী প্রভৃতি স্থানে লাখে লাখে বিক্রি হচ্ছে; বাংলা দেশে রবীন্দ্রনাথের জন্মভূমিতে তাঁর বই তার শতাংশের একাংশও বিক্রি হয় না। যে জাতির সাহিত্যের এই অবস্থা, যে জাতির সাময়িক পত্রের এই অবস্থা, তারাই আবার কল্পনা করে একমাসের মধ্যেই দেশ স্বাধীন হোয়ে যাবে। নিজের দেশের সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখবো, নিজের দেশের সাময়িক পত্রকে বাঁচিয়ে রাখবো এইটুকু জাতীয়তার জ্ঞান যাদের হয়নি তারা আবার স্বাধীনতার কল্পনা করে কি কোরে?

অনেক বিদেশী বাঙালীকে অত্যন্ত স্বার্থপর বলে। একটা জাতির নামে এমন ভাবে এক-তরফা একটা মন্তব্য শুনলে মনে হয় যে, জগতের আর আর সব জাতিগুলি পরের দুঃখ মোচন করবার জন্যই জীবন উৎসর্গ করেছে। কিন্তু আমরা দেখছি যে, অন্য অন্য জাতির মতন স্বার্থপর হওয়া তো দূরের কথা বেঁচে থাকতে হোলে যতটুকু স্বার্থপর নজর দেয় না। বাংলার প্রধান সহর কলকাতার দিকেই দেখা যাক। ইংরেজ ও অন্য ইউরোপীয়দের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। এখানে অ-বাঙালী ভাটিয়া পার্শী, নাখোদা প্রভৃতি জাতিই প্রধান ব্যবসায়ী। কেরাণীগিরিতেও মাদ্রাজী এসে বাঙালীর ভাত মারবার চেষ্টা করছে। পুলিশের কনষ্টেবল, রাস্তার কুলী, জাহাজে ও ডকের কুলী সবই অ-বাঙালী। বেঁচে থাকতে হোলে যতটুকু স্বার্থপর হওয়া প্রয়োজন ততটুকু স্বার্থপর হোলেও বাঙালী এমন কোরে নিশ্চেষ্ট হোয়ে বসে থাকতো না। এই একটা জাতি—যারা চেষ্টা করলে সবই হোতে পারে কিন্তু নিশ্চেষ্ট হোয়ে বসে থেকে তারা মরণের মুখে এগিয়ে চলেছে।

কিন্তু স্বার্থপর না হোলেই যে পরদুঃখ-কাতর কিংবা দাতা ও উদার হোতে হবে তার কোনো মানে নেই। বাঙালী স্বার্থপর, পরদুঃখকাতর, দাতা কিংবা উদার—কিছুই নয়। মোট কথা তারা সকল বিষয়েই উদাসীন। এই ঔদাসীন্য ঝেড়ে ফেলতে না পারলে জীবন যুদ্ধে বাঙালীর মৃত্যু অনিবার্য্য।

গত ৪ঠা আষাঢ় রবিবারে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি স্থাপিত হয়েছে। সাহিত্য পরিষদের কর্ত্তারা গত কয়েক বছর থেকে বঙ্কিমের একটি মর্ম্মর

জন্য সাধারণের কাছে আড়াই হাজার টাকা চাওয়া হয়েছিল। এই টাকা উঠ্‌তে কয়েক বছর সময় লেগেছে, সেদিনকার সভায় পরিষদের একজন সেবক জানিয়েছিলেন যে, এই টাকা তুলতে তাঁদের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হয়েছে এবং এখনও একশ' কত টাকা উঠলে তবে সমস্ত দেনা শোধ হবে। এই একশ' কত টাকা সেদিনকার সভাতেই উঠে গিয়েছে। এ সম্বন্ধে গুটিকয়েক কথা বলবার আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র কে ছিলেন, তিনি ভারতবর্ষের কি ছিলেন এবং বিশেষ কোরে তিনি বাঙালীর কি ছিলেন তা সকলেই জানেন। আমরা দেশের নিরক্ষর চাষা কুলী-মজুরদের কথা বল্‌ছি না, আমাদের দেশে যাদের শিক্ষিত লোক বলা হয় তাঁদের কথাই বলছি। বঙ্কিমের লেখা পড়েন-নি এমন হতভাগ্য শিক্ষিত বাঙালী যদি কেউ থাকেন তাঁদেরও আমাদের বলবার কিছুই নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মর্ম্মর-মুর্ত্তি স্থাপনের জন্য যদি এঁরা সকলে চার আনা কোরেও দিতেন তবে আড়াই হাজার টাকা তুল্‌তে কয়েকবছর সময় লাগতো না, কয়েক মাসেই তা উঠে যেত। সমস্ত ভারতবর্ষকে যিনি "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র শুনিয়েছেন শিক্ষিত বাঙালী তাঁর প্রতি এইভাবে তাদের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করেছে। সাহিত্যকে এ যুগের বাঙালী কি ভাবে দেখে ভবিষ্যতের ইতিহাসে তা লেখা হোয়ে রইলো।

সাহিত্য পরিষদকেও কিছু বলবার আছে। এ কাজে তাঁদেরও আন্তরিকতার অভাব দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণ বাঙালী না হয় সাহিত্যকে গ্রাহ্যি করে। কিন্তু তাঁরা অর্থাৎ যাঁরা এই কাজে হাত দিয়েছিলেন তাঁরা কি টাকা তোলবার জন্য তেমন ভাবে চেষ্টা করেছিলেন? নাম করতে চাই না পরিষদের মধ্যেই অনেকে আছেন যাঁরা ইচ্ছা করলে একাই এই আড়াই হাজার টাকা অবহেলায় ফেলে দিতে পারতেন। তাঁরা কি এজন্য দেশের প্রত্যেক রাজা মহারাজা জমিদার উকীল ব্যারিষ্টারের কাছে গিয়ে তেমন কোরে টাকা চেয়েছিলেন? আমাদের বিশ্বাস যে, তা তাঁরা করেন-নি, কারণ এ কাজে তাঁদের সে রকম আন্তরিকতা ছিল না।

এই তো গেল একদিকের কথা। আর একটা দিক আছে, সেটি এই,—বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তক বিক্রী কোরে, তাঁর উপন্যাসকে নাটকাকারে পরিণত কোরে, অভিনয় দেখিয়ে অনেকে আর্থিক অবস্থারও উন্নতি (স্থায়ী না হয় সাময়িক) করেছেন। এই কাজে কৃতজ্ঞতার খাতিরেও তাঁদের একটা কর্ত্তব্য ছিল। এঁদের মধ্যে কে কি দিয়েছেন জানিনা, তবে বিশেষ যে কেউ কিছু দেন-নি তা সেদিনকার বক্তৃতাতেই প্রকাশ পেয়েছিল। একজন বাঙালী কবি লিখেছিলেন—ও ভাই বঙ্গবাসী—আমি মলে তোমরা আমরা চিতায় দিবে মঠ। কিন্তু আজ দেখ্‌ছি কবির এই আশাও দুরাশা মাত্র।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট কার্ত্তিক প্রেসে

১ম বর্ষ]　　　　১৩২৯　　　　[২য় সংখ্যা

সচিত্র পাক্ষিক পত্র

কার্য্যালয়
২৮।২এফ্ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রতিসংখ্যা
এক আনা

বার্ষিক মূল্য ২৵০
দুই টাকা দুই আনা।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

সুবিখ্যাত সচিত্র পুস্তক

ভাবে, ভাষায়, চিত্রে, ছাপায়

অতুলনীয়।

বাংলার বিদ্যালয় সমূহে পুরস্কার পুস্তক রূপে মনোনীত।

দেড় টাকা মাত্র।

নামিকো

জাপানী উপন্যাস।

অশ্রুসিক্ত করুণ প্রেমকাহিনী।

এক টাকা মাত্র।

চমৎকার জাপানী গল্পের বই

আট আনা মাত্র।

গুরুদাস বাবুর দোকান, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

বৈঠকের নিয়মাবলী

বৈঠকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ দুই টাকা দুই আনা; ভিঃ পিঃ মাশুল স্বতন্ত্র প্রতি সংখ্যার জন্য এক আনা। নমুনারও মূল্য লাগে। যে কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া চলে। মূল্য সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়।

রিপ্লাইকার্ড কিংবা টিকিট না পাঠাইলে কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রবন্ধাদি বৈঠকের দুই পৃষ্ঠা বড় জোর আড়াই পৃষ্ঠা অপেক্ষা দীর্ঘ না হয়। টিকিট পাঠাইলে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে কিনা তাহা জানানো হয়। মনোনীত অথবা অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত পাঠান হয় না।

বিজ্ঞাপন

মলাটের চারের পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যা—৮৲

অন্যান্য পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যা—৬৲

অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—৩।০

কলমের প্রতি ইঞ্চি একবৎসরের চুক্তিতে প্রতিসংখ্যা—১৲

কলমের প্রতি ইঞ্চি প্রতিসংখ্যা—২৲

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়

ম্যানেজার বৈঠক

২০৮।২ এফ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এজেণ্ট:—শ্রীপরেশনাথ মিত্র

১৩২নং বাগমারি রোড, কলিকাতা।

১ম বর্ষ] ১লা শ্রাবণ, ১৩২৯ [২য় সংখ্যা

গাল-গল্প

একজন কেরানী এক অফিসে চাকরী খালি আছে শুনে দরখাস্ত করেছিল। তাতে নিজের যোগ্যতা ও গুণের পরিচয় লেখবার সময় কেরাণী বাবু লিখেছিলেন ;—As regards my qualification my father's handwriting was very good ! অর্থাৎ আমার গুণের সম্বন্ধে এই বল্‌তে পারি যে, আমার পিতাঠাকুর মহাশয়ের হাতের লেখা বড় চমৎকার ছিল !

—–

হাওড়া ষ্টেশনের একজন লেডি বুকিং ক্লার্ক ষ্টেশন-মাষ্টারকে গিয়ে বল্লে—আমার দিনকতক ছুটী দিতে হবে।

বু-ক্লা। দিনকতক কোথাও গিয়ে শরীরটা শুধ্‌রে আসবো !

ষ্টে-মা। সেকি ? তোমার অসুখ বিসুখতো কিছু করেনি।

বু-ক্লা। না তা করেনি—কিন্তু আমার চেহারাটা বোধহয় খারাপ হোয়ে গেছে।

ষ্টে-মা। তাই নাকি ? কই আমি তো কিছু দেখ্‌ছিনি ! কে বল্লে তোমার চেহারা খারাপ হয়ে গেছে ? কিসে বুঝলে ?

বু-ক্লা। নিশ্চয়ই আমার চেহারা খারাপ হোয়ে গেছে—নইলে লোকগুলো আজকাল টিকিট কেনার পর নোটের বদলাই, বা টাকার ভাঙানি সব গুনে নিতে আরম্ভ করেছে কেন ? আগে তো নিতোনা ! আমি যা দিতুম তাই হাতে কোরে নিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে হেসে চলে যেতো।

অর্দ্ধেক রাত্রে কর্ত্তার ঘুম ভাঙিয়ে গিন্নি বল্লেন—ওগো! নীচের তলায় কার পায়ের শব্দ হচ্ছে! বোধহয় চোর এসেছে!

—এ্যাঁ! বলকি? বলেই কর্ত্তা তাড়াতাড়ি উঠে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। স্ত্রী তখন বলছিলেন ওগো! ঘর থেকে বেরিয়ে কাজ নেই, চোরের হাতে যদি ছোরা ছুরি থাকে!—কিন্তু কে বা তা শোনে?

স্ত্রী উদ্‌গ্রীব হোয়ে প্রতিমুহূর্ত্তে কর্ত্তার ফিরে আসার অপেক্ষা করছেন—কিন্তু রাত প্রায় ভোর হোয়ে এল তখনও তাঁর দেখা নেই, শেষে একটা কিছু অমঙ্গল আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হোয়ে স্ত্রী দোর খুলে সাহস কোরে বেরিয়ে ডাকলেন—ওগো! ওগো! শেষে ছাতের ওপর থেকে কর্ত্তা বল্লেন—কিগো! নামবো না কি এইবার? দেখেছো ভালো কোরে চারিদিক, চোরটা চলে গেছে তো ঠিক্—না হয় তুমিও ছাতে পালিয়ে এস।

বিদেশে বেড়াতে গিয়ে শোনা গেল সেখানে নাকি একশ’ বছরের ঢের বেশি বয়সের একজন লোক এখনও বেঁচে আছে! একদিন তাকে দেখতে যাওয়া হোলো। চালার সাম্‌নের মেটে দালানটাতে একটী থুড় থুড়ে বুড়ো বসে তামাক খাচ্ছেন, তাকে দেখে সত্তরের বেশি বয়েস বলে মনে করলুম—এখানে কার বয়স একশ বছরের ওপর হয়েছে গা? সে কোথা থাকে বল্‌তে পারো?

বুড়ো তামাকের অনেকটা ধোঁয়া ছেড়ে কাস্‌তে কাস্‌তে বল্লে—হ্যাঁ এইখানেই থাকে—সে আমার নাতনী!

একজন ভদ্রলোক জুতোর দোকানে জুতো কিন্‌তে গেছেন, দোকানদার তাঁকে আগেই একজোড়া নাগরা জুতো বার কোরে দিলে। ভদ্রলোক আশ্চর্য্য হোয়ে বল্লেন আমাকে কি ছাতু খোর পেলে বাপুরা, আমিতো নাগ্‌রা জুতো চাইনি! দোকানদার বল্লে—সেকি মশাই, নাগরা জুতো পায় দেওয়াই যে আজ কাল ফ্যাসান হয়েছে!

ভদ্রলোক গম্ভীর ভাবে বল্লেন—আমার পা দুটো যে বাপু হাল ফ্যাসানের নয়, এ যে সেই সনাতন বাঙালীবাবুর পা! চট্টোপাধ্যায় থাকে তো বার কর।

বলাই। ওহে ওরা শুন্‌ছি নাকি দু-টাকা জোড়া দশহাত খদ্দরের ধুতি বেচ্‌ছে!

কানাই। সেকি হে? কোত্থেকে দিচ্ছে তারা এত সস্তায়? পড়্‌তায় পোষাবে কি কোরে?

জগাই। আরে রেখে দাও তোমার পড়্‌তায় পোষানো—! ঠিকানাটি কি তাদের বল্‌তো ভাই বলাই—লিখে নিই!

ছুটো খবর

লণ্ডনের বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ সিসিল্ ওয়েব-জন্সন ঘোষণা করেছেন যে, যদি নীরোগ ও সুস্থ থাকৃতে চাও তাহোলে কেউ কখন দুধ পান কোরোনা। কারণ তিনি পরীক্ষা কোরে দেখেছেন যে, অসংখ্য রোগের বীজাণু নাকি দুধের সঙ্গেই আমাদের উদরস্থ হয়!

গ্রামর্গাণ বিস্থালয়ের একটি ছেলেকে এবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয়নি। তাকে ইস্কুল থেকে নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। কারণ ছেলেটি নাকি ওই বয়সেই আর একটি ইস্কুলের মেয়েকে একখানি প্রেম-পত্র লিখেছিল। চিঠিখানি ঘটনাক্রমে বেচারীর বিস্থালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের হাতে এসে পড়ে, সুতরাং প্রেমের দায়ে সেই কচি প্রণয়ীর পড়াশুনা খতম কোরে দেওয়া হয়েছে!

লিভারপুলের রাস্তায় মাতলামী কোরে টলে পড়ার জন্য এক ভদ্রলোককে মাতাল বলে থানায় ধরে আনা হয়েছিল। কিন্তু বিচারের পূর্ব্বেই হতভাগ্যের থানাতেই মৃত্যু হয়। পরে ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রকাশ পায় যে, তার জীবনে সে কখনও মদ ছোঁয়নি! বেচারী সেদিন পথে সন্ন্যাস রোগগ্রস্ত হোয়ে পড়ে গিয়েছিল—পুলিশ তাকে মাতাল বলে ভুল কোরে হাঁসপাতালে না নিয়ে থানায় নিয়ে গিয়েছিল। বিলেতের পুলিশও এমন ভুল করে!

মন্ত্রশক্তির প্রভাব

বিনা চিকিৎসায় আরোগ্য হওয়া

আপনারা শুনে আশ্চর্য্য হবেন যে, ফ্রান্স আর ইংলণ্ডে অনেক রুগীদের কেবল 'মালাজপ' কোরে ও মন্ত্র পড়ে আরোগ্য করা হচ্ছে! তবে মালাটা ঠিক হরিনামের তুলসী মালা নয়, আর মন্ত্রটাও খাটি সংস্কৃত নয়। একটী দড়িতে কুড়িটা গাঁট বেঁধে রোগীর হাতে দেওয়া হয়—আর তাকে বলা হয় যে, তুমি চোখ বুজিয়ে বেশ শান্ত ও স্থির ভাবে বিছানায় শুয়ে শুয়ে দড়ীর গাঁটে গাঁটে হাত রেখে কুড়িবার কোরে বল—"দিন দিন সব রকমে আমি ক্রমে সেরে উঠ্ছি!"

এই মন্ত্রটি মনে মনে বল্লে হবেনা,—চেঁচিয়ে বল্তে হবে,—রোগী যেন নিজের গলা নিজে শুন্তে পায়। তবে কানে তালা লেগে যাবে এমন চীৎকার কর্তে হবেনা, গুন্ গুন্ কোরে ছেলে ঘুম-পাড়ানো গানের মত বলে গেলেও চল্বে। বিশেষ একাগ্র-চিত্ত হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। মন্ত্র জপ করতে করতে মনে যদি অন্য কোনও চিন্তা আসে ক্ষতি নেই, তবে নিয়মিত সকালে ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে আর রাতে শোবার

সময় মন্ত্রটি জপ করা চাইই চাই! দিন কতক এই নিয়মে মন্ত্র জপ করলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাবে। রোগ প্রায় বারো আনা রকম আরাম হোয়ে উঠ্‌বে!

মন্ত্রশক্তির প্রভাব এদেশে নতুন নয়, তবে ব্রাহ্মণরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটা কোনও দিনই প্রকাশ করেন-নি বরং ওটার চারদিকে এমন একটা দুর্ভেদ্য রহস্যের আবরণ দিয়ে রেখেছিলেন যে, তার চাপে অনেক মন্ত্রই ভারতবর্ষ থেকে লোপ পেয়ে গেছে! সে যাই হোক সব চেয়ে লজ্জার কথা এই যে, ভারতকে আজ জপ তপ ও মন্ত্রের সম্বন্ধে শিক্ষা নিতে হচ্ছে য়ুরোপ থেকে! তারা আজ আমাদের প্রথম বুঝিয়ে দিলে যে, 'মন্ত্র' আর কিছু নয় কেবল মনকে বোঝানো! মনকে বোঝাতে পারলে তা সে সংস্কৃতেই হোক আর বাংলাতেই হোক্ ভট্টাচার্য্য ভিন্নও কার্য্যসিদ্ধি হবে।

'আজ রাত্রি চারটের সময় উঠতেই হবে' এই মন্ত্র জপ কর্‌তে কর্‌তে যদি আমি শুই, চারটের সময় মন্ত্রের বলে আমি যে ঠিক জেগে উঠবো এর প্রমাণ বোধ হয় অনেকেই পেয়েছেন। খোকা পড়ে গিয়ে কেঁদে উঠ্‌লে মা তাকে তুলে আদর কোরে 'কোথায় লেগেছে বাবা?' বলে হাত বুলিয়ে চুমু খেয়ে মন্ত্র পড়ে দেন— "আর নেই ভালো হোয়ে গেছে!" শিশু অমনি সেই মন্ত্রবলে সব ভুলে গিয়ে হেসে আবার খেল্‌তে চলে যাচ্ছে, এ-ত আমরা প্রতিদিনই দেখ্‌ছি!

কোনও দুঃসংবাদে বা গৃহবিবাদে মনক্ষুন্ন হোয়ে যখন ম্লান মুখে বিপন্ন অন্তরে আমরা পথে পথে ঘুরে বেড়াই, তখন হঠাৎ কোনও সদানন্দ বন্ধুর সঙ্গে দেখা হোলে সে যখন হাত দুটো জড়িয়ে ধরে তার সমবেদনার স্নেহকণ্ঠে বলে ওঠে! "আরে যেতে দাও ভাই! সংসারে ও-রকম হোয়েই থাকে তা দুঃখু করলে কি চলে?" তার সেই সহাস্য মন্ত্র শুনে মনের অন্ধকার যেন নিমেষে কোথায় দূর হোয়ে গিয়ে মলিন অধরে হাসি ফুটে উঠে!

এ সমস্তই মন্ত্রশক্তি। তুমি তোমার নিজের দুই হাত সাম্‌নে লম্বা কোরে দিয়ে দু-হাতের আঙুলে আঙুলে যদি জোরে পাঞ্জা কসে দাঁতে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে একদৃষ্টে দু-হাতের পাঞ্জাটার দিকে চেয়ে কেবলই বল্‌তে থাকো "কিছুতেই এ হাত আমি খুল্‌তে পারবো না, ইচ্ছে করলেও নয়—কিছুতেই নয়!" তাহলে তুমি দেখবে যে,সেই মন্ত্র যতক্ষণ পড়্‌বে কিছুতেই তুমি ততক্ষণ হাত খুলতে পারবে না। একটা অলক্ষ্য শক্তি তোমার সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ কোরে দেবে।

শোনা গেছে আমেরিকায় সেই রকম একদল খেলোয়াড়রা লাঠির ওপর ভর দিয়ে উঁচুতে লাফ দেওয়া অভ্যেস করেছে। এই খেলার প্রতিযোগিতায় এবার যিনি বাজী জিতেছেন তাঁর নাম এফ কে ফস্। ইনি প্রায় তেরো ফুট চার ইঞ্চি উঁচুতে লাফিয়ে উঠেছিলেন। কোনও খেলোয়াড় এ পর্য্যন্ত এতটা উঁচুতে উঠতে পারেন নি।

পঞ্চাশবছরের মামলা

আমেরিকার প্রধান সহর নিউইয়র্কের বড় আদালতে সম্প্রতি একটি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে;—এই মাম্‌লাটি আজ পঞ্চাশ বছর ধরে চল্‌ছিল। এতদিন পরে মামলার ফলাফল প্রকাশ হোলো বটে, কিন্তু যাঁরা এই মামলা প্রথম সুরু করেছিলেন তাঁদের কোনো পক্ষেরই কেউ আজ বেঁচে নেই; এমন কি এই মাম্‌লায় যাঁরা যাঁরা সাক্ষী ছিলেন তাঁরাও আজ সকলে পরলোকে। আদালত সেই আদি ফরিয়াদীর এক নাত্‌নীকে ডেকে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা বুঝিয়ে দিয়েছেন। নাত্‌নীর নাম কুমারী মারিয়ণ, তাঁর বয়স কিন্তু ষাটের ওপর! ইনি এ বিশলক্ষ টাকা

লক্ষ টাকা পাবার দাবী দিয়ে ফের নালিশ করেছেন। এ মামলা আবার কতদিন চল্‌বে কে জানে? আসল মামলার ব্যাপারটা হোচ্ছে এই যে, কুমারী মারিয়ণের ঠাকুরদা হোয়াইট্ আর তাঁর এক বন্ধু ফ্লেচার দু-জনে মিলে ভাগাভাগিতে একটা কারবার সুরু করেন। কারবার যখন খুব ফেঁপে ওঠে তখন হঠাৎ হোয়াইট্ মারা যান—ফ্লেচার সেই সুযোগে ওটা সমস্তই নিজের নামে কোরে নেবার চেষ্টা করেন বলে হোয়াইটের ওয়ারিশানরা নালিশ করে। প্রথম নালিশ হয়েছিল ১৭৭৩ সালে। সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত ঐ মামলা চলে আস্‌ছে—উভয় পক্ষেরই বংশানুক্রমে।

স্পষ্টকথা

শ্রীযুক্ত জলধর সেন 'রায় বাহাদুর' হওয়া সত্ত্বেও ইচ্ছে করেন তাঁকে যেন কেউ বাহাদুর না বলে! তিনি 'বাহাদুর রায়' হবার আগে যেমন সকলের 'দাদা' ছিলেন এখনও তাই থাকতে চান। তিনি বলেন তোমাদের 'দাদা' ডাকের চেয়ে 'রায় বাহাদুর' খেতাব আমার সম্মান বিশেষ 'বর্দ্ধমান' করতে পারে নি! সত্য কথা।

বিলেতে যে-সব অভাগিনী নিজের গর্ভজাত সন্তানকে হত্যা কোরে কলঙ্কের হাত এড়াতে চেষ্টা করতো,—ধরা পড়লে এতদিন তাদের প্রাণদণ্ড হোতো। সম্প্রতি লর্ড পার্মুর, লর্ড বার্কেনহেড্ প্রভৃতি পার্লামেণ্টের হোমরা-চোম্‌রা সভ্যরা একটা আইন পাশ কোরে তাদের প্রাণদণ্ড রহিত করবার ব্যবস্থা করেছেন! তাঁদের যুক্তি হোচ্ছে যে, ঐ-সব অভাগিনীরা মানসিক উত্তেজনায় উন্মত্ত হোয়ে এই নিদারুণ কাজ কোরে ফেলে! কর্ত্তারা দয়ালু সন্দেহ নেই--কিন্তু যুক্তিটা অনেক হত্যাকারীর পক্ষেই প্রয়োগ করা চল্‌তে পারে যে!

গভর্ণমেণ্ট দেউলিয়া হবার ভয়ে খরচ কমাবার জন্য যত্নবান হয়েছেন। কোন দিক দিয়ে কেমন কোরে খরচ কমানো যেতে পারে সেটা বিবেচনা কোরে দেখ্‌বার জন্যে একটা বৈঠক বসেছে! আমাদের 'বৈঠক' থেকে ওদের একটা উপায় আমরা বাৎলে দিতে পারি, যাতে সি, আই, ডি, দপ্তরের খরচাটা অনেক কমে যেতে পারে। শাসন পরিষদের জনকতক উৎসাহী সভ্যকে যদি অবৈতনিক গোয়েন্দার কাজে লাগানো যায় তাহলে বিনা খরচে দেশের অনেক 'গুপ্ত-সমিতির' সন্ধান পাওয়া যেতে পারে!

মডারেট্ চূড়ামণিও শেষে আইন (বেআইন) ভঙ্গ করতে বাধ্য হলেন। আমরা তাঁর সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হয় জান্‌বার জন্যে উৎসুক হোয়ে রইলেম।

সংবাদ-পত্রের সম্রাট লর্ড নর্থক্লিফ তাঁর 'ডেলি মেল' প্রভৃতি একাধিক পত্রিকায় এখন জাপানী বিদ্বেষ প্রচার করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। জাপানীদের সম্বন্ধে তিনি সম্প্রতি লিখেছেন যে, ওরা এসিয়ার জার্ম্মান তুল্য। ক্রমাগত টাকা ধার কোরে যুদ্ধের আস্‌বাব তৈরি করছে, ব্যবসা-বাণিজ্য একচেটে করবার চেষ্টায় আছে। সমস্ত জগত জুড়ে ওরা গুপ্তচর ছেড়ে দিয়ে সবার ঘরের সন্ধান রাখছে ইত্যাদি—

কবিরত্ন ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরই বাংলাদেশে আর কে শক্তিশালী কবি আছে এ কথা উঠলেই কবিরত্ন সত্যেন্দ্রনাথের নাম মনে পড়ে। সত্যেন্দ্রনাথের অকাল-মৃত্যুতে বাংলা দেশের আর বাংলা সাহিত্যের যে বিরাট ক্ষতি হোলো বোধহয় শতাব্দীর সাধনায় তা পূরণ হবে কিনা সন্দেহ। কোনও দেশে সত্যেন্দ্রনাথের মত প্রতিভাশালী কবির জন্ম হওয়া সে দেশের বিশেষ সৌভাগ্য-যোগ

কবিরত্ন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বাঙালীর ছেলেদের কিছু না কিছু পরিচয় আছেই, —শ্রীনবকুমার কবিরত্ন নাম নিয়ে তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কষাঘাতে যে সব দুস্কৃতদের শাসন করেছেন, পাঠক সমাজ নিশ্চয় তার সঙ্গে পরিচিত আ েন। আজ শুধু আমরা এই স্বর্গীয় মহা-কবির জীবনের ঈষৎ পরিচয় দিয়ে আগ্রহান্বিত পাঠকদের কৌতুহল নিবারণ করবার চেষ্টা করবো।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১২৮৯ সালে মকর সংক্রান্তির দিন বেলঘরের কাছাকাছি নিমতে নামীয় স্থানে তাঁর মামার বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি জাতিতে বঙ্গজ কায়স্থ তাঁর পিতা ৺রজনীনাথ দত্তও অল্পবয়সে স্বর্গারোহণ করেছিলেন, কবি সত্যেন্দ্রনাথ তখন বালক মাত্র। মনিষী ৺অক্ষয়কুমার দত্ত, বাঙলা ভাষার জন্মের সহিত যাঁর নাম বিদ্যাসাগরের মতই

আজ দেশাত্মবোধের চারণ-কবি সত্যেন্দ্রনাথের রচনার পরিচয় দিয়ে ধৃষ্টতা করবো না, কারণ আমরা জানি সত্যেন্দ্রনাথের কুহু ও কেকা প্রভৃতি দশখানি কাব্য গ্রন্থের সঙ্গে

বিজড়িত,—তিনিই এই প্রতিভাবান কবির পিতামহ ছিলেন! এঁদের আদিনিবাস ছিল বর্দ্ধমান জেলার অধুনাবিলুপ্ত চুপি গাঁয়ে। অক্ষয়কুমারই প্রথমে দেশ ছেড়ে কলকাতার অধিবাসী হয়েছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি সত্যেন্দ্রনাথকেই দান কোরে যান। কবি সত্যেন্দ্রনাথ লক্ষপতির বংশধর হোলেও কোন দিনই ধনগর্ব্বে দরিদ্রকে ঘৃণা করেন-নি। তিনি সর্ব্ববিষয়ে সুশিক্ষিত ও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। অনেকগুলি বিদেশী ভাষাতেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি অমায়িক, সচ্চরিত্র, বিনয়ী ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। বিশ্বমানবকে তিনি একই পরিবারভুক্ত বলে মনে করতেন। তাঁর অসংখ্য কবিতায় স্বদেশপ্রেম আর নিখিল-মানবজাতির প্রতি গভীর ভালবাসা ফুটে উঠেছে। মানুষ তাঁর কাছে কেউ অস্পৃশ্য ছিল না।

উদরাময় রোগে তিনি অনেকদিন থেকেই তিনি কষ্ট পাচ্ছিলেন। অতিরিক্ত পড়াশুনা করায় কিছুদিনে চক্ষু পীড়াও হয়েছিল। সামান্য একটা পৃষ্ঠব্রণ হঠাৎ বিষাক্ত হোয়ে ওঠায় অকালে তাঁকে ইহলোক পরিত্যাগ করতে হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স মাত্র চল্লিশ পূর্ণ হয়েছিল। দুঃখিনী বিধবা মা আর অভাগিনী সন্তানহীনা পত্নীকে অকূলে ফেলে রেখে কবি তাঁর সাধনোচিত ধামে চলে

গাছের অগ্নিমান্দ্য

রোজ একই খাদ্য খেয়ে মানুষের যেমন অরুচি হয়, অজীর্ণ হয়, গাছদেরও তেমনি মধ্যে মধ্যে অরুচি হোতে দেখা যায়। টবের গাছেদের একমাত্র খাবার মানুষ যা দেয়—তা জল। কিন্তু অনেক সময় গাছে এমন ভাবে জল ঢালা হয় যে, টব উপ্‌চে পড়তে থাকে, টবের মাটি একেবারে কাদা হোয়ে যায়। অতি ভোজনে গাছেরা মানুষের চেয়ে বেশী কাবু হোয়ে পড়ে। সেজন্য অনেক গাছকে অকালে শুকিয়ে যেতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে দিনকয়েক টবে জল ঢালা বন্ধ কোরে দিলে সুফল পাওয়া যেতে পারে।

বৈঠক

অল্পে খুসী হওয়া প্রাণের লক্ষণ নয়; কিন্তু আমরা ভারতবাসী অল্পেতেই খুসী। আমরা আধ-মরা জাতি, আর আধ-মরার পরিণাম যে মৃত্যু তাও আমরা জানি। জেনে শুনেই আমরা তিলে তিলে নয় একেবারে পাঞ্জাব মেলের তালে তাল-ঠুকে ছুটে চলেছি মৃত্যুর দিকে। এত বড় বিরাট একটা জাতির যদি এই ভাবে মৃত্যু হয়, তা হোলে জগতের অন্যান্য জাতির বেঁচে থাকবার পক্ষে সেটা চিরদিনই একটা দৃষ্টান্তের মত দৃষ্টান্ত হোয়ে থাকবে সন্দেহ নাই।

আমাদের ব্যবসা, বাণিজ্য, আমোদ, আহ্লাদ সবই চলেছে ঢিমে চালে—সেই মান্ধাতার আমলে যেমন চলতো। সেখানেও প্রাণের কোনো পরিচয় নেই। আমোদ করতে থিয়েটারে যখন যাই, তখন মনে হয় কুইনানের বড়ির মতন আমোদের একটা বড়ী দেওয়া হয়েছে কোন রকমে ঢোক গিলে সেটা পেটের মধ্যে চালিয়ে দিয়ে আমোদটা সেরে নিয়ে বাড়ী ফিরতে পারলেই যেন হোলো। দাদামশায়ের আমলের সেই ভেঁপু, আর নট-নটীদের অদ্ভুত অভিনয়—তার উন্নতিও নেই অবনতিও নেই। পরিবর্ত্তন যদি কিছু দেখতে পাওয়া যায় তো হতাশ হোয়ে বলি হায়রে পুরোনো দিন, সে যুগে যা হোতো এখন তার কিছুই হয় না।

থিয়েটারের সত্বাধিকারিরাও নিশ্চিন্ত। তাঁরা মনে করেন—কাঠের বেরালে যখন ইঁদুর ধরছে তখন আর মাছ ভাত খাইয়ে জ্যান্ত বেরাল পুষে লাভ কি? কিন্তু আসলে কাঠের বেরাল সত্যিই কখনো ইঁদুর ধরতে পারে না, কাঠের বেরাল দিয়ে ইঁদুরকে ভয় দেখানো মাত্র চলতে পারে। কিন্তু ইঁদুর যেদিন টের পাবে যে, এতদিন সে যে জীবটিকে ভয় কোরে এসেছে সেটি নীরস কাষ্ঠখণ্ড মাত্র, সেদিন কি হবে? তখন কাঠের বেরালের জায়গায় আসল বেরাল বসালেও যে সে সেটাকে কাঠেরই মনে করবে।

পণ্ডিত মতিলাল প্রমুখ আইন-ভঙ্গ কমিটির সদস্যরা পাঞ্জাবে গিয়ে শুনেছেন যে, সেখানে হিন্দু-মুসলমানে সে রকম সম্প্রীতি নেই। পণ্ডিতজীরা এইকথা শুনে আশ্চর্য্য তো হয়েছেনই, দুঃখিতও কম হননি। দুঃখ তো হবারই কথা, এই দুঃখই যে ভারতবাসীর সমস্ত দুঃখের মূল। এই বিরোধ মোচনের উপায় কি সে বিষয়ে তাঁরা ভাবের দিক ছেড়ে দিয়ে যুক্তির দিক দিয়ে বিচার কোরে দেখেছেন কি?

বর্ত্তমান অবস্থায় হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি হওয়ার চেয়ে বিরোধ হবার কারণই বেশী রয়েছে। হিন্দু-মুসলমানে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করতে হোলে হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই কিছু কিছু ছাড়তে হবে; বিচার করেই কোরেই ছাড়তে হবে। যিনি বল্‌বেন, আমি আগে হিন্দু অথবা মুসলমান পরে ভারতবাসী, তাঁর সঙ্গে কাজ করতে গেলে প্রতিপদেই সঙ্কোচ আসবে—পাছে তাঁর হিন্দুত্বে কিংবা মুসলমানত্বে আঘাত লাগে। বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় একমাত্র বলা চলতে পারে—আমি আগে মানুষ পরে ভারতবাসী। যারা ধর্ম্ম মানে তাদের মধ্যে ধর্ম্ম নিয়ে

আড়ম্বর যেখানে বেশী সেইখানেই তো বিরোধ।

আর একটা দিক আছে। প্লাবনের সময় সাপে ও মানুষে জড়াজড়ি কোরে গাছে ঝুলতে থাকে। সাপও জানে বিপদ কেটে গেলে আমার যে ধর্ম্ম সে তো আছেই, মানুষও জানে জল একবার সরুলে হয়। কিন্তু বিপদ যতক্ষণ না কাটে ততক্ষণ পরস্পরে বিরোধ ঘটায় না। ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমানের সম্মুখে যে বিপদ তাতে এখন বিরোধের কথা ওঠাই অসম্ভব। কিন্তু এখনও যখন বিরোধের কথা শোনা যাচ্ছে তখন বুঝতে হবে যে, বিপদের মাত্রাটা তারা মোটেই অনুভব করতে পারছে না — এইটেই যে সব থেকে বড় বিপদের কথা।

স্যর মাইকেল ও'ডায়ার সম্প্রতি এক সভায় মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে বলেছেন "গান্ধী একটা ধড়িবাজ ভণ্ড। আমাকে একজন Irish Nationalist বলেছেন যে, তিনি কিছুদিনের জন্য ভারতবর্ষে ছিলেন এবং গান্ধীর খুব কাছে-কাছেই ছিলেন। তিনি গান্ধীর আসল ও নকল দুই রূপই দেখে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, গান্ধী লোকটা ইত্যাদি ইত্যাদি।" সব কথা লিখে কলম কলঙ্কিত করতে চাই না।

প্রথম কথা, Irish Nationalistএর গল্পটি আমরা বিশ্বাস করতে রাজি নই। আমাদের মনে হয় যে, কথাগুলি স্যর মাইকেলরই অন্তরের কথা—তবে সাহসের অভাবে তিনি এগুলি কোন এক কাল্পনিক Irish Nationalistএর মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন। দ্বিতীয় কথা, Irish Nationalist হোলেই তিনি এমন কি পীর যে তাঁর কথা বিনা বাধায় মেনে নিতে হবে? স্যর মাইকেল জানেন যে, অসহযোগীদের সঙ্গে আয়ার্লণ্ডের স্বাধীনতা-প্রয়াসীদের সহানুভূতি আছে, সেইজন্য Irish Nationalistএর মুখ দিয়ে মহাত্মা গান্ধীকে গালাগালি দিয়ে বড় রকমের একটা প্যাঁচ কষেছেন।

স্যার মাইকেল ও'ডায়ার বহুদিন ভারতবর্ষে চাকরী কোরে মোটা মাইনে খেয়ে নশ্বর দেহটি পুষ্ট করেছেন। দেশে ফিরে গিয়ে পাছে কোন রকম কষ্টে পড়েন এজন্য তাঁর মোটা 'ভাতার' বন্দোবস্ত আছে। সেই ভাতার টাকা ভারতবর্ষের লোকেরাই জুগিয়ে থাকে। মহাত্মা গান্ধীকে

গালাগালি দিলে ভারতবর্ষের (আমাদের জানতঃ দুইজন লোক ছাড়া) আপামর সাধারণ সকলের অন্তরেই যে ব্যথা লাগে একথা তিনি বিশেষ কোরেই জানেন। অন্নদাতাদের প্রতি এ রকম কৃতজ্ঞতা তাঁর পক্ষেই সম্ভব।

—

গবর্ণমেণ্ট কয়েকটী কোম্পানীকে একচ্ছত্র ব্যবসা করবার অধিকার দিয়েছেন। যেমন ট্রাম কোম্পানী, ইলেক্‌ট্রিক-সাপ্লাই, টেলিফোন ইত্যাদি। বলা বাহুল্য কোম্পানীগুলি ইংরেজদের; তারা যখন খুসী দাম বাড়ায়, যাকে খুসী মাল দেয়, যাকে খুসী দেয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ—টেলিফোন কোম্পানী ধাঁ কোরে দাম বাড়িয়ে দিলে, ট্রাম কোম্পানী দাম বাড়িয়ে দিলে—এর বিরুদ্ধে করবার তো যো কিছু নেই-ই বলবার কিছু আছে কিনা সেইটে বিবেচ্য।

—

ট্রাম কোম্পানী যত মাজা-ভাঙ্গা ট্রাম দেশী পাড়ায় ঠেলে দিয়েছে। গাড়ী যখন মেডিকেল কলেজের ধার দিয়ে এক পাশে কাত্মিক খেয়ে লকবগ্ কোরে চলতে থাকে তখন মনে হয়, আজকের আপিস-যাত্রা বুঝি অগস্ত্য-যাত্রায় পরিণত হয়। কিন্তু—করিবার কিছু নাই। বাড়ীতে আলোর দরকার, ইলেক্‌ট্রিক-সাপ্লাইকে সংবাদ দেওয়া হোলো। কবে তারা এসে আলোর বন্দোবস্ত করবে সেই আশায় মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বসে থাকো, কারণ তাঁদের এখন বড় অসুবিধা, মালপত্র নেই। তাদের মালপত্র নেই এই জন্য আমায় অসুবিধা ভোগ করতে হবে। কারণ তারা ছাড়া আর গতি নেই। এর বিরুদ্ধে যতই বলি না কেন—করিবার কিছু নাই।

—

বাংলা দেশে যাঁরা ব্যবস্থাপক সভায় দেশোদ্ধার করতে গিয়েছেন, তাঁদের প্রতি অনুরোধ এই যে, তাঁরা এই সব ছোট ছোট বিষয়ে নজর দিয়ে দেশবাসীকে অসুবিধা থেকে মুক্ত করুন। দেশ-উদ্ধার তাঁদের আপাততঃ আর করতে হবে না, সে ভার নাকি অন্য লোকে নিয়েছে। এই যে একচ্ছত্র ব্যবসা করবার অধিকার দিয়ে, সাধারণের এই দারুণ অসুবিধার বিহিত কি হয় না?

—

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট কার্ত্তিক প্রেসে
শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থীর দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১ম বর্ষ] ১৩২৯ [৩য় সংখ্যা

সচিত্র পাক্ষিক পত্র

কার্য্যালয়
২০৮।২এফ্ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রতিসংখ্যা
এক আনা

বার্ষিক মূল্য ২৵০
দুই টাকা দুই আনা।

বৈঠকের নিয়মাবলী

বৈঠকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ দুই টাকা দুই আনা; ভিঃ পিঃ মাশুল স্বতন্ত্র। প্রতি সংখ্যার জন্য এক আনা। নমুনারও মূল্য লাগে। যে কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া চলে। মূল্য সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়।

রিপ্লাইকার্ড কিংবা টিকিট না পাঠাইলে কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রবন্ধাদি বৈঠকের দুই পৃষ্ঠা বড় জোর আড়াই পৃষ্ঠা অপেক্ষা দীর্ঘ না হয়। টিকিট পাঠাইলে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে কিনা তাহা জানানো হয়। মনোনীত অথবা অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত পাঠান হয় না।

বিজ্ঞাপন

মলাটের চারের পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যা—৮৲

অন্যান্য পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যা—৬৲

অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—৩৷৷০

কলমের প্রতি ইঞ্চি একবৎসরের চুক্তিতে প্রতিসংখ্যা—১৲

কলমের প্রতি ইঞ্চি প্রতিসংখ্যা—২৲

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়

ম্যানেজার বৈঠক

২০৮।২ এফ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এজেণ্ট :—শ্রীপরেশনাথ মিত্র

১৩২নং বাগমারি রোড, কলিকাতা।

জানাতেই সে দাঁড়ী বাটখারা বার কোরে গাড়ুটা পাল্লায় চড়িয়ে নানারকম হিসেব কোরে খড়িতে দাগ কেটে কেটে বামুনের ছেলেকে বুঝিয়ে দিলে যে, গাড়ুর ওজন এত, আর তলায় শীষে রাঙঝাল ময়লা খাদ প্রভৃতি বাদে এতটা ওজন কম পড়েছে। সুতরাং আপনাকে আর সওয়া চৌদ্দআনা নগদ দিতে হবে, আপনি শীঘ্র যান এই ক-খানা পয়সা নিয়ে আসুন, তা হোলেই আপনার গাড়ু এখনি বিক্রী হোয়ে যাবে, আর কোথাও যেতে হবে না।

তর্করত্নের ছেলের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো! সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে যখন আনন্দিতচিত্তে বাড়ী ফিরলো তখন প্রায় বেলা বারটা বাজে! বাড়ী ঢুকতেই সে পিতাকে জানালে যে, গাড়ু বিক্রী করার সমস্ত বন্দোবস্ত কোরে এসেছে কেবল আর সওয়া চৌদ্দআনা পয়সা দিলেই কাজটা মিটে যায়, অতএব আপনি শিগ্গীর এই কয় আনা পয়সা আমাকে দিন! তর্করত্ন মশায় শুনে তো অবাক! ব্যাপারটা ঠিক বুঝ্তে না পেরে তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞেস্ কোরে যখন জান্তে পারলেন যে, গাড়ুর তলার শীষে, ময়লা, রাঙ, খাদ, ইত্যাদি বাদ দিয়ে জিনিষটি ওজনে কম পড়ায় দোকানীকে ঘর থেকে আরও কিছু দিতে হবে!—তখন তিনি একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হোয়ে উঠে ছেলেকে তার বুদ্ধির জন্যে পায়ের খড়ম খুলে প্রহার করতে করতে কান ধরে যখন নতুন বাজারের বাসনপটির দোকানটি দেখাবার জন্যে দুপুর রোদে তেতে পুড়ে অনাহারে তাকে সঙ্গে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন তখন দোকানদার সেদিনের মতন দোকান বন্ধ কোরে বাড়ী চলে গেছে!

—

স্পষ্টকথা

ভারতবর্ষের দেনা-পাওনা চুক্তি হবার আগেই খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎ চট্টোপাধ্যায় কংগ্রেসের দেনা-পাওনা চুকিয়ে হাওড়াকে পতিহীনা করেছেন। কেন যে তিনি এমন হৃদয়হীনের মত কাজ করলেন তার একটা কৈফিয়ৎস্বরূপ তিনি বাংলা খবরের কাগজে চার কলম ঠাসা এক বক্তৃতার নকল ছাপিয়েছেন। সেই সুবৃহৎ কৈফিয়তের সার মর্ম্ম হচ্ছে—কলঙ্কিনী হাওড়া টাকা চাঁদা দেয়না, আর এত কোরে খদ্দর পরতে বলি তবু পরেনা, সুতরাং তার পতিগিরি করা (তবু সাক্ষাৎ পতি নয়। সভাপতি!) তাঁর চলবে না। কংগ্রেস চুলোয় যাক্, দেশ উচ্ছন্নে যাক্, হাবড়া গঙ্গায় তলিয়ে যাক্—তিনি আর এ অপদার্থ দেশের জন্য বৃথা পরিশ্রাম করতে পার্ব্বেন না! ধন্য শরৎচন্দ্রের দেশানুরাগ! যাক্, সে যাই হোক্, এখন আমরা তাঁকে অনুরোধ করি যে, তিনি

রাজ্যে বিচরণ করছিলেন, অবহিত চিত্তে এখন সেই কাজই করুন, ওসব হাঙ্গামায় যাওয়াই তাঁর ভুল হয়েছিল।

বোম্বায়ের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত জয়াকর সাহেব অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে আদালতে যাওয়া বন্ধ করেছিলেন। সম্প্রতি তিনি আবার নিজের ব্যবসায় ঢুকে পড়েছেন। দেশের জন্য আদালত ছেড়ে দিয়ে আবার তেড়ে ধরার লজ্জা বোধ হয় তাঁকে মর্ম্মপীড়া দিয়েছিল তাই তিনিও সংবাদ-পত্রে শরৎচন্দ্রের মতই এক বালোকোচিত কৈফিয়ৎ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন—অনেকদিন থেকে আমার মনের বাসনা ছিল আমি দেশে একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করবো। অসহযোগ আন্দোলন উপস্থিত হওয়ায় আমি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবার শুভ অবসর এসেছে মনে কোরে কাজ কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলুম। কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে আমার আশা পূর্ণ হোলোনা। সুতরাং অনর্থক চুপ কোরে বসে সময় নষ্ট করার চেয়ে আমি আবার আমার পূর্ব্ব কাজে ঢুকে পড়াই শ্রেয় মনে করলুম, কেন না কংগ্রেস্ অসহযোগীদের জন্যে যে সব কাজ ঠিক করেছেন তাআমার মনের বা মেজাজের অনুকূল নয়। আমি যে কাজ করতে ভালবাসি সে কাজ ছাড়া অন্য কাজ আমার ধাতে সয় না সুতরাং যেটা তাঁর ধাতে বেশ সহ্য হয়েছিল অর্থাৎ ব্যারিষ্টারি করা আবার তাই সুরু করেছেন। জয়াকরের জয়-জয়কার হোক।

পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা স্যার মাইকেল ওডায়ার স্যার শঙ্করণ নায়ারের নামে মানহানির নালিশ করবার ভয় দেখিয়ে এক হুম্‌কি ছেড়েছেন। কি দুর্দ্দৈব? শুন্‌ছি নাকি স্যার্ শঙ্করন বোম্বায়ের সেই নরম গরম দু-দলের মিটমাট সভায় মহাত্মা গান্ধীর নিকট যুক্তি তর্কে পরাস্ত হোয়ে সভাস্থল পরিত্যাগ কোরে চলে এসেই সেই রাগে আর অভিমানের প্রেরণায় "গান্ধী ও অরাজকতা" নামে যে বইখানি লিখে ফেলেছেন এবং যার প্রত্যেক পরিচ্ছেদে তিনি প্রমাণ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন যে, গান্ধী প্রবর্ত্তিত এই অসহযোগ আন্দোলন ভারতে জাতিবিদ্বেষ রাজবিদ্রোহ অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি করবে। সেই কথা বলতে গিয়ে তিনি তাঁর বইখানিতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাঞ্জাব সম্বন্ধে এমন দু-চার কথা লিখেছেন যাতে পাঞ্জাবের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা স্যার্ মাইকেল ওডায়ার নিজেকে অপমানিত বোধ করেছেন! তাই এই মামলার উৎপত্তি! অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় স্যার শঙ্করণের মত স্যার মাইকেলও মহাত্মার গান্ধীর উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্টে যৎপরোনাস্তি কটূক্তি ও নিন্দা-বাদ করেছেন তব মামলা বাঁধলো তাদেরই

দুজনের মধ্যে—এঁরা দুজনেই মহত্ত্বের লাঞ্ছনা-কার্য্যে পরস্পরের সতীর্থ! যাক্ এখন ষাঁড়ের শত্রু যদি বাঘে মারে মন্দ কি?—

আইন অমান্য করার অপরাধে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকে এখনও গ্রেপ্তার করা হয় নি। শুন্‌ছি বড়লাটের শাসন পরিষদের কোনও একজন হোম্‌রা চোমরা সভ্য ভয় দেখিয়েছেন যে, পণ্ডিতজীকে যদি গ্রেপ্তার করা না হয় তাহলে তিনি কাজে ইস্তফা দেবেন! ঝাঁঝ দেখে মনে হয় সভ্যটি সম্ভবতঃ বিলিতি। যাই হোক আমরা তাঁর পরিচয় জানবার জন্য উৎসুক রইলুম।

মহাত্মা গান্ধী কারাগারে বন্দী। ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করা তাঁর পক্ষে নিষেধ। সম্প্রতি মহাত্মার পরিবারবর্গ তাঁর সঙ্গে জেলে দেখা করতে গিয়েছিলেন। মহাত্মাজী তাঁদের প্রথম প্রশ্ন করেন—আমার 'লছমী' কেমন আছে? ইংরেজী 'তরুণ ভারত' পত্রিকা মহাত্মার এই প্রশ্নের নিগূঢ় ব্যাখ্যা কোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মহাত্মার এ প্রশ্নের অর্থ হচ্ছে ভারতের সাতকোটী নিম্নশ্রেণীর অস্পৃশ্য নরনারী কেমন আছে? তাদের কি ভারতবাসীরা নিজেদের কাছে টেনে নিয়ে সমান স্নেহের চক্ষে দেখ্‌তে শিখেছে, না এখনও তারা অনাদরে অবহেলায়, অনশনে জীবন কাটাচ্ছে?—

'লছমী' হচ্ছে একটী অস্পৃশ্য জাতের অনাথ মেয়ে, মহাত্মা তাকে নিজের গৃহে আশ্রয় দিয়ে স্বপরিবারভুক্ত একজনের মত প্রতিপালন করছেন—একথা বোধ হয় অনেকেই জানেন। 'তরুণ ভারত' বল্‌ছেন ভারতের সমস্ত অস্পৃশ্য নিম্নশ্রেণীর প্রতিনিধি স্বরূপ এই 'লছমী'র কুশল প্রশ্নে মহাত্মা তাদেরই কথা জানতে চেয়েছেন!

শ্রীযুক্ত এণ্ডরুজ সাহেব ফিজী দ্বীপে ভারতীয় শ্রমজীবীদের দুর্দ্দশা দেখে করুণা পরবশ হোয়ে তাদের মধ্যে যারা দেশে ফিরে আস্‌তে চায় তাদের ফিরে আসার ব্যবস্থা কোরে দিয়েছিলেন। কিন্তু হতভাগ্য শ্রমজীবীদের দুরদৃষ্টবশতঃ ভারতে ফিরে এসে তাদের দুর্দ্দশা আরও দ্বিগুণ বেড়ে উঠেছে! তারা আজ আবার এণ্ডরুজ সাহেবের কাছে সকাতরে প্রার্থনা করছে—সাহেব আমাদের আবার ফিজিতে ফিরে যাবার উপায় কোরে দাও, দেশের অত্যাচার যে আর সহ্য করতে পারছিনে! এর চেয়ে বিদেশে আমরা সুখে ছিলুম! গ্রামে ফিরে যেতে কেউ সেখানে আমাদের সঙ্গে মিশলে না,—সবাই ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে আমাদের একঘরে করে রেখে দিয়েছে! আমাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বিয়ে-থা দেওয়া দূরে থাক তারা আমাদের এক পুকুরে নাইতেই দেয় না, এক কুয়োর জল খেতে দেয় না। জুয়াচোরে আমাদের

ঠকিয়ে টাকা কড়ি ভোগা দিয়ে নিচ্ছে। দুশ্চরিত্র প্রতিবাসীরা আমাদের মেয়েদের অপমান করছে। আমরা এখানে আর একদিনও থাকতে চাইনে!

বুঝুন দেশের অবস্থা।

ডিনামাইট ফাটার পর মুহূর্ত্তের খালের চেহারা

ডিনামাইটের উপকারিতা

ডিনামাইট দিয়ে মানুষের পরিশ্রম কত পরিমাণে কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে তার ধারণা বোধ হয় আমাদের সকলের নেই। সম্প্রতি আমেরিকায় মাত্র চারজন লোক মিলে সাত ঘণ্টার মধ্যে একটা ৭০০ ফুট লম্বা ১২ ফুট চওড়া ও সাড়ে চার ফুট গভীর খাল খুঁড়ে ফেলেছে। ব্যাপারটী সম্ভব হয়েছে এই প্রকারে—যেখান দিয়ে খাল যাবে সেখানে প্রথমে সারি সারি ডিনামাইট ভরা পাইপ পুঁতে দেওয়া হয়। তারপর সেই ডিনা-মাইটে আগুন দিলে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে নির্দ্দিষ্ট জায়গায় খাল সৃষ্টি কোরে দেয়। এইভাবে খাল কাটলে খোঁড়া মাটি খালের

ডিনামাইটে আগুন দেওয়ায় তা যেমন ফাটে, জল অমনি তোড়ে এসে খাদ ভরিয়ে ফেলে

দু-পাশে উঁচু কোরে ফেলে রাখতে হয় না, কারণ ডিনামাইটের তোড়ে খোঁড়া মাটি পর্য্যন্ত সাফ হোয়ে উড়ে যায়।

জুতা মাহাত্ম্য

(ছোট গল্প)

একজন লোক একজোড়া চটি-জুতো কিনে বাড়ী ফিরছিল। পথে তাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করতে লাগল—মশাই, জুতো জোড়াটা কত নিলে?—কোন্ দোকান থেকে নিলেন? ক্রমাগত রাস্তার লোকের এই রকম সব প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে অত্যন্ত বিরক্ত হোয়ে শেষে লোকটা বলতে আরম্ভ করলে—এ আমি কিনি নি মশাই, একরকম অমনিই পেয়েছি! একজন পথিক তার কথাটা শুনে পেছু পেছু এসে যখন কেউ কোথাও নেই তখন সাম্‌নে এগিয়ে গিয়ে একেবারে জোড় হাত কোরে তাকে কাকুতি মিনতি করতে লাগল—আমাকে এক জোড়া যদি দয়া কোরে পাইয়ে দেন! সে একেবারে নাছোড়বান্দা;—কি করে, তখন চটি কেনা লোকটী পাড়ার একজন সম্ভ্রান্ত শিষ্টাচারী ব্রাহ্মণের নাম কোরে বল্লে—হয়েছে কি জানো—কাউকে বোলনা যেন, ওই স্মৃতিরত্ন ঠাকুর—এক বেটা মুচকে কিছু টাকা ধার দিয়েছিলেন কিন্তু মুচিটা সে টাকা শোধ করতে না পেরে তার যে ক-জোড়া জুতো দোকানে তৈরি ছিল ঠাকুরকে দিয়ে দেশে চলে গেছে। স্মৃতিরত্ন ঠাকুর পরম হিন্দু ভারি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, সেই গরুর চামড়ার জুতো নিয়ে তিনি কি কর্‌বেন বল?—কাজে-কাজেই অত্যন্ত গুপ্তভাবে মাত্র এক আনা কোরে মূল্য নিয়ে তিনি সেই জুতো সকলকে বিতরণ করছেন! তুমি যদি খুব সাবধানে তাঁর কাছে গিয়ে অতি সন্তর্পণে তোমার অভিপ্রায় তাঁকে নিবেদন করতে পারো—তাহলে হয়তো গোপনে তিনি তোমাকে একজোড়া দান করতে পারেন, কিন্তু দেখো খুব হুঁসিয়ার—কেউ যেন না টের পায়! তুমি গিয়ে কেবল দূর থেকে তাঁকে একটি আনি দেখিয়ে বলবে—'একজোড়া'! ব্যস্, তা হোলেই তিনি বুঝতে পারবেন, আর তখনি গিয়ে ভেতর থেকে কাগজে মুড়ে একজোড়া জুতো এনে তোমার হাতে দেবেন। এই বলে চটি কেনা লোকটি চলে গেল। তখন পথিকটি উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে বাড়ী গিয়ে একটি আনি বার কোরে নিয়ে আবার স্মৃতিরত্ন ঠাকুরের টোলের দিকে ছুটলো! আগের লোকটীর জুতো-জোড়াটি দেখে পথিকের বিশেষ লোভ হয়েছিল—তারপর আবার এক আনায় অমন জুতো পাওয়া যাবে শুনে তার আর ধৈর্য্য ধর্‌ছিল না!

স্মৃতিরত্নের বাড়ীতে পৌঁছে সে দেখ্‌লে সেখানে অনেক লোক জমায়েত হয়েছে! দেখেই তো সে দমে গেল।

হায়! হায়!—এত লোক যখন জুতোর জন্যে ভিড় করেছে তখন কি জুতো আর আছে, হয়তো সব ফুরিয়ে এসেছে। এই মনে কোরে সে একেবারে উন্মাদের মত সকলকে ঠেলে ঠুলে ধাক্কা দিয়ে একেবারে স্মৃতিরত্ন মশায়ের বাড়ীর ভেতর ঢুকে তাকে সন্ধান কোরে বেড়াতে লাগল। ঝী-চাকর কি ছোট ছেলেমেয়ে যাকে দেখতে পায় তাকেই জিজ্ঞেস করে—ঠাকুর কোথায়—? শেষ সন্ধান পেলে যে, তিনি এখন চণ্ডীমণ্ডপে পূজোর আয়োজনে ব্যস্ত আছেন; এখন দেখা হবেনা! সে কথা কে শোনে?—লোকটা একেবারে তিন লাফে চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে হাজির! স্মৃতিরত্ন মশাই তখন শুদ্ধ পট্টবস্ত্র পরে চন্দন ও তিলক সেবা কোরে মা অন্নপূর্ণার পূজার আয়োজন কর্‌ছলেন। লোকটীর তাঁর সঙ্গে চোখোচোখী হবা-মাত্র সে দূর থেকে তাঁকে আনিটী দেখিয়ে বল্লে "একজোড়া!" ব্রাহ্মণ তার দিকে মনোযোগ না দিয়ে পূজোর আয়োজনেই ঘুরে বেড়াতে লাগলেন! কখনও নৈবেদ্য এনে সাজাচ্ছেন, কখনও ধুপধুনো দীপ এনে রাখছেন, কখনও শাঁখ ঘণ্টা তাম্রকুণ্ডলু নিয়ে আসছেন কিন্তু সে লোকটি ছাড়বার পাত্র নয়, সেও স্মৃতিরত্ন মশায়ের সঙ্গে সঙ্গে কখনও তার সাম্‌নে থেকে, কখনও তার পেছন থেকে ক্রমাগত তাঁকে আনিটী দেখাতে লাগ্‌লো—আর অনবরত চোখ মুখ ঘুরিয়ে ইসারা কোরে বল্‌তে আরম্ভ করলে—"একজোড়া!" "একজোড়া!"

তার এইরকম ভাবগতিক দেখে স্মৃতিরত্ন ঠাকুরের বাড়ীর সমস্ত লোকজন এমন কি তাঁর ওখানে অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষে সেদিনের সমবেত সমস্ত নিমন্ত্রিত লোকেরা—তার চারপাশে ঘিরে এসে দাঁড়িয়ে তাকে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলো! লোকটাও কিছুতে "একজোড়া" ছাড়া আর কিছুই বলে না—শেষ দু-একজন গোঁয়ার লোক তাকে মারধোর করবার ভয় দেখালে তখন সে নিরুপায় হোয়ে বলে ফেল্লে—আজ্ঞে ঠাকুর আমিও একজোড়া সেই রকম চটীজুতোর জন্যে এসেছি! আমাকেও যদি দয়া কোরে এক জোড়া দেন তাহলে আমিও একআনা দক্ষিণে দিয়ে যাবো!—কথাটা শুনেই চারদিকে হো হো কোরে হাসি উঠলো, তারপর তার কাছে যখন সব ব্যাপারটা আগাগোড়া শোনা হোলো তখন আনিটী কেড়ে নিয়ে—তাকে বেশ কোরে উত্তম মধ্যম দিয়ে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোলো!

চাঁদের দেশে চিঠি

পৃথিবীর বাইরে অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহে সংবাদাদি পাঠানো সম্ভব কি না, তাই নিয়ে পণ্ডিতমহলে খুবই আন্দোলন চলেছে। মার্কিনের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বিজ্ঞানাগারের (Smithsonian Institute) সহকারী

সম্পাদক সি জি এবট বলেন, হয়তো চাঁদের দেশে সংবাদ পাঠান শীঘ্রই সম্ভব হবে। তিনি বলেন যে, এই কাজ এখনই করতে পারা যায়, কিন্তু তাতে ভয়ানক খরচ পড়বে বলে আপাততঃ পারা যাচ্ছে না। এবট স্থির করেছেন যে, অন্যান্য তারার চেয়ে venusএ সংবাদ পাঠানই এখন সুবিধা হোতে পারে। তাঁর মতে venusএ জীবের বাস আছে। কিছুদিন থেকে সিনেটর মার্কনি ও বিনাতারে সংবাদ পাঠাবার জন্য কয়েকজন বড় বড় ওস্তাদ মঙ্গলগ্রহে সংবাদ পাঠাবার চেষ্টা করছেন। তাঁরা কিছুদিন থেকে মঙ্গলগ্রহ থেকে এমন অনেক রকমের ইঙ্গিত পাচ্ছেন যাতে তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস হোয়েছে যে, সেখানে জীবের বাস আছে। এবট কিন্তু এঁদের মতের সঙ্গে একমত হোতে পাচ্ছেন না। তাঁর মতে মঙ্গলগ্রহে কোনো জীবের বাস নেই। তিনি আরও বলেছেন যে, মার্কনি ইত্যাদি পণ্ডিতেরা যে সকল ব্যাপারকে ইঙ্গিত বলে মনে করেন, সেগুলো কোনো প্রাকৃতিক কারণের জন্য হচ্ছে। অবশ্য কি কারণে সে রকম হচ্ছে তা তিনি কিছু বলতে পারেন নি।

লোহার চেয়ে কাচ দড়

বৈজ্ঞনিকরা কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত বলেছেন যে, লোহা, পিতল, তামা প্রভৃতি আবশ্যকীয় ধাতুর চাইতে কাচ অনেক বেশী টেঁকসই জিনিষ। লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতু আছাড় মারলে কাচের মত অত সহজে গুঁড়িয়ে যায় না বটে, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ কোরে কাচই বেশী দিন টিকে থাকতে পারে। লোহা প্রভৃতি ধাতু মরচে পড়ে ক্ষয়ে যায়, নষ্ট হোয়ে যায়, প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে বড় বড় পাহাড় পর্য্যন্ত ক্ষয়ে গুঁড়িয়ে যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা একরকম বলেই দিয়েছিলেন যে, কাচের ক্ষয় নেই। সম্প্রতি একটা ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে আবার আন্দোলনের সাড়া পড়ে গিয়েছে। বিলেতে কোনো এক গির্জ্জার জানালার দামী রঙীন্ কাচগুলো কাগজের মত পাৎলা হোয়ে গিয়েছে দেখে তাঁরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন—ব্যাপার কি! ছ-শো বছর আগে এই কাচগুলো জানলায় লাগানো হয়েছিল। তখনি অন্য অন্য যত সব পুরোণো কাচের জানালার খোঁজ সুরু হোলো। দেখা গেল যে, সবারই প্রায় সমান অবস্থা। এই রকমভাবে কাচ পাৎলা হোয়ে যাবার কারণ কি তাই নিয়ে তাঁরা খুবই আলোচনা করছেন। কিন্তু প্রকৃত কারণ এখনও কেউ আবিষ্কার করতে পারেন নি। কেউ কেউ বলছেন যে, বাতাসে এমন কোন জিনিষ আছে যা কাচকে নষ্ট কোরে ফেলতে পারে। এখনও অনুসন্ধান চলেছে।

ঘোড়া ও মানুষের দৌড়

ঘোড়া ও মানুষে যদি দৌড়ের বাজী হয় তা হোলে কে জেতে? প্রশ্নটা শুনে বোধহয় আপনারা হেসে ফেলেছেন? কিন্তু হাসিটা আপাততঃ একটু সম্বরণ করুন। একটা প্রথম নম্বরের ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া নিয়ে আসুন আর একজন পয়লা নম্বরের ছুটীয়ে-মানুষ নিয়ে আসুন (লম্বা দৌড়ে যার অভ্যাস আছে)। একশ' মাইল দৌড়তে হবে। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া টেনে মেনে ষাট মাইল ছুটে গিয়ে সেই যে পড়বে সে আর সাত দিন উঠবেই না, (অবশ্য যদি বেঁচে থাকে) কিন্তু মানুষটি ঠিক দৌড়তে দৌড়তে একশ'মাইল পার হোয়ে যাবে। একজন লোক একশো মাইল সাড়ে তেরো ঘন্টার মধ্যে দৌড়ে পার হয়েছে। এ পর্য্যন্ত কোনো ঘোড়া তা পারে নি। ১৮৮৪ অব্দে পি ফিট্‌সজেরাল্ড নামে একজন লোক একশ নয় ঘণ্টা আঠারো মিনিট বিশ সেকেণ্ডে পাঁচ শত মাইল দৌড়ে পার হয়েছিল। ঘোড়া তো দূরের কথা, আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোনো জন্তুই এ কাজ করতে পারে নি।

উইলিয়াম গেল্ নামক এক ব্যাক্তি দেড় হাজার মাইল রাস্তা এক হাজার ঘণ্টায় হেঁটে পার হয়েছিল। কোনো চতুষ্পদ জীবের দ্বারা এ-কাজও সম্ভব হয়নি। আসল কথা মানুষের দেহে যত সহ্যগুণ আছে এত আর পৃথিবীর কোনো জীবের নাই। অন্যান্য জীবের মাংসপেশীর শক্তি বেশী থাকতে পারে, কিন্তু মানুষের বুদ্ধি এবং দৃঢ়তা তারা কোথায় পাবে?

বৈঠক

একত্রিশ বছর আগে ২৯শে জুলাই তারিখে রাত্রি দুটোর সময়ে(ইংরেজী মতে ৩০শে জুলাই) বীরসিংহের বীরশিশু বাংলার আবাল বৃদ্ধ বনিতার "বিদ্যাসাগর মশায়ের" মৃত্যু হয়। মানুষ রূপী এই ক্লীব, স্বার্থপর, নির্ম্মম পশুর দেশে তিনি এসেছিলেন সত্যিকারের মানুষ হোয়ে। আজকের এই দিনে—দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, ততোধিক নৈতিক দুর্দ্দিশার দিনে বাংলার তরুণ প্রাণ তোমায় আহ্বান করছে—এস তুমি বিদ্যাসাগর মশায়, এই নব যুগে তুমি বাংলার প্রাণে এসে অধিষ্ঠিত হও। দেশে বিদ্যাসাগরের অভাব নেই; কিন্তু "বিদ্যাসাগর মশায়ের" অভাব আজ আমাদের প্রতিপদেই অনুভব করতে হচ্ছে। তুমি আবার এস দেশের মণি—তোমার চটিজুতো দিয়ে এই কপট, ভণ্ড, স্বার্থান্বেষী, নিষ্ঠুরদের সিধে কোরে দিয়ে যাও। তুমি আমাদের ধর্ম্মে এস, কর্ম্মে এস, জাতীয় জীবনে চিরস্থায়ী হোয়ে এস। তোমার শ্রাদ্ধ বাসরে আজ এই মন্ত্র দিয়ে তোমার তর্পণ করি।

কয়েকমাস দেশের কাজে লেগে থাকলে স্বরাজ পাওয়া যাবে মনে কোরে যাঁরা ওকালতী ছেড়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই এখন নিরাশ হোয়ে নিজের নিজের ব্যবসায়ে ঢুকে পড়ছেন। চট্টগ্রামের যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এই দলের অন্যতম। কৈফিয়ৎ দেবার ছলে তিনি বলেছেন যে, তাঁর আর চল্‌ছে না। যতীন্দ্রমোহনকে চট্টগ্রামের লোকেরা দেবতার মতন ভক্তি করে, তবুও তাঁর চল্‌ছে না। যতীন্দ্রমোহন কি রকম চালে চলতে চান? যারা দেশের কাজে নামে তাদের চাল আর সৌখীন দেশভক্তদের চাল সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। যতীন্দ্রমোহন বলেছেন যে, তিনি আবার ব্যবসায়ে ঢুকছেন বলে দুঃখিত নন। অবশ্য একথা জানাবার কোন আবশ্যকই ছিলনা, কারণ দুঃখিত হোলে এ-কাজ তিনি করতেন না। বাংলা দেশে আর ক-জন ধনী অসহযোগী আছেন? তাঁদের ঠিক চল্‌ছে তো?

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক এল্‌মহার্ষ্ট গত ২৮শে জুলাই তারিখে বিশ্বভারতী সম্মিলনীতে আমাদের দেশের গ্রাম ও চাষ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়েছেন। এল্‌মহার্ষ্ট যা বলেছেন সে কথা আমাদের দেশের সকলের বিশেষ কোরে ভেবে দেখার বিষয়। এ আমাদের জীবন-মরণের সমস্যা। তিনি বাংলা দেশের বিশেষ কোন একটি জেলার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদের দেশের মাটির উর্ব্বরতা দিনে দিনে কমে আসছে। শীঘ্রই এমন দিন আসবে যখন দেশের মাটির উৎপাদিকা শক্তি আর থাকবে না। আমরা মাটি থেকে যেমন খাবার পাই তেমনি মাটিরও খাদ্য প্রয়োজন। সে যদি তা না পায় তা হোলে আমাদের সে আর খাবার দেবে না।

তিনি আরও বলেন, আমাদের দেশে সমাজ যখন প্রবল ছিল তখন প্রত্যেক গ্রামে সেই গ্রামবাসীদের প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যই উৎপন্ন হোতো। মাটি যেমন মানুষকে খাবার দিত, মানুষকেও তেমনি মাটিকে খাবার দিতে হোতো। প্রত্যেক গ্রামে গ্রামবাসীদের পানীয় জলের এবং জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা হোতো। কিন্তু এখন গ্রামের আর সে অবস্থা নাই; গ্রামে যা উৎপন্ন হয় সহর তা খেয়ে ফেলে; তার পরিবর্ত্তে সহর গ্রামকে কিছুই দেয় না। তখন প্রত্যেক লোক সমাজের জন্য বাঁচতো, সমাজকে সমৃদ্ধ কোরে তোলাই ছিল তাদের প্রধান কাজ। কিন্তু সহরে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় লোকে নিজেকে ধনী করবার দিকেই মন দিয়েছে—সমাজের সর্ব্বনাশ কোরে। ফলে একটা গ্রামে একজন ধনী হওয়ার বদলে সমস্ত গ্রাম ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে।

গ্রামের লোকেরা পেট ভরে খেতে পাচ্ছে না বলে তাদের জীবনীশক্তিও কমে আসছে। তিনি দেখেছেন যে, পেট ভরে খাবার খাওয়ার চেয়ে পেট ভরে মদ খেতে কম পয়সা লাগে বলে, ক্ষিধের জ্বালা মেটাবার জন্য দরিদ্র চাষীরা মদ খায়। এই রকমে তারা মৃত্যুর মুখে এগিয়ে চলেছে। এর ওপরে ম্যালেরিয়া ইত্যাদি ব্যাধি ও মধ্যে মধ্যে মহামারী তো আছেই।

একদিকে দেহের ক্ষুধা মিটছে না বলে যেন তারা মরণের মুখে এগিয়ে চলেছে তেমনি অন্যদিকে তাদের চিত্তের ক্ষুধাও মিটছে না বলে তারা নানারকম কদর্য্য সংস্কারের বশীভূত হোয়ে পড়ছে। তাতে তাদের চিত্তও কলুষিত হোয়ে যাচ্ছে। গ্রামে সাধারণ শ্রেণীর লোকদের চেয়ে যারা একটু উচ্চ অর্থাৎ যাদের কাছে থেকে সাধারণ লোকেরা উন্নত হবে, সহর তাদের টেনে নিচ্ছে। ফলে তাদের সাহচর্য্য থেকে গ্রামবাসীরা বঞ্চিত হচ্ছে। এই রকমে গ্রামবাসীদের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক মৃত্যু হচ্চে। দেশের হিতকারীরা এ বিষয়ে একবার চিন্তা করবেন।

অধ্যাপক এল্‌মহার্ষ্ট যুবক মাত্র। তবে তিনি সেই জাতীয় লোক, যাঁদের কাছে দেশ, জাতি, ধর্ম্মের কোনো পার্থক্য নাই। তিনি এসেছেন আমাদের দেশের সেবা করতে, এবং নিজে বীরভূমিতে একটি আদর্শ গ্রাম করবার জন্য অক্লান্ত ভাবে চেষ্টা করছেন। তাঁর কার্য্যের বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া অসম্ভব। আমাদের দেশের যে সব ছেলে দেশের কাজ করতে চান তাঁরা এই দিক দিয়ে একবার চেষ্টা কোরে দেখুন না। সকলকেই যে রাজনীতি করতে হবে তার কোনো মানে নেই। দেশের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কাজ—দেশের নরনারীদের বাঁচাতে চেষ্টা করা।

১ম বর্ষ] ১৩২৯ [৪র্থ সংখ্যা

ঈশ্বর

সচিত্র পাক্ষিক পত্র

কার্য্যালয়
২০৮।২এক, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রতিসংখ্যা
এক আনা

বার্ষিক মূল্য ২৵০
দুই টাকা দুই আনা।

বৈঠকের নিয়মাবলী

বৈঠকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ দুই টাকা দুই আনা; ভিঃ পিঃ মাশুল স্বতন্ত্র। প্রতি সংখ্যার জন্য এক আনা। নমুনারও মূল্য লাগে। যে কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া চলে। মূল্য সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়।

রিপ্লাইকার্ড কিংবা টিকিট না পাঠাইলে কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রবন্ধাদি বৈঠকের দুই পৃষ্ঠা বড় জোর আড়াই পৃষ্ঠা অপেক্ষা দীর্ঘ না হয়। টিকিট পাঠাইলে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে কিনা তাহা জানানো হয়। মনোনীত অথবা অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত পাঠান হয় না।

বিজ্ঞাপন

মলাটের চারের পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যা—৮৲

অন্যান্য পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যা—৬৲

অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—৩।৹

কলমের প্রতি ইঞ্চি একবৎসরের চুক্তিতে প্রতিসংখ্যা—১৲

কলমের প্রতি ইঞ্চি প্রতিসংখ্যা—২৲

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়

ম্যানেজার বৈঠক

২০৮।২ এফ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এজেণ্ট :—শ্রীপরেশনাথ মিত্র

১৩২নং বাগমারি রোড, কলিকাতা।

(আনন্দ বাজার পত্রিকার সৌজন্যে)

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, কলিকাতা। ১০৩২।২২

১ম বর্ষ]   ১লা ভাদ্র, ১৩২৯   [৪র্থ সংখ্যা

গাল-গল্প

বাপ ছেলেকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়ে দিতে এসে ক্লাশের মাষ্টার মশায়কে বল্লেন— দেখুন আমার ছেলেটী বড় ভাতু, ওকে কিছু বলবেন না।

মাষ্টার। কিন্তু ও যদি দুষ্টুমি করে?

ছেলের বাবা। দুষ্টুমি করলে আপনি ওর পাশের ছেলেটীকে ধরে প্রহার দেবেন, তার কান্না দেখলে ও ভয়ে আর কোন গোল-মাল করবে না।

——

চাটুয্যে। বিলেতে দিনরাত ইংরিজিতে কথা বলতে তোমার কষ্ট হোতো না?

মুখুয্যে। ক্ষেপেছো! বরং আমার কথা বুঝতেই তারা প্রাণান্ত হোতো।

——

বন্ধুদের আড্ডায় নরসিংহ এসে বল্লে— আমি এক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে একটা বিদ্যা শিখেছি।

বন্ধুরা। (আশ্চর্য্য হোয়ে) কি বিদ্যা!

নরসিংহ। আমায় আধ-সের সন্দেশ এনে দাও, তোমাদের সামনে বসে খাব কিন্তু তোমরা তা দেখতে পাবে না।

এক বন্ধু। আর যদি দেখতে পাই! কত বাজি?

নরসিংহ। আচ্ছা চার আনা বাজি।

সন্দেশ আনার পর নরসিংহ সবার সামনে বসে একটি একটি কোরে সব কটি খেয়ে ফেল্লে।

বন্ধুরা সবাই বল্লে—আমরা সবাই তোমার খাওয়া দেখতে পেলুম যে।

নরসিংহ। (ট্যাঁক থেকে একটা সিকি

বার করতে করতে) হ্যাঁ ভাই বাজিটা হেরে গেলুম ; এই নাও চার আনা।

ভুলু সেদিন পাড়া কাঁপিয়ে বাড়ী মাতিয়ে কাঁদতে কাঁদতে স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে এল। তার বাবা তার অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে কি! কাঁদছিস কেন ?

ভুলু। মাষ্টার মেরেছে—এ—এ—এ!

বাবা। কেন! মাষ্টার মারলে কেন ? মাষ্টারের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিস্-নি বুঝি ?

বাপের কথা শুনে ভুলু গোঙাতে গোঙাতে যা বল্লে তার তাৎপর্য্য এই যে, সেদিন মাষ্টার ক্লাসে এসে একটি মাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সে প্রশ্নের উত্তর ক্লাসের কোনো ছেলেই দিতে পারলে না ; একমাত্র সে ছাড়া।

ভুলুর কথা শুনে তার বাবা আশ্চর্য্য হোয়ে জিজ্ঞাস করলেন—মাষ্টার কি প্রশ্ন করেছিল ?

ভুলু। মাষ্টার মশাই ক্লাসে এসে দোয়াতে কালির বদলে থুতু-ভরা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—এ কাজ কে করেছে ? ক্লাশের কোন ছেলেই সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে না। শেষে আমি সঠিক উত্তর দিতেই মাষ্টার মশায় আমায় ধরে মারলে।

এক বক্তা "ভবিষ্যৎ" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বক্তৃতা দিতে দিতে তিনি দেখতে পেলেন যে, তার সামনেই একটি ভদ্রলোক একটি ফ্রক-পরা শিশুকে নিয়ে বসে আছেন। বক্তৃতাটা একটু বেশী কোরে হৃদয়গ্রাহী করবার জন্য সেই শিশুটিকে ডেকে নিয়ে এসে শ্রোতাদের বলতে লাগলেন—ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে কে জানে ? এই শিশু ভবিষ্যতে নেপোলিয়ানের মত বীর হোতে পারে ; জগদীশ বসুর মত বৈজ্ঞানিক অথবা কলম্বাসের মত আবিষ্কারক হওয়াও কিছু আশ্চর্য্য নয়। কিংবা রবিন্সন ক্রুশোর মত দুঃসাহসিকও হোতে পারে। আজ এর বাপ মা আদর কোরে যে নাম রেখেছে—

এইখানে বক্তা একটু থেমে শিশুটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার নাম কি খোকা ?

উত্তর হোলো—কুমারী শোভাময়ী দেবী।

সেদিনের মত বক্তৃতা ভেঙে গেল।

ছুটো খবর

লাল মাছ কখনো ঘুমোয় না।

গুজরাটের রাস্তার কুকুরগুলোর ডাক বাংলা দেশের শেয়ালের মত।

ই-আই-রেল কোম্পানীর সর্ব্বসমেত দু-হাজার চারশো বাষট্টি মাইল লাইন পাতা আছে।

কলকাতার থিয়েটার ও বায়স্কোপের চেয়ারের ছারপোকারা যেমন নিরুপদ্রবে মানুষের রক্ত চুষ্‌তে পায় তেমন আর কোথাও পায় না।

টম মরিস নামক একজন অষ্ট্রেলিয়ান হাত-পা বাঁধা অবস্থায় টেমস নদীতে পড়ে আধ-মাইল সাঁতরে গিয়েছিলেন; এই কাজ করায় ইউরোপ-ময় তাঁর জয়-জয়কার পড়ে গিয়েছে।

প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হাত পা বাঁধা অবস্থায় সাঁতার কাটিতে পারেন, এ আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। চারুবাবু কলকাতার সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের একজন উদ্যোগী সভ্য।

লণ্ডনের এক ফলওয়ালার পকেট থেকে একটা ব্যাগ পড়ে গিয়েছিল। ব্যাগের মধ্যে পনোরো হাজার টাকার নোট ছিল। ফলওয়ালা কাগজে বিজ্ঞাপন দেয় যে তার ব্যাগ এনে দেবে তাকে সে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করবে। একটি মেয়ে সেই ব্যাগটা কুড়িয়ে পেয়ে ফলওয়ালাকে গিয়ে ব্যাগটা ফিরিয়ে দেওয়ায় ফলওয়ালা তাকে বারোটি কলা পুরস্কার দিয়েছে।

লণ্ডনের এক দোকানদার দোকানের সামনে বিজ্ঞাপন দিয়েছে;—আমাদের জিনিষ দেখে যদি অন্য দোকানের চেয়ে ভাল না মনে হয়, তা হোলে এই গলির মোড়ে যে অন্ধদের হাসপাতাল আছে সেখানে গিয়ে ভর্ত্তি হোয়ে পড়।

খোকার কথা

প্রত্যেক কচি ছেলের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কুড়ি ঘণ্টা ঘুমোনো দরকার। ছ-মাসের ছেলের ষোল ঘণ্টা ঘুমোনো চাই-ই। ছেলে এক বছরের হোলে তখনও অন্ততঃ তের চৌদ্দ ঘণ্টা তার গাঢ় ঘুম দরকার। হৃষ্ট পুষ্ট সুস্থ সবল ছেলেদের রাত্রি দশটা থেকে ভোর ছ-টা পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ঘুম হওয়া উচিত।

যে ছেলে রাত্রে ছট্‌ফট্ করে আর দিনে ঘুমোয় না, তারা আর ওজনে বাড়তে পারে-না, ক্রমে ফ্যাকাশে, দুর্ব্বল আর কাঁদুনে হোয়ে পড়ে। এই রকম ছেলেকে নিয়ে তাদের মায়েরা একেবারে বিব্রত হোয়ে পড়েন। রোজ রাত্রে যদি ছেলেটা ঘুমোতে না দেয় তা হোলে কোনও মারই স্বাস্থ্য ঠিক থাক্‌তে পারে না।

রাত্রে ছেলের না ঘুমোবার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে, ছেলেকে রাত্রে দুধ খাওয়ানো! গোড়া থেকে ছেলে যদি বোঝে সে রাত্রে উঠ্‌লেও কিছু খেতে

পাবার সম্ভাবনা নেই তা হোলে সে আর ভোরের আগে উঠ্‌বে না। প্রথম দু-একদিন উঠ্‌লে তাকে একটু কেবল গরম জল খাইয়ে চাপ্‌ড়ে-চুপ্‌ড়ে বাতাস কোরে ঘুম পাড়িয়ে ফেলবার চেষ্টা করলেই খোকা ঘুমিয়ে পড়বে।

রাত্রে দুধ খাওয়া যদি খোকার অভ্যেস হোয়ে গিয়ে থাকে তা হোলে আস্তে আস্তে তার সে অভ্যেসটা ছাড়াতে হবে। দুধের ভাগ ক্রমে কমিয়ে এনে জলের ভাগ বাড়িয়ে গেলেই ছেলে শীগগিরই বুঝতে পারবে যে, গরম জল খাবার জন্যে রাত্রে ওঠাটা নেহাৎ একেবারে পণ্ডশ্রম।

ছেলে যদি দিনের বেলা যখন তখন যেখানে-সেখানে ঘুমিয়ে পড়ে; দিনে ঘুমোনোর যদি কোনও বাঁধা ধরা নিয়ম না থাকে তা হোলে সে ছেলেও রাত্রে ছট্‌ফটে আর ঘ্যান-ঘেনে হোয়ে উঠে। দিনে ঘুম পাড়াবার যদি একটা স্থান কাল নির্দ্দিষ্ট কোরে দেওয়া হয় তা হোলে ছেলেরও রোগ সেরে যেতে পারে।

ছোট ছেলের অনিদ্রার আরও প্রধান কারণ হচ্ছে—খাওয়ানোর ভুল—অতিরিক্ত খাওয়ানো, কম খাওয়ানো বা বাজে জিনিস খাওয়ানো। এ-ক-টা দোষেই ছেলের ঘুমের ব্যাঘাত হয়। আর একটা বিষয়ে সকল মারই বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত যে, ছেলের বদ-হজম হচ্ছে কি না,—পেট ব্যথা করছে কিনা—বা পেট ফাঁপ্‌ছে কিনা দেখা—। এ রকম কিছু হোলে ছেলে শান্ত হোয়ে ঘুমোতে পারে না।

বাইরের নির্ম্মল বাতাস পেলে ছেলে চট্‌ কোরে ঘুমিয়ে পড়ে, তবে ছেলেকে বেশ কোরে ঢেকে ঢুকে হাওয়া খাওয়ানো উচিত। হঠাৎ যদি ছেলের ঘুম ভেঙে যায়, তা হোলে বুঝ্‌তে হবে হয় তার শীত করছে, নয় তার লেপ কাঁথা কিছু ভিজে গেছে, কিম্বা শোয়ার কোনও অসুবিধে হচ্ছে। শিশু পালনে পারদর্শিনী যে কোনও মা ছেলের সে অসুবিধেটুকু ঠিক্‌ বুঝতে পেরে—সেটার সুব্যবস্থা করেন।

ছেলে কাঁদছে বলে কখনও তাকে অসময়ে কিছু খেতে দেওয়া উচিত নয়। বিছানা থেকে ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে চাপ্‌ড়ে-চুপ্‌ড়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করাও উচিত নয়। ছেলেটা কেন যে রাত্রে ঘুমুচ্ছে না যদি না বুঝতে পারা যায়, তা হোলে ডাক্তার দেখানো উচিত। বেশীদিন ছেলের অনিদ্রাকে প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নয়, তাতে পো-পোয়াতির দু-জনেরই অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা।

মুখের ওপর খাদ্যের প্রভাব

ভিন্ন ভিন্ন খাবারে মনের ওপর ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব বিস্তার করে। একথা আমাদের

দেশের শাস্ত্রেও লেখা আছে। আর আমরা সাধারণ জীবনের মধ্যেও তা প্রত্যক্ষ কোরে থাকি। কিন্তু আপনারা শুনলে আশ্চর্য্য হবেন যে, এক এক রকম খাদ্য মুখের চেহারাও বদলে দিতে পারে। কি খাবারে মুখের চেহারা কি রকম কোরে দেয় পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকরা তা অনুসন্ধান কোরে বার করেছেন। তাঁরা বলেন যে, অতিরিক্ত আলু খেলে ওষ্ঠ একটু বেশী লম্বা হোয়ে যায় আর নাকটা থেবড়া হয়। আয়র্ল্যাণ্ডের চাষা শ্রেণীর লোকদের এই রকম চেহারা। তারা বেশীভাগ আলু খেয়েই জীবন ধারণ করে। বংশানুক্রমে এই আলু খেয়ে খেয়ে তাদের এই রকমের চেহারা হোয়ে গিয়েছে। যে খাবারে বেশী শ্বেতসার (Starch) আছে সে রকম খাবার খেলে মুখের চেহারা চোয়াড়ে হোয়ে যায়। নিরামিশ খাদ্য—যেমন আলু, কলা ইত্যাদিতে শ্বেতসার বেশী আছে। অনেকে বলেন যে, নিগ্রোদের বোঁচা নাক, চওড়া মুখ আর ওল্টানো ঠোঁটের কারণও নাকি এই নিরামিষ ভক্ষণ। অবশ্য এক পুরুষে তাদের এই চেহারা হয় নি, বহুকাল ধোরে অতিরিক্ত শ্বেতসার পেটে গিয়ে গিয়ে ক্রমশঃ তাদের মুখের চেহারা এই রকম দাঁড়িয়েছে। যারা কেবলমাত্র নিরামিষ খায় তাদের মুখের ওপর শীঘ্রই বলিরেখা পড়ে। যারা মাছ মাংস নিরামিষ সবই খায় তাদের মুখে বলিরেখা পড়তে দেরী হয়। এর কারণ চর্ব্বিবিহীন খাদ্যে শীঘ্রই বার্দ্ধক্য আনে। অবশ্য নিরামিষের সঙ্গে যদি উপযুক্ত পরিমাণে দুধ ও ঘি খাওয়া যায় তবে তত শীঘ্র বলিরেখা দেখা দেয় না। উত্তর স্পেনে বাস্ক নামে এক জাতি আছে। তাদের থুতনিটা চেপ্টা ও ছুঁচোলো। তাদের এই অদ্ভুত থুতুনি দেখলেই বাস্ক্‌জাতি বলে চিন্‌তে পারা যায়। অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে যে, পেঁয়াজ খেয়ে খেয়ে তাদের এই অবস্থা হয়েছে। বাস্ক্‌রা ভয়ানক পেঁয়াজ-খোর জাত। অল্প পরিমাণে পেঁয়াজ খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভাল, কিন্তু পেঁয়াজে এক রকম গন্ধক জাতীয় তেল(Sulphurous oil) আছে। এই তেলে মুখের তলার দিকের মাংসপেশীর তন্তুকে আলগা কোরে দেয়। বেশী মদ খেলে মুখের মাংসপেশীর তন্তুও আলগা হোয়ে যায়। মাতালদের ছেলে-পিলেদের প্রায়ই এই রকম কদাকার থুতুনী হোতে দেখা যায়। সাংঘাতিক মাতাল যারা, তাদের ছেলেদের মুখে প্রায়ই দাড়ি গোঁফ হয় না। আর মাথার চুলও অত্যন্ত পাৎলা হয়।

এস্কিমোদের চোখ হয় অত্যন্ত ছোট ছোট। বিজ্ঞান বলেন যে, অতিরিক্ত মাছ খাওয়ার ফলে তাদের চোখ এই রকম হয়েছে। যে সকল জাতি প্রায় মাছ খেয়েই জীবন ধারণ করে, তাদের সবারই এই রকম

ক্ষুদ্রাকৃতি চোখ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যারা মাংস খেয়ে জীবন ধারণ করে তাদের চোখ বেশ বড় হয়। এস্কিমোদের মধ্যে পরীক্ষা করা গিয়েছে, যে সকল এস্কিমো পরিবার তিন চার পুরুষ ধরে কেবল মাংসই খেয়ে আসছে, তাদের চোখ মাছখোর এস্কিমোদের চেয়ে অনেক বড় হোয়েছে।

ঠোঁটের ওপর চিনির অদ্ভুত প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। যে সকল শিশু মিষ্টি খেতে খুব ভালবাসে আর যাদের খুব মিষ্টি খেতে দেওয়া হয় সাধারণতঃ তাদের অধরোষ্ঠ বড় হয়। চিকিৎসকেরা Sugar-mouth দেখলেই চিনতে পারেন। বেশী চা পান করলেও মুখের চেহারা বদলে যাবে। চা'তে ট্যানিক এ্যাসিড আছে, এই ট্যানিক এ্যাসিডে মাড়ি কুঁচকে যায়; ফলে যারা বেশী চা খায় তাদের দাঁতগুলো আলগা হোয়ে যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামনের দাঁত উঁচু হোয়ে ঠোঁট ছাপিয়ে বেরিয়ে আসে।

বংশানুক্রমে অর্দ্ধাহার অথবা পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করতে না পেলে ক্রমেই মাথা ছোট হোয়ে আসে ও মাথার সামনের দিকটা সরু হোয়ে যায়। আমাদের দেশের চাষাদের মাথা প্রায়ই এই রকম।

আমাদের সমাজ

[এই নিবন্ধে আমাদের সামাজিক সংবাদ থাকবে। কি রকম সংবাদ থাকবে তা পাঠকেরা নীচের সংবাদ কয়টী দেখলেই বুঝতে পারবেন। আমরা সাধারণের কাছ থেকে এই শ্রেণীর সামাজিক সংবাদ চাইছি; যদি কেউ অনুগ্রহ কোরে দেন তা হোলে আমরা আনন্দের সঙ্গে তা পত্রস্থ করব। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নানা কারণে আমরা নাম ধাম প্রকাশ করতে পারছি না। ভবিষ্যতে সম্ভব হোলে তাও প্রকাশ করবো। দুর্ণীতি প্রচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, দুর্ণীতি দূর করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এবারে যতগুলি সংবাদ দেওয়া যাচ্ছে তার সব কটি সম্বন্ধে আমরা খোঁজ নিয়েছি এবং সেগুলিতে কোন মিথ্যার অবতারণা নাই। বৈঃ সঃ]

১। কলকাতার কোনো বিখ্যাত পরিবার। কর্ত্তা বেঁচে নেই, তিনি চার্ব্বাক-পন্থী ছিলেন। বিষয়-আশয় বেশ ছিল তা প্রায় সবই উড়িয়ে গেছেন। ছেলে নেই গুটিকয়েক মেয়ে আছে, ছোটটি ছাড়া সবকটির বিয়ে হোয়ে গেছে। সম্প্রতি একটি মেয়ে মারা যাওয়ায় জামাই বাবাজীবন বড়ই মুস্কিলে পড়েছেন। সংসার চলে না, নিজে আইন-ব্যবসায়ী, আফিসের কাজ কর্ম্ম দেখতে হয়, এদিকে বাড়ীতে দেখে কে? আবার একটি মেয়েও ডাগর হয়েছে, তারও বিয়ের সম্বন্ধ করতে হচ্ছে, কাজেই একটি গৃহিণী না হোলে আর চলে না। অনেক ভেবে চিন্তে জামাইটি একটি বিবাহ করাই স্থির কোরে ফেল্লেন।

সম্বন্ধ চলছে দেখে শ্বশুরবাড়ী থেকে

আবার সম্বন্ধ এল—ছোট শালীটিকে বিয়ে কর না—

জামাইতো হাত না পাততেই চাঁদ পেয়ে বর্ত্তে গেলেন। তিনি জানালেন—এতো ভালোই হোলো; বিয়ে যখন করতেই হবে তখন জানা-শুনো শ্বশুরবাড়ীতে করাই ভাল।

ছোট শালীটির বয়স চৌদ্দ পনেরো। সে কিন্তু ভগ্নীপতিকে বিয়ে করতে অত্যন্ত নারাজ। মাস দুয়েক আগে তার দিদি মারা গিয়েছে, এরি মধ্যে সেই দিদির জায়গায় গিয়ে বসতে তার সমস্ত বৃত্তিগুলো বিদ্রোহী হোয়ে উঠলো। তারপর কান্নাকাটি, মারধর, বোঝা-পড়ার পালা। সকলে মেয়েটীকে বোঝালেন যে—ভগ্নীপতিকে বিয়ে করা একটা বরাতের কথা; কারণ তাতে একসঙ্গে দুটো সম্পর্ক হয়। প্রথমে শালী তার ওপরে স্ত্রী। মেয়ে কিন্তু কিছুতেই রাজী নয়। এইভাবে পাকা দেখা আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত হোয়ে গেছে। বিবাহও হোয়ে যাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ করবার কারণ এখনও উপস্থিত হয় নি। কন্যার অমতে এমন বিয়ে দেওয়া উচিত কিনা পাঠকদের কাছে আমরা সে জিজ্ঞাসা করছি।

২। কলকাতার কাছে একটি গ্রামের এক ব্রাহ্মণ পরিবার; পরিবারের একটি মেয়ে দশ বছর বয়সে বিধবা হয়। মেয়ের বৈধব্য দেখে মেয়ের মা আবার মেয়ের বিবাহের কথা পাড়লেন। কিন্তু মেয়ের বাপের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সাহসের অভাবে তিনি বিবাহ দিতে পারেন-নি। সম্প্রতি মেয়ের মা মেয়েকে কলকাতায় নিয়ে এসে তার বিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। এই সম্পর্কে মেয়ের এক ভগ্নীপতি সমস্ত বন্দোবস্ত কোরে দিয়েছিলেন। যিনি এই মেয়েটিকে বিবাহ করেছেন তাঁর বাড়ী কলকাতার কাছেই কোনো একটি গ্রামে। বিধবা বিবাহ করার জন্য ছেলের গ্রামের লোকেরা তার ওপর কি রকম ব্যবহার করছে সে সংবাদ আমরা পাই-নি। কিন্তু মেয়ের গ্রামে এই নিয়ে খুব হৈ-চৈ চলেছে। বাংলা দেশে পয়সার অভাবে কুমারী মেয়েরই বিবাহ হওয়া দায়। অনেক পিতামাতাই বিধবা মেয়ের বিবাহ দিতে রাজী আছেন কিন্তু বাংলার ছেলেরা—যারা দেশের জন্য কথায় কথায় প্রাণত্যাগ করতে চায়, অস্পৃশ্যতা তুলে দেবার জন্য লম্বা লম্বা বক্তৃতা ছাড়ে, নারীর দুঃখে মাসিক পত্রে শোকের প্রবাহ বহিয়ে দেয়—তারা পয়সা না হোলে কিন্তু কুমারী মেয়েকেই বিয়ে করতে রাজী হয় না—বিধবা তো দূরের কথা।

আমরা এই নবদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করছি, তারা চিরকাল সুখে থাক। আর

আর যাঁরা এই কাজে সাহায্য করেছেন তাঁদের দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল হোক।

৩। উপরি উপরি কয়েকটা বধূ নির্য্যাতনের মামলা হোয়ে গেল। স্ত্রীর ওপর অমানুষিক অত্যাচার করার জন্য কয়েকজনের সাজাও হোয়ে গেছে। অবশ্য এদের সাজা হওয়ায় সামাজিক উপকার হয়। কিন্তু যারা স্ত্রীর শরীরের ওপর অত্যাচার না কোরে তাদের মনের ওপর অত্যাচার করে তারাও কম অপরাধী নয়। অনেক স্বামী স্ত্রী বর্ত্তমানে অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত; অনেক স্বামী এক স্ত্রী বর্ত্তমানে আর একটি বিবাহ কোরে দ্বিতীয়া পত্নীর সঙ্গে সংসার ধর্ম্মপালন করছেন। এরা অপরাধী হোলেও আমাদের দেশের আইনে এদের সাজা দেবার কোনো ব্যবস্থা নাই। আইনতঃ যে সকল অপরাধীকে দণ্ড দেবার ব্যবস্থা নাই, তাদের সামাজিক দণ্ড দেবার ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু আমাদের দেশের সমাজ একমাত্র নারীকে দণ্ড দেবার ব্যবস্থাই কোরে রেখেছে-- তার প্রধান কারণ, নারীরা সেই দণ্ড মাথা পেতে স্বীকার করে বলে। আমরা শুনলুম যে, বধূ-নির্য্যাতনের মামলার বিচার করেছেন এমন কোনো ধর্ম্মাধিকরণ এক পত্নী বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও আর একটি বিবাহ কোরে দ্বিতীয়াকে নিয়ে সংসার করছেন। দুর্দ্দৈব আর কাকে বলে?

৪। গত ১২শে শ্রাবণ তারিখে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কনিষ্ঠা কন্যার সহিত লেফট্- কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্রের শুভ বিবাহ হোয়ে গিয়েছে। বিবাহ হিন্দুমতে সম্পন্ন হয়েছে। চিত্তরঞ্জন তাঁহার দুই কন্যাকেই অসবর্ণ পাত্রের হাতে সমর্পণ করলেন। তাঁহার সৎসাহস ধন্য। তিনি দেশকে যে শুধু রাজনৈতিক নিগড় থেকে মুক্তি দিতে চান, তা নয়, সামাজিক নিগড় অর্থাৎ যে নিগড় আমাদের দুর্দ্দশার মূল তা থেকেও তিনি দেশকে মুক্তি দিতে চান। আরও প্রশংসার কথা তিনি যা মুখে বলেন নিজের জীবনেই তা কোরে দেখিয়ে দেন। এরকম দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে দুর্লভ। উপেন্দ্রনাথের সৎসাহসও ধন্য।

পরলোকগত বাল গঙ্গাধর তিলক

গত ১লা আগষ্ট লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের দ্বিতীয় বাৎসরিক শ্রাদ্ধ দিবসে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশেই তাঁর স্মৃতি উৎসব হয়েছিল।

কলকাতায় নামরক্ষা গোছের একটু আয়োজন হয়েছিল।

মুক্তির মুহূর্তে

(সত্য ঘটনা)

"কেঁদোনা মা অশ্রু দুর্ব্বলতার চিহ্ন!"

"তোর ছেলের জন্য আমি কাঁদিনিরে, তোকে বুকে ধরে গর্ব্বে-গৌরবে, স্বদেশপ্রেমে, মাতৃস্নেহে আমার হৃদয় উদ্বেল হোয়ে উঠ্ছে —আজ আর কোনো বাধা মান্‌ছে না!"

প্রভাতের প্রথম আলোয় লক্ষ্ণৌ জেলের বিরাট লৌহ-দ্বারে জনৈক বৃদ্ধ আর এক বর্ষীয়সী নারী, সঙ্গে চাঁদের মত একটী দেব-শিশুর হাত-ধরা অনিন্দ্য-সুন্দরী এক তরুণীকে নিয়ে একটী যুবকের সঙ্গে আলাপ করছিলেন।

যুবক বলিষ্ঠ ও প্রিয়দর্শন, পরিধানে তার শুভ্র উজ্জ্বল নিষ্কলঙ্ক খদ্দর। স্বদেশী প্রচার করতে গিয়ে ছ-মাসের জন্য সে কঠোর কারাদণ্ড বরণ কোরে নিয়েছিল!

* *

"বাপু!—"

চাঁদের মত দেবশিশু—সবে দু-বছর হবে তার বয়েস, ছুটে গেল দু-হাত বাড়িয়ে সেই যুবার দিকে—যেন কোন এক স্বর্গের হাসি হেসে। যুবকের সস্নেহ দৃষ্টি এসে পড়লো তখন তার প্রিয়তমার নির্ভীক হাসি মুখের ওপর—তার প্রাণাধিক পুত্রের সর্ব্বাঙ্গে—! যেন নতুন কোরে সেদিন ওদের চোখে পুরে উঠলো প্রগাঢ় অনুরাগের বাষ্প, কানায় কানায়!

রুদ্ধকণ্ঠ ভেদ কোরে স্নেহ-কম্পিতস্বরে পিতৃহৃদয়ের ক্ষুধিত আহ্বান সজোরে বেরিয়ে এল —"বাপী!"

পিতার আলিঙ্গনের মধ্যে নিশ্চিন্তভাবে নিজের স্থান কোরে নিয়ে—কাঁধে মাথা দিয়ে গালে গাল দিয়ে শিশু যখন বিপুল সোহাগে আর একবার ডাক দিলে—'বাপু!'—যুবক তাকে বুকের ভিতর আরও নিবিড় কোরে টেনে নিয়ে ললাটে আশিস্ চুমু এঁকে দিলে। অন্তরের মধ্যে তখন তার আনন্দের তাণ্ডব নৃত্য চলেছে!

"বাপু!—"

সেই এতটুকু ডাকটিতে শিশুকণ্ঠের মধ্যে যে কী অমৃত ঢালা ছিল—বীর যুবক দেশানুরাগের জন্য যে কঠোর কারাদণ্ড বরণ কোরে নিয়েছিল, সে ঐ কণাটুকুর আস্বাদেই একেবারে বিহ্বল হোয়ে গেল!—দুখানি স্নেহ প্রবণ প্রবীণ হাত—তারই বৃদ্ধ পিতার দুটী পরিচিত প্রাচীন বাহু, তাকে যথাসময়ে সাহায্য না করলে যুবক হয়ত টলে পড়ে যেত! সে যে তারই পিতা— তারই তো জনক। —দীর্ঘ-ঋজু-রাজশ্রীমণ্ডিত দেহ জরার আক্রমণকে তুচ্ছ কোরে সোজা হোয়ে আছে, বয়সের দেওয়া ধৈর্য্য ও সহ্যগুণের সঙ্গে তাঁর অটল ধর্ম্ম-বিশ্বাস, অবিচল ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি মুখে একটা নিষ্পাপের জ্যোতি ফুটিয়ে

তুলেছে!—তাঁরই আজানুলম্বিত বাহুপাশে সন্তান তখন সপুত্র আশ্রয় নিয়েছে, বর্ষীয়সী জননীর আনন্দ উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস তার চখে মুখে স্নেহের উত্তাপ বুলিয়ে দিচ্ছে! গোলাপ পাতার মত তুলতুলে দুটি রাঙা রাঙা খুদে হাত তার মুখখানি ধরে ক্রমাগত যেদিকে ফিরিয়ে দিচ্ছিল সেদিকে দাঁড়িয়ে আছে তারই কিশোরী মা। আয়ত লোচনের নির্ণিমেষ দৃষ্টি দিয়ে তরুণী নিঃশব্দে স্বামীর আরতি করছিল—পেলব অধরপুটে ফুটেছিল তার সেই চির অম্লান মধুর হাসি!

* *

যদি কেউ বলে লক্ষ্ণৌ কারাগারের লৌহ দ্বারে সেদিন অপার করুণাময় ভগবান নিজে উপস্থিত ছিলেন না তা হোলে নিশ্চয় সে মিথ্যে বল্‌বে! যারা সেদিন এই মিলন প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল তাদের মধ্যে এমন কোনও নরনারী ছিল না যার আঁখিপাতা অশ্রু-সজল হোয়ে ওঠে-নি! সে অশ্রু করুণার ধারা নয়—দুঃখের সমবেদনা নয়—সে অশ্রু মাতৃভূমির গৌরবভরা জাতীয় মর্য্যাদায় অভিসিঞ্চিত মনুষ্যত্বের মহত্ত্বে টলটলে!

* *

মুক্তি প্রাপ্ত বন্দী ছিল উচ্চ আদালতের একজন ব্যবহারজীবী যুবা, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বহু উপাধি ভূষিত উজ্জ্বল রত্ন! পিতা তার পল্লীবাসী সঙ্গতিপন্ন লোক, জমীজমা চাষ-বাস নিয়েই দিনপাত করেন। একান্ত নির্ব্বিরোধী লোক,—তিনি চিরদিনই শান্তি ধর্ম্মের শিষ্যত্ব কোরে এসেছেন। যুবকের জননী ছিলেন সেই শ্রেণীর ভারত-নারী—যাঁদের জীবনের প্রধান ধর্ম্ম হচ্ছে 'প্রেম ও সেবা'!—শুধু পিতা মাতার সেবা নয়, স্বামী পুত্রের সেবা নয়, নিখিল নরনারীর সেবা!—পত্নী ছিল তার ভারতের নবজাগ্রত নারীত্বের সবুজ প্রতিনিধি, বিদুষী, গুণবতী!—কোনও একজন বড় রাজকর্ম্মচারীর মেয়ে হোলেও সে দেশের কাজে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল তাঁর বীর স্বামীর পাশে পতির প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর মতো!

ভারতজোড়া রাজনৈতিক আন্দোলনের বন্যা যেদিন এলো তাদের গ্রামের সীমানায়, তারাও সপরিবারে আনন্দের সঙ্গে তাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়্‌ল, আলিঙ্গন কোরে—হর্ষ রোমাঞ্চিত কলেবরে আনন্দধ্বনি কোরে উঠ্‌লো—"জয়, মহাত্মা গান্ধি মহারাজ কি জয়!"

সে ধ্বনি ক্ষণিক উত্তেজনায় অর্থহীন চীৎকার নয়—সে তাদের আত্মার অন্তরোত্থিত অকৃত্রিম উল্লাস! তাই পুত্রের কারাক্লেশে তারা দুঃখিত নয়—গর্ব্বিত! তারা যে আজ সপরিবারে দেশের জন্য সকল দুঃখ সহ্য কোরে নিতে প্রস্তুত! তাদের দেবতা—ভারতের দেবতা—ত্রিশ কোটী নরনারীর মনোমন্দিরে নিত্য যার পূজারতি, তিনিই যে স্বয়ং আজ কারাগার আলো কোরে আছেন—

তাঁদের প্রেমের ঠাকুর যিনি, ত্যাগের প্রতিমা যিনি, দুঃখের বিগ্রহ যিনি, তিনি যে নিজেই আজ বন্দী।

স্পষ্ট কথা

কৃষ্ণদাস পালের স্মৃতিসভায় কিছু বলবার সুযোগ পেয়ে কোনও কোনও মদরত যারা, সাধারণ রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে আজকাল বড় একটা মুখ খুলতে সাহস করেন না, তাঁরা তাঁদের গোটাকতক মনের কথা খুলে বলে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন। কিন্তু খবরের কাগজে গোল বেধেছে দেখ্‌লুম শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুর বক্তৃতা নিয়ে! যা পেয়েছো তাই বড় মুখ কোরে খাও, ভিক্ষের চাল আবার কাঁড়া আঁকাড়া কিনা সে বিচার করবার ধৃষ্টতা মনেও স্থান দিও না ইত্যাদি যে সব সারগর্ভ উপদেশ তিনি দেশবাসীকে দিয়েছেন, তাতে বসু মহাশয়ের আসল মনস্তত্ত্বটা বেশ বোঝা গেছে বটে, কিন্তু সব চেয়ে ভাল লেগেছে আমাদের তাঁর সেই নিখিল ভারত নায়ক গান্ধীকে 'মহাত্মা' না বলার চমৎকার যুক্তিটা। একশ-বার যখন তখন না-হক তাঁকে 'মহাত্মা' বলে উল্লেখ করলে পাছে 'মহাত্মা' খেতাবটার কদর মাটি হোয়ে যায় সেই ভয়েই নাকি তিনি ওটা বিশেষ সাবধানে এড়িয়ে গেছেন! উঃ কী গভীর শ্রদ্ধা!—কী দূরদর্শিতা! ভূপেন্দ্র বাবু দেখ্‌ছি মহাত্মার একজন প্রকৃত ভক্ত!

শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় যেন অনেকটা সস্তার কিস্তি পেয়ে উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে সঙ্গে নিয়ে মুর্শিদাবাদ বেড়াতে গেছেন! লাখ টাকা খরচ কোরে দেউলে ভারতবর্ষ থেকে কেন যে তাঁকে ব্রিটিশ উপনিবেশ দর্শনে পাঠানো হয়েছে সে কথাটা দেখ্‌ছি তিনি খাতিরের আতিশয্যে সাফ্‌ ভুলে মেরে দিয়েছেন! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজা হিসাবে সকল উপনিবেশেই যে ভারতবাসী কালা আদমীদের শ্বেতকায় প্রজাদের সঙ্গে সমান অধিকার দিতে হবে, একথাটা তিনি আর কোথাও সাহস কোরে বেশ জোর দিয়ে বলতে পারছেন না! পাছে অতিথির পক্ষে সেটা বলা অশোভন হয় এবং গৃহস্থ চটে যায় বলে ব্রাহ্মণ ভয়ে সর্ব্বত্র কথাটা পরিষ্কার কোরে মুখ ফুটে বল্‌তে পারছেন না। আমাদের মনে হয়, শ্রীনিবাসের চেয়ে কোনো বিশ্রীনিবাস পাঠালে এর চেয়ে কাজ হোতো। অতগুলো টাকা এমন অনর্থক জলে যেতো না।

লয়েড্‌ জর্জ্জ তো ভূতপূর্ব্ব ভারত-সচিব মণ্টেগু প্রবর্ত্তিত শাসন সংস্কারকে একেবারে পথে বসিয়ে দিয়েছেন! আপ্‌কো ওয়াস্তে মন্ত্রীর দল যে মাকাল ফলটি পেয়ে বগল বাজাচ্ছিলেন তাঁদের কি এইবার চৈতন্য হবে? আশা নেই

কিছু! দেশের দূরদর্শী চিন্তাশীল লোকেরা এর ফাঁকিটা আগেই ধরতে পেরে একে অন্তঃসারশূন্য বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং দেশের লোককে এর সঙ্গে সম্পর্ক রাখ্‌তে নিষেধ কোরে সাবধান কোরে দিয়েছিলেন। নিজের কিছু সুবিধা হবার লোভে অনেক সাধু চোখ বুঁজিয়ে, কানে আঙুল দিয়ে এই মেকী জিনিষটাকেই সত্য বলে বাজারে চালাবার চেষ্টা করছিল! হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো লয়েড জর্জ্জ আজ 'রিফর্ম্মের' মুখোসটা খুলে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, যতই লাফালাফি কর না কেন সিভিল সার্ভিসের প্রভুত্ব ভারতবর্ষে কোনদিনই খর্ব্ব করা হবে না! তোমরা পেলে পাও আর না পাও তোমাদের যে হাতীটি দিয়েছি সেটিকে যেমন কোরেই হোক পুষ্‌তে হবে! নাও, এইবার স্বায়ত্ত-শাসনের মুগুর ভাঁজো! অসহযোগের বিরোধীরা বোধহয় এতেও আপত্তি করবেন না। কারণ ভারত উচ্ছন্ন যাক আর থাক্ তাঁদের দু-পয়সা এলেই হোলো!

দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ কারামুক্ত হবার পর অসহযোগ আন্দোলন পরিত্যাগ কোরে আবার নিজের ব্যবসায়ে যোগ দেবেন এই রকম একটা গুজব অনেকদিন থেকে অনেকের মুখে শোনা যাচ্ছিল। তাঁর সহকর্ম্মী কোনো কোনো অসহযোগীকে আবার আদালতে যোগ দিতে ও আইন-ব্যবসা পুনরারম্ভ করতে দেখে অনেকের মনে এ-ধারণা বদ্ধমূল হোয়ে গিয়েছিল। অনেকে বলতে আরম্ভ করেছিল যে, সর্দ্দারের শিখ্‌নেত না থাক্‌লে কি আর ওরা এমন দুঃসাহসের কাজ কর্‌তে পারে? তার ওপর সেদিন আবার বরিশাল জেল পরিদর্শন করতে গিয়ে জেলের বড়কর্ত্তা নাকি সেখানকার জনকতক উকীলের কাছে ও-কথাই বলেছেন শুনে তো দেশের লোক দমে যাবার মতো হয়েছিল, যাক এখন এ-সব গুজবের যে একটা বিশ্বাসযোগ্য প্রতিবাদ বেরিয়েছে এটা দেখে সকলে আশ্বস্ত হবে বোধহয়। দেশবন্ধুর নামে যে-সব কথা রটেছিল তা সব মিথ্যে।

দেশের লোক যখন হৈ হৈ কোরে হুজুগে মেতে উঠেছিল, এবং নাম কেনবার জন্যই হোক্ বা স্বদেশানুরাগের জন্যই হোক্ জনকতক হোমরা-চোমরা লোক খবরের কাগজে ঢাক পিটিয়ে যখন ওকালতি ব্যবসা ছেড়ে দিলেন, তখন দুটি লোক চুপ কোরে বসে দেখ্‌ছিলেন। তাঁরা কোনও দলেই যোগ দেন-নি। তারপর একে একে যখন দেশের গণ্যমান্য লোক থেকে আরম্ভ কোরে ইস্কুলের ছেলেরা, কলের কুলি মজুররা মায় ফিরিওয়ালারা পর্য্যন্ত জেলে গেল, হুজুগ থেমে গেল, দেশের কাজ ঢিলে পড়ে গেল; এবং কেউ কেউ কংগ্রেসের কাজ

ছেড়ে দিয়ে পুনর্মূষিক হলেন তখন সকলের অজ্ঞাতসারে চুপি চুপি সেই দুটি লোক তাঁদের নিজের কাজকর্ম্ম বন্ধ রেখে দেশের কাজে নেমে এসেছেন। স্বেচ্ছায় অক্লান্ত পরিশ্রমের সঙ্গে তাঁরা দেশের গঠনকার্য্যের ভার মাথায় তুলে নিয়ে প্রকৃত স্বদেশ-সেবার দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন বিশ্ববিশ্রুত রসায়নাচার্য্য স্যর প্রফুল্ল চন্দ্র রায় আর একজন বাংলার নিঃশব্দ কর্ম্মী অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেমিক শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দত্ত। ঈশ্বরের কাছে আমরা এঁদের দীর্ঘায়ু কামনা করি।

বড় বাজার থেকে আজকাল রোজই জনকতক ভদ্রলোককে পুলিশে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, রাস্তায় ভিড় কোরে পথ চলাচল বন্ধ করার অপরাধে। কিন্তু লোকে বলছে তাঁরা নাকি বিলাতি কাপড়ের কেনা বেচা বন্ধ করবার চেষ্টা করছেন বলে গ্রেপ্তার হচ্ছেন! সে যাই হোক্, বড়বাজারে ভিড় আর পথ চলাচল বন্ধ হওয়া তো আজ নতুন নয়, এতো অনেকেই জন্মাবধি দেখে আস্‌ছি। অনেকবার এর জন্যে ভুগ্‌তেও হয়েছে। ঠিক সময়ে গিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছতে পারিনি বলে কতবার গাড়ী ফেল করতে হয়েছে। কিন্তু যে-সব গরুর গাড়ীর দল রাস্তা বন্ধ করার প্রধান কারণ, যে-সব মাড়োয়ারী দোকানদারের কাপড়ের গাঁট ফুট-পাথ জুড়ে পড়ে থেকে পথ চলাচল শুধু বন্ধ নয়, বিপজ্জনক কোরে রাখে আজকাল তাদের কেউ কোনও দিন রাস্তা বন্ধ করার অপরাধে পুলিশের হাতে ধরা পড়তে দেখিওনি শুনিওনি। হঠাৎ আজকাল পুলিশের এমন কর্ত্তব্য বুদ্ধি সজাগ হোয়ে উঠ্‌ল কি কোরে!

আমাদের দেশে নারীদের নিয়ে একটা সমস্যা বেধেছে। এই রকম সমস্যা স্ত্রী-পুরুষে, জাতিতে-জাতিতে পরস্পর বিরোধী স্বার্থের সংঘাত জগতে অনেকবার বেধেছে, এখনও বাধছে। যেমন পীত সমস্যা, কৃষ্ণবর্ণ সমস্যা ইত্যাদি। একটা দেশ কিংবা জাতিকে বিনা বাধায় ভোগ করবার বাধা উপস্থিত হোলেই তারা একটা সমস্যা হোয়ে ওঠে। আমাদের সমাজ নারীদের জন্য যে সব ব্যবস্থা কোরে রেখেছে সম্প্রতি তার বিরুদ্ধে কোনো কোনো নারী অস্ত্রধারণ করেছেন। অশ্রু ও আত্মহত্যাই ছিল এতকাল আমাদের দেশের নারীদের প্রধান অস্ত্র। কিন্তু সে অস্ত্র যে তাঁদেরই বিনাশের কারণ হয়েছে, এ-কথা যে কোনো কোনো নারী বুঝতে পারছেন এটা আমাদের দেশের সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু লেখনী ছাড়া তাঁদের আরও কঠিন অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে। কারণ শুধু লিখলে যদি কিছু কাজ হোতো, তা হোলে আমাদের দেশের অবস্থা অন্য রকমই হোয়ে যেত। অনেক শক্তিবান লেখকই নারীদের সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন

করবার প্রয়াস পেয়েছেন কিন্তু তাতে কাজ বিশেষ এগিয়েছে বলে মনে হয় না। নারীদের কর্ম্মক্ষেত্রে নামতে হবে। তাঁদের কাজে যদি তাঁরা পুরুষের সাহায্য চান সে সাহায্য তাঁরা পাবেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন অনেক নারী কর্ম্মক্ষেত্রে নেমে পড়েছেন সেই রকম যদি তাঁরা নরসেবা ও সামাজিক কাজে নেমে পড়েন তা হোলে সমস্যার অনেকখানি সমাধান হোয়ে যায়।

সম্প্রতি পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাশ অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কীয় এক মামলায় যে রায় দিয়াছেন সেটা প্রত্যেকেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য। এই রায়ের মধ্যে প্রধান কথা যেটা, সেটা হচ্ছে এই যে,—বিচারকেরা যেমন প্রজায় প্রজায় বিরোধের ন্যায়বিচার করবেন তেমনি আমলাতন্ত্রের সঙ্গে প্রজার বিরোধের বিচারও নিরপেক্ষভাবে করা উচিত। যদি দেখা যায় শান্তিরক্ষা ও সুশাসনের নামে আমলাতন্ত্র প্রজার জন্মগত দাবীকে খর্ব্ব করবার প্রয়াস পাচ্ছেন তখন আমলাতন্ত্রের শক্তির অপ-ব্যবহারকে বাধা দেওয়াও বিচারকের কর্ত্তব্য। এবং অন্যায়কারী আমলাকে বিশেষ ভাবে শাসন করা উচিত। মানুষের জন্মগত দাবী যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে প্রত্যেক বিচারকের সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রধান কর্ত্তব্য।

প্রত্যেক বিচারক যদি দাশ মহাশয়ের কথা মত চলতেন তা হোলে বিচারালয়ের প্রতি মানুষের এত অভক্তি ও অবিশ্বাস হোতো না। আমাদের দেশের বিচারালয়ের সঙ্গে শাসনযন্ত্রের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকাতে নিরপেক্ষ বিচার করবার সাহস সকলের থাকে না। এই কারণের জন্যই শাসন ও বিচার বিভাগ সম্পূর্ণরূপে পৃথক থাকাই বাঞ্ছনীয়। নতুবা দাশ মহাশয়ের মত দু-একজন নির্ভীক বিচারপতি ছাড়া সাধারণতঃ নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন বিচার আশা করা যায় না।

"স্বরাজ" পত্রিকার "চলতি চাকতি"র লেখক মৌলবী ফজলুল হক সম্বন্ধে এমন কতকগুলি মন্তব্য করেন যাতে মৌলবী সাহেব মনে করেছেন যে তাঁর মনের হানি করা হয়েছে। সেজন্য তিনি আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। "স্বরাজ" সম্পাদক "চলতি চাকতি"র লেখকের নাম আদালতে প্রকাশ করে দিয়েছেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোন লেখার লেখকের নাম প্রকাশ করে দেওয়া সম্পাদকের পক্ষে রীতি বিরুদ্ধ। অনিয়মিত পত্র লেখকের নামও প্রকাশ করা সংবাদ পত্র মহলে অত্যন্ত নিন্দার কথা— এরূপ ক্ষেত্রে নিয়মিত লেখকের কথা বলাই বাহুল্য। এমন কি আমাদের দেশেও অনেক সম্পাদক এই দায়িত্ব গ্রহণ কোরে কারাদণ্ডকে বরণ কোরে নিয়েছেন। "স্বরাজ" সম্পাদক মহাশয় সম্পাদক-মহলের এই অতি পুরাতন

এবং ভদ্র রীতি যে কেন লঙ্ঘন করলেন তার কারণ আমরা জানিনা! কিন্তু এই কাজ কোরে তিনি যে সম্পাদকের মর্যাদা বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ করেছেন সে কথা আমরা কর্ত্তব্য হিসাবে বলতে বাধ্য।

গত ১৩ই আগষ্ট তারিখে আইন ভঙ্গ কমিটির সদস্যদের অভ্যর্থনা করবার জন্য মির্জ্জাপুর পার্কে এক সভা হোয়ে গেছে। সভা আরম্ভ হবার কথা ছিল সাড়ে পাঁচটায় কিন্তু যাঁদের অভ্যর্থনার জন্য এত বড় আয়োজন করা হোলো তাঁরা এসে পৌছলেন সন্ধ্যা সাতটায়। সভায় হাজার দশেক লোক এসেছিলেন কিন্তু অধিকাংশের অঙ্গেই খদ্দর ছিল না। এর দ্বারা বেশ ভাল কোরেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, যারা নেতাদের অভ্যর্থনা করতে এসেছিল তাদের মধ্যে অধিকাংশই নেতাদের সম্মান করে না। কিন্তু সভার যতগুলি মহিলা এসেছিলেন তাঁদের সকলের সঙ্গেই খদ্দর ছিল—দিগন্তব্যাপী ঘনীভূত মেঘে এই মাত্র আশার ক্ষীণ রেখা।

খুন না আত্মহত্যা!

শ্রীমতী গ্রীলেট একটি তরুণী সুন্দরী। তিনি স্বামীর সঙ্গে তাঁর এক বাল্যসখীর দেশে বেড়াতে গিয়ে তাদের বাড়ীতে দিন কয়েক ছিলেন। বাল্যসখীর একটী ভাই ছিল। সে দেখতে খুব সুপুরুষ, তরুণ যুবা। এই যুবক একদিন শ্রীমতী গ্রীলেটকে সঙ্গে নিয়ে গাঁয়ের ভেতর তাদের পরিত্যক্ত ও পুরাণো বাড়ীখানি দেখাতে নিয়ে যায়। গাঁয়ের লোকেরা তাদের দু-জনকে একসঙ্গে সেই ভাঙা পোড়াবাড়ীতে ঢুকতে দেখেছিল কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাদের কাউকে আর বেরুতে না দেখে গাঁয়ের লোকদের মনে একটা সন্দেহ হয়। তারা তখন দল বেঁধে বাড়ীর ভেতর ঢুকে দেখে শ্রীমতী গ্রীলেট একটা ঘরের মধ্যে মরে পড়ে আছেন, তাঁর মাথার ভেতর দিয়ে একটা গুলি চলে গেছে। আর সেই সুন্দর ছোকরাটি তার কাছেই অজ্ঞান হোয়ে পড়ে আছে।

তারা সেবা সুশ্রূষা কোরে ছোকরাকে বাঁচালে বটে কিন্তু পুলিশে তাকে ধরে চালান দিলে। বিচারের সময় ছোকরা বল্লে গ্রীলেটের সঙ্গে আমার অত্যন্ত ভালবাসা হয়েছিল কিন্তু গ্রীলেট পরস্ত্রী বলে আমাদের মিলন অসম্ভব জেনে আমরা উভয়ে একত্রে আত্মহত্যা করতে প্রস্তুত হই। গ্রীলেটই আমাকে অনুরোধ করে তাকে আগে গুলি করবার জন্যে, আমি নিতান্ত অনিচ্ছায় সঙ্গে তার অনুরোধ রক্ষা করি, কিন্তু তার মৃত্যু আমাকে এমন কাতর কোরে দিলে যে, আমার কম্পিত হস্তের নিক্ষিপ্ত গুলি আমাকে বধ করতে পারলে না, শুধু আহত ও অজ্ঞান কোরে দিয়েছিল মাত্র! ওদিকে গ্রীলেটের স্বামী হলফ্ কোরে বলে তার স্ত্রী পতিব্রতা ছিল এবং স্বামীকে সে প্রাণের অধিক ভালবাসতো। তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একদিনের জন্যও কোনও মনমালিন্য হয়-নি। হত্যাকারীকে আমার স্ত্রী ভালবাসা দূরে থাক দু-চক্ষে দেখতে পারতো না, সে অনেকবার ওর নামে তার প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ প্রদর্শনের জন্যে আমার কাছে বিরক্তি ও অনুযোগ করেছে!

বিচারে ছোকরার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের হুকুম হয়েছে বটে, কিন্তু আজও কারুর সন্দেহ ঘোচেনি যে, তার কথা সত্য না মিথ্যা!

১ম বর্ষ] ১৩২৯ [৫ম সংখ্যা

সচিত্র পাক্ষিক পত্র

কার্য্যালয়
২০।২এ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রতিসংখ্যা
এক আনা

বার্ষিক মূল্য ২৵০
দুই টাকা দুই আনা।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

সুবিখ্যাত সচিত্র পুস্তক

ভাবে, ভাষায়, চিত্রে, ছাপায়

অতুলনীয়।

বাংলার বিদ্যালয় সমূহে পুরস্কার পুস্তক রূপে মনোনীত।

দেড় টাকা মাত্র!

নামিকো

জাপানী উপন্যাস।

অশ্রুসিক্ত করুণ প্রেমকাহিনী।

এক টাকা মাত্র।

হানাযি

চমৎকার জাপানী গল্পের বই

আট আনা মাত্র।

গুরুদাস বাবুর দোকান, ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস্‌ প্রভৃতি প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

বৈঠকের নিয়মাবলী

বৈঠকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ দুই টাকা দুই আনা; ভিঃ পিঃ মাশুল স্বতন্ত্র। প্রতি সংখ্যার জন্য এক আনা। নমুনারও মূল্য লাগে। যে কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া চলে। মূল্য সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়।

রিপ্লাইকার্ড কিংবা টিকিট না পাঠাইলে কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রবন্ধাদি বৈঠকের দুই পৃষ্ঠা বড় জোর আড়াই পৃষ্ঠা অপেক্ষা দীর্ঘ না হয়। টিকিট পাঠাইলে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে কিনা তাহা জানানো হয়। মনোনীত অথবা অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত পাঠান হয় না।

যদি কোন গ্রাহক বৈঠক না পান তো ৭ দিনের মধ্যে আমাদের খবর দেবেন। নচেৎ অপ্রাপ্ত সংখ্যা দামদিয়া লইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন

মলাটের চারের পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যা—৮৲

অন্যান্য পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যা—৬৲

অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—৩৷৹

কলমের প্রতি ইঞ্চি একবৎসরের চুক্তিতে প্রতিসংখ্যা—১৲

কলমের প্রতি ইঞ্চি প্রতিসংখ্যা—২৲

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়

ম্যানেজার বৈঠক

২০৮।২ এফ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এজেণ্ট:—শ্রীপরেশনাথ মিত্র

১৩২নং বাগমারি রোড, কলিকাতা

১ম বর্ষ] ১৫ই ভাদ্র, ১৩২৯ [৫ম সংখ্যা

গাল-গল্প

শশীকান্ত তার কুকুর নিয়ে রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়েছিল। কিছুদূর চলার পর কুকুরটা এক মাংসওয়ালার দোকান থেকে টপ্ কোরে এক টুক্‌রো মাংস তুলে নিয়েই দৌড় দিলে। মাংসওয়ালা কুকুরটাকে ধরতে না পেরে শশীকে ধরে জিজ্ঞাসা করলে—মশায় কুকুরটা কি আপনার ?

শশী। আমার ছিল বটে কিন্তু এখন দেখছি ও নিজেই কোরে খেতে শিখেছে।

——

উকীল। পকেট-কাটার আসামীকে আড়ালে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—ঠিক কোরে বল দিকিন্ পকেট কাট্‌তে তোমায় কেউ দেখেছিল ?

পকেট-মার। আজ্ঞে পুলিশের তরফের সাক্ষীটা আমায় দেখেছিল।

উকীল। তবেই তো! তোমায় রক্ষে করা মুস্কিল দেখছি।

পকেট-মার। একটা সাক্ষীর জন্য এত ভাবছেন! আমায় পকেট কাটতে দেখে-নি এমন সাক্ষী আমি পঞ্চাশটা এনে দিতে পারি।

——

ম্যাজিষ্ট্রেট সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করলেন—যখন লোকটা চুরি করছিল তখন রাত্রি কটা ?

সাক্ষী। আজ্ঞে রাত্রি তখন দুটো।

ম্যাজিষ্ট্রেট। জোৎস্না ছিল ?

সাক্ষী। ঘোর অন্ধকার রাত্রি।

ম্যাজিষ্ট্রেট। তুমি চোরটাকে ধরলে না কেন ?

সাক্ষী। আমি চোরের কাছ থেকে দু-মাইল দূরে ছিলুম।

ম্যাজিষ্ট্রেট। অন্ধকারে তুমি দু-মাইল দূর থেকে দেখতে পেলে! বল কি!

সাক্ষী। আজ্ঞে অন্ধকারে আমি লক্ষ লক্ষ মাইল দূরের জিনিষ দেখতে পাই। আকাশের একটি তারাও আমার চোখে বাদ পড়ে না।

লতিকা। তোমার লকেটের মধ্যে কি আছে ভাই?

মণিকা। আমার স্বামীর এক গোছা চুল।

লতিকা। সে কি! তোমার স্বামী তো বেঁচে আছেন।

মণিকা। স্বামী বেঁচে আছেন বটে কিন্তু তাঁর মাথায় একটী গাছিও চুল নেই।

কর্ত্তা। ডাক্তার! দোহাই তোমার, আমায় বাংলা কোরে বুঝিয়ে বলত বাবা, আমার ব্যায়রামটা কি? ও তোমার শেড় গজী ইংরেজী নাম-টাম ছেড়ে দাও; একটু সোজা কোরে বল যাতে ব্যাপারটা বুঝ্‌তে পারি!

ডাক্তার। সোজা কোরে বলতে গেলে বল্‌তে হয় যে, তোমার ব্যায়রাম ফ্যায়রাম সর্ব্বৈব মিথ্যে, আসল ব্যাপার হচ্ছে—তুমি স্রেফ কুঁড়েমী কোরে কাছারী যাওয়া বন্ধ করেছো!

কর্ত্তা। আরে চুপ্! চুপ্! এখনি গিন্নী শুনতে পাবে! হ্যাঁ ভাল কথা! ব্যায়রামের ইংরিজি নামটা কি বল্লে? বলত ভাই, মুখস্ত কোরে রাখি সেটা গিন্নীকে তো বল্‌তে হবে!

মফঃস্বলের একজন ব্যবসাদার কলকাতায় এসে একটা বড় দোকানে ঢুকে অনেক টাকার মাল অর্ডার দিয়ে আসে, আর বলে আসে জিনিসগুলো আজই প্যাক কোরে যেন ভিঃ পিঃ তে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর সমস্তদিন অন্য কাজকর্ম্ম সেরে সন্ধ্যে নাগাদ বাড়ী ফেরবার মুখে তিনি এক বন্ধুর বাড়ী থেকে সেই দোকানে টেলিফোন কোরে জিজ্ঞেস্ করলেন—সকালে অমুক জায়গায় যে বড় অর্ডারটা ছিল সেটা আজ প্যাক্ কোরে পাঠানো হয়েছে কি?

দোকানের যে কর্ম্মচারী টেলিফোন ধরেছিল সে মনে করলে দোকানের মালিক বোধহয় খবরটা জান্‌তে চাইছেন, তাই সে বল্‌লে—আজ্ঞে না; লোকটাকে জোচ্চোর বলে সন্দেহ হচ্ছে! আমরা সেখানে আমাদের এজেণ্টকে 'তার' করেছি, সেখান থেকে জবাব পেলে মাল পাঠাবো!

অন্ধকার রাত্রি, চারিদিক নিস্তব্ধ। বাড়ীতেও সেদিন লোকজন কেউ ছিল না। ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না মনে কোরে চোরটা এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে যা পেলে নিয়ে যখন বড়ঘরের

লোহার সিন্দুক খুলে রূপোর বাসনগুলো বার কোরে চাদরে বাঁধছে সেই সময় হঠাৎ পেছন থেকে কে এসে সজোরে তার হাত দু-খানা চেপে ধরলে। চোর চম্‌কে উঠে অন্ধকারের ভেতর যতদুর সাধ্য চেয়ে দেখলে—ভূত প্রেত নয়, একটা লম্বা-চৌড়া লোক বলে মনে হচ্ছে!

লোকটা চোরকে বাগিয়ে ধরে গম্ভীর ভাবে বল্লে বন্ধু। কেন তোমার এ পাপ মতিগতি হোলো? আমার যথাসর্ব্বস্ব তুমি আজ চুরি কোরে নিয়ে যাচ্ছ, কিন্তু ভেবে দেখেছো কি বন্ধু যে, তোমায় যদি আমি এখন পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দিই তোমার জেল হবে আর জেলে গেলে তখন তোমার স্ত্রী-পুত্রের কি দুর্দ্দশা হবে?

চোরের হাত থেকে রূপোর বাসন ক-খানা ঝন্‌ঝন্ কোরে পড়ে গেল!

লোকটা বলতে লাগল—এ অধর্ম্মের পথ ত্যাগ কর ভাই, নইলে পরিণামে ভারি কষ্ট পাবে!—আমি তোমার অনিষ্ট করতে চাইনি, তোমাকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করছি। যদি তোমার একান্তই অভাব হোয়ে থাকে বন্ধু, তাহলে আমি তোমায় প্রশান্ত মনে অনুমতি দিচ্ছি তুমি তোমার পছন্দ-মত যে কোন একটা জিনিস আমার কাছ থেকে উপহার-স্বরূপ নিয়ে এখনি এখান থেকে পালাও!

এই বলে লোকটা চোরকে ছেড়ে দিলে। চোর আর কোন দ্বিরুক্তি না কোরে শুধু হাতেই তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়ে পাঁচিল টপ্‌কে পালিয়ে গেল!

লম্বা-চৌড়া লোকটি তখন মৃদু হেসে সিন্দুক খালি কোরে বাকি জিনিসগুলো বার কোরে নিয়ে সেই চাদরেই বেশ গুছিয়ে বেঁধে পিটের ওপর তুলে পিট্টান দিলে!

ছুটো খবর

তিমির শরীরের এক একটা হাড় দু-ফুট পর্য্যন্ত চওড়া হয়।

লণ্ডন সহরে ছ-বছর বয়স হয়-নি এমন একলক্ষ শিশু প্রত্যহ স্কুলে যায়।

এলফ্রেডের রাজত্বকালে ইংলণ্ডে মোম-বাতি জ্বালিয়ে ঘড়ির কাজ চালান হোতো। চব্বিশ ঘণ্টা জ্বলে এমন বাতি তৈার কোরে বাতিতে ঘণ্টা হিসাবে দাগ থাকতো।

জার্ম্মানিতে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর লোক গোনা হয়। ইংলণ্ডে লোক গোনা হয় দশ বছর অন্তর।

হাতীর শুঁড়ে চল্লিশ হাজার মাংসপেশী আছে। মানুষের দেহের সমস্ত মাংসপেশীর সংখ্যা পাঁচশো-সাতাস।

পরীক্ষা কোরে দেখতে পাওয়া গেছে যে, গ্রীষ্মকালে লাল-রংয়ের বোতলে দুধ রাখলে শীঘ্র নষ্ট হয় না। শাদা অর্থাৎ যার কোনো রং নেই সে রকম বোতলে গ্রীষ্মকালে দুধ রাখলে খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হোয়ে যায়।

সম্প্রতি মার্কিণ যুক্ত-প্রদেশে একজন বিমান-বীর চব্বিশ হাজার দুশো ছয় ফুট ওপর থেকে প্যারাসুটে চড়ে নীচে নেমে-ছিলেন। মাটিতে নামতে তাঁর আধঘণ্টা সময় লেগেছিল। যেখানে তিনি উড়ো জাহাজ থেকে লাফিয়ে ছিলেন ঠিক তার পঁচিশ মাইল দূরে তিনি মাটিতে পা দিয়ে-ছিলেন।

সম্প্রতি লণ্ডনের পুলিশ-আদালতে এক বৃদ্ধা কোন এক অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিল। বিচারের সময় টের পাওয়া গেল যে, ইতিপূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত হোয়ে তাকে আড়াই-শো বার আদালতে আসতে হয়েছে।

আনোয়ার পাশা

এ পাতায় কার ছবি দেখছেন জানেন ?—উনিই তুর্কবীর আনোয়ার পাশা। যুদ্ধের সময়ে এঁরই হুকুমে তুর্কী সেনারা যখন গেলিপোলিতে গুড়ুম্ গুড়ুম্ গোলা চালিয়ে ছিল, তখন ইংরেজ দলের আয়ান প্রভৃতি বড় বড় সেনাপতির আক্কেল গুড়ুম্ হোয়ে গিয়ে-ছিল, তাঁরা চোখে সর্ষে-ফুল দেখেছিলেন। জার্ম্মানীর নামজাদা জাঁদরেল হিণ্ডেনবার্গ নিজের জীবনচরিতে লিখেছেন, আনোয়ার অসাধারণ বীর, লড়াই চালাবার তাঁর যে ফিকির-ফন্দী, তার তুলনা নেই। এই আনোয়ারের হাতিয়ারের জোরেই তুরস্কে স্বেচ্ছাচার-তন্ত্র চূর্ণ হোয়ে যায়—১৯০১ সালে আব্দুল হামিদ অর্দ্ধচন্দ্র খেয়ে সরে পড়েন। ১৯১১ সালে মনে পড়ে সেই ত্রিপোলিতে তুর্কীর সঙ্গে ইটালীর লড়াইয়ের কথা। আনোয়ার সেখ সিনৌসীর সঙ্গে যোগ দিয়ে ইটালীকে কি নাস্তানাবুদই না কোরে দিলেন, সে কাণ্ড দেখে মিশরে থেকে ইংরেজদের মহাকম্প! ৯১৩ সালে বল্কান যুদ্ধের সময় বুলগারেরা বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করতে থাকে—আড্রিয়ানোপল দখল কোরে তাদের আস্ফালন কি! আনোয়ার অমনি ছুটে গিয়ে আড্রিয়ানোপলে হাজির! পর্ব্বতের শৃঙ্গে যেন সহসা প্রকাশ! বুলগার-বাহিনীর অমনই পৃষ্ঠভঙ্গ তারা ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে পিটটান। ইউরোপের বড় যুদ্ধটা শেষ হবার পর থেকে আনোয়ারের সম্বন্ধে যে সব খবর পাওয়া যাচ্ছিল তা বড়ই গোলমেলে। যিনি এতকাল তালাত, জামাল, কামালের সাথে গলাগালি কোরে চলেছেন, তিনি কেন যে জামালের দলে যোগ দিন নি,—তা বুঝে

আনোয়ার পাশা

ওঠা যায় না। ব্যাপারটার ভেতরে যাই থাক্ কামালের সঙ্গে অন্তরে অন্তরে আনেয়ারের বড় যে অমিল ছিল—তা মনে হয় না। জুন মাসেও নাকি উর্ম্মিয়া বলে একটা জায়গাতে কামালে-আনোয়ারে সন্ধি হোয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যেই খবর এলো যে,যিনি বোলশেভিক-দের হাতে মারা পড়েছেন কেউ বলছেন—বোখারায়, কেউ বলছেন—কাস্পিয়ান হ্রদের পশ্চিমে পেট্রোৎস্কে। ব্যাপারটা এখনও ঠিক বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে না। সোমালীর পাগলা মোল্লার, সিনোপীর, লেনিনের এক কথায় ইংরেজের সঙ্গে যাদের ভাল ভাব নাই, তাদের মরবার খবর রয়টারের মারফত—দিনে দশবার রটে থাকে, আনোয়ারের মরার খবরের মধ্যে তেমন কিছু মাহাত্ম্য আছে কি না বলা যায় না—থাক্‌লে অবশ্য সেটা চাপা থাক্‌বে না—প্রকাশ হবেই, মাঝে থেকে আনোয়ারের আয়ু-কালটা আরও বেড়ে যাবে—যারা এমন খবর রটিয়েছিল তার ভাল আক্কেল পাবে আর কি!

বাংলা দেশে 'বেরিবেরির' প্রাদুর্ভাব কেন?

এসিয়াটিক সোসাইটির এক সভায় কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের মেজর এক্টন বঙ্গদেশে বেরি বেরি (Epidemic Dropsy) রোগের মূল কারণ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেছেন। তিনি বলেন রোগটি বিশেষ-ভাবে অন্নাহারী মধ্যবিত্ত বাঙালী হিন্দুর ঘরেই দেখা যায়। ঐ শ্রেণীর লোক 'বাসমাতি' চাল বলে একরকম চাল সাধারণতঃ ব্যবহার করে। ঐ 'বাসমাতি' চালই নাকি উক্ত রোগের মূল; ঐ চাল যারা খায় না তাদের মধ্যে এই রোগও নাই। অতি দরিদ্র লোকে নতুন চাল খায় আর ধনী যারা তারা 'বাসমতির' চেয়ে ভাল চাল খায় কাজেই তারা কেউ ওই রোগে ভোগে না।

মেজর এক্টন আবিষ্কার করেছেন যে, জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র মাসের মধ্যে ঐ চালে একরকম ছাতা ধরে আর গুটি বেঁধে যায়। তা থেকে একরকম বিষ উৎপন্ন হয়। ঐ চাল থেকে সেই বিষ বার কোরে মেজর সাহেব পরীক্ষা কোরে জেনেছেন যে, ঐ বিষ বুকের পেশীতে সংক্রামিত হোয়ে ঐ রোগ জন্মায়। সাধারণতঃ ওই চাল দু-বছরের পুরাণো অবস্থায় বাজারে পাওয়া যায়; দাম বেশী হবার আশা থাকলে আড়তদার চাল তিন চার বছরের পুরানোও করে; যতই পুরাণ হয় এ চাল ততই বিষাক্ত হয়। আবার মেজর সাহেব বলেন কলিকাতার চেয়ে হাবড়ার দিকে লোকে এই রোগে বেশী ভোগে কারণ নৌকোয় যেতে আসতে চালে আরও বেশী ছাতা ধরে; ধনী লোকে এ চাল ব্যবহার

করলেও তাদের রোগের ভয় থাকে না কারণ তাদের চাল চূর্ণ, এরারুটের গুঁড়ো ইত্যাদি দিয়ে সুরক্ষিত থাকে আর গরীবদের ত কথাই নেই। তারা সর্ব্বদা নতুন চাল ব্যবহার করে; সে চালে বিষ জন্মাতেই পায় না। কাজেই এ রোগ যত এই কেরাণী জাতের মধ্যবিত্ত লোকের ঘরে।

আমোদ-প্রমোদ

বাংলা থিয়েটার

বাংলা থিয়েটারের জীবনে একটা সন্ধিক্ষণ আসিয়াছে। যে পথে সে এখন চলিয়াছে, সে পথে আর কিছুদূর চলিলে তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এ-পথ তাহাকে ছাড়িতেই হইবে,—নহিলে বায়োস্কোপের ধাক্কায় সে টিকিতেই পারিবে না।

বাংলা থিয়েটারের অঙ্গ জীর্ণ—যে সব ছাই-পাঁশ উপরের কভারে 'নাটক' ছাপ মারিয়া বাংলা থিয়েটারের বুকে উড়িয়া বেড়াইতেছে সেগুলা দর্শকের চোখে ও মনে দস্তুরমত পীড়া জন্মাইতেছে। পশ্চিমে হাওয়ায় বাঙালীর স্বভাবের ঢিলা ঢালা ভাব কমিয়া আঁটসাঁট হইতেছে, বাঙালীর জীবনের গতিও দ্রুতচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিমে হাওয়ায় তাহার চিত্তের যত রুদ্ধ দ্বার-জানলা খুলিয়া যাইতেছে এখন চিত্তের খোরাক জোগানো কি ঐ সব বস্তা-পচা রদ্দি-মালের কর্ম্ম! বাঙালী চায় নাটকে এখন মানুষের চিত্তবৃত্তির সঠিক বিকাশ রক্তে মাংসে গড়া মানুষের চিত্তে সুখ-দুঃখের যে লীলা চলিয়াছে, প্রেমে, মমতায় হিংসা-স্বার্থে যে সম্বন্ধ চলিয়াছে তাহারই স্বরূপ প্রকাশ দেখিতে। গগনভেদী বক্তৃতাকে বাঙালী আর অভিনয় বলিয়া মানিতে চায় না। বায়োস্কোপের কল্যাণে অভিনয় বস্তুটা যে কি, বাঙালী তাহা বেশ বুঝিয়াছে। কিন্তু বাঙলা থিয়েটার সে বস্তুটা দিতে পারিতেছে না। তার কারণ থিয়েটারে অভিনেতা নাই।

অভিনেতা নাই, এত বড় কথাটা শুনিতে একটু ধোঁকা লাগে। সেকালের অভিনেত্রীদের মধ্যে একমাত্র শ্রীমতী তারাসুন্দরীর সম্বন্ধে বলা যায়, তারাসুন্দরী যে-কোন ষ্টেজের গৌরব, গর্ব্ব। কিন্তু তা হইলে কি হয়—তিনি খুব কমই এখন ষ্টেজে অবতীর্ণ হন্। তাঁহার যোগ্য ভূমিকা আজ-কালকার কেতাবে দেখিতে পাই-না। তাঁহাকে ধরিয়া বিদূষক সাজানো হইতেছে এবং পুরুষের ভূমিকা তাঁহার ঘাড়ে যথেষ্ঠভাবে চাপানো হইতেছে—তাহার ফলে তাঁহার অপমান হইতেছে নানাদিক দিয়া। ইহাতে এমন বেমানান্ বৈসদৃশ্যের অবতারণা হইতেছে যে, সে আর কহতব্য নয়।

শ্রীমতী তারাসুন্দরীর পর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের নাম (দানিবাবু) উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তিনিও তেমন বই পাইতেছেন না। রাবিশ

লইয়া তাঁহাকে ধুলাখেলা করিতে হইতেছে মাত্র।

তিনজন শিক্ষিত শক্তিশালী অভিনেতা বাংলা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,—শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী এম, এ, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র বি এল ও শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁহারা থিয়েটার ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইঁহারা ষ্টেজে নামিয়া অনেকখানি আশার সঞ্চার করিয়া তুলিয়াছিলেন, ইঁহাদের সংস্পর্শে ষ্টেজের গতি ফিরিবে ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা যখন থিয়েটার ছাড়িয়া দিয়াছেন, তখন ষ্টেজ আবার যাহা ছিল তাহাই রহিয়া গেল!

আর একটি অভিনেতার নাম করা যাইতে পারে যিনি Exprssionist হিসাবে খুব উঁচু দরের অভিনয় দেখাইতেছেন। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দে। ব্যস্ তারপর ষ্টেজ যথেচ্ছাচারের লীলাভূমি!

ইঁহারা ছাড়া আর যে-সব ব্যক্তি অভিনেতার পোষাক আঁটিয়া জাঁকালো হরফে নাম ছাপাইয়া ষ্টেজে মল্লক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাদিগকে অভিনেতা না বলিয়া মল্লবীর বলিলেই ঠিক হয়—কারণ অভিনয়-ভঙ্গীর সহিত ইঁহাদের বিন্দুমাত্র পরিচয় নাই—ইঁহারা জানেন শুধু গলাবাজী। এই বিদ্যাটা তাঁহারা প্রাণপনে সাধিয়াছেন এবং এই গলাবাজির জোরেই তাঁহারা টিঁকিয়া আছেন। এ-সব কসরৎ সেকালে হইলে অবাধে চলিতে পারিত এখন কিন্তু অচল হইয়া পড়িতেছে। তার মানে সাধারণ দর্শকও এখন বায়োস্কোপে অভিনয়-ভঙ্গী দেখিয়া দেখিয়া আলোর সন্ধান পাইয়াছে। বায়স্কোপের অভিনয়ে হর্ষ বিষাদের খেলা মানুষের মুখ চোখে অপরূপ লীলায় ফুটিতে দেখিয়া তাহারা বুঝিয়াছে অভিনয় বস্তুটা গলাবাজিরই রূপান্তর নয়—তাহার মধ্যে রীতিমত কলা-কৌশল আছে। সেজন্য থিয়েটারের ঐ সকল ফাঁকি এখন তাহাদের চোখেও দস্তুরমত ধরা পড়িতেছে। তাই বাংলা থিয়েটার প্রতি সপ্তাহে নূতন নূতন বই খুলিয়া, ছেঁড়া কানির তালী লাগানো হরেক রকম দৃশ্যপট আর পোষাকের জাঁক জমকেও দর্শককে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না। ওধারে বইয়ের গলদও অল্প নয়। যা তা বই খুলিয়া থিয়েটারওয়ালারা অসাধ্য সাধনে রত হইয়াছেন অতিরিক্ত Sensation ঢুকাইয়া জবাতার মাথায় লাঠি মারিয়া দর্শকের মন ত তাঁহারা আয়ত্ব করিতেছেনই না, উপরন্তু বিরক্তির বিষে দর্শকের মন বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছেন। বইগুলার এবং সে-সব বইয়ে অভিনয়ের ফাঁকি আমরা সময়ান্তরে বেশ করিয়া দেখাইয়া দিব। এ সব ফাঁকিকে দর্শক তাহার অনুভূতিকে অপমান বলিয়াই মনে করে! তাই থিয়েটারের প্রতি সে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছে।

থিয়েটারে এমনি করিয়া দুর্গন্ধে ভরা যে

দূষিত বাষ্প অল্পে অল্পে তিলে তিলে নিত্য জমিয়া উঠিতেছে, এ গন্ধ চারিদিককার আবহাওয়াকে পর্য্যন্ত কলুষিত করিতেছে এবং এ বাষ্প আরো গাঢ় হইয়া উঠিলে বাংলা থিয়েটার এই বাষ্পের বেগেই একদিন ফাটিয়া যাইবে।

আজ এই দূষিত বাষ্পের উল্লেখমাত্র করিলাম। বারান্তরে এ বাষ্প কি করিয়া জমিতেছে, কিসে দূর হয় তাহার সবিস্তার আলোচনা করিব।

রঙ্গরাজ

আমাদের সমাজ

[এই নিবন্ধে আমাদের সামাজিক সংবাদ থাকবে। কি রকম সংবাদ থাকবে তা পাঠকেরা নীচের সংবাদ কয়টী দেখলেই বুঝতে পারবেন। আমরা সাধারণের কাছ থেকে এই শ্রেণীর সামাজিক সংবাদ চাইছি; যদি কেউ অনুগ্রহ কোরে দেন তা হোলে আমরা আনন্দের সঙ্গে তা পত্রস্থ করব। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নানা কারণে আমরা নাম ধাম প্রকাশ করতে পারছি না। ভবিষ্যতে সম্ভব হোলে তাও প্রকাশ করবো। দুর্নীতি প্রচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, দুর্নীতি দূর করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এবারে যতগুলি সংবাদ দেওয়া যাচ্ছে তার সব কটি সম্বন্ধে আমরা খোঁজ নিয়েছি এবং সেগুলিতে কোন মিথ্যার অবতারণা নাই। বৈঃ সঃ]

১। কলকাতা সহরের একটি সম্পন্ন লোক সম্প্রতি হাওয়া খেতে সস্ত্রীক বিদেশে গিয়েছিলেন। ভদ্রলোকটি নিঃসন্তান। বিদেশে একলা থাকতে ভাল লাগে না বলে কলকাতা থেকে মাঝে মাঝে দু-এক জন বন্ধু তাঁর কাছে গিয়ে থাকেন। এই রকম চলছে, এমন সময় কলকাতা থেকে ভদ্রলোকটির এক বন্ধু সেখানে গিয়ে হাজির হোলো। বন্ধুটি ভদ্রলোকের পারিবারিক বন্ধু। সে তাঁর স্ত্রীকে মাসীমা বলতো। বন্ধু কিছুদিন তাঁর বাসায় আছে এমন সময় ভদ্রলোকটির কর্ম্মস্থল থেকে টেলিগ্রাম এলো—"তার পাওয়া মাত্র শীঘ্র চলে এস, বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

হঠাৎ এই অপ্রত্যাশিত টেলিগ্রাম পেয়ে ভদ্রলোক ব্যতিব্যস্ত হোয়ে পড়লেন, শেষে উপায়ান্তর না থাকায় স্ত্রীকে সেই বন্ধুটির জিম্মায় রেখে দু-দিনের জন্য কলকাতায় চলে গেলেন।

এদিকে বন্ধুটি সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা ভদ্রলোকের বাড়ীর চাকরদের বল্লে যে, তার বাড়ী থেকে এখুনি চলে যাবার জন্য তার এসেছে, সেখানে বিশেষ বিপদ উপস্থিত। এখন উপায়! বন্ধু চাকরদের বোঝালেন যে, তাদের মা-ঠাকরুণকে এখানে একলা ফেলে যাওয়াটা ঠিক হবে না। অতএব তিনি তাঁকেও কলকাতায় নিয়ে চল্লেন। সেখানে বাবুর বাড়ীতে তাঁকে পৌঁছে দিয়ে নিজের বাড়ী চলে যাবেন। চাকরেরা কোনো সন্দেহ না কোরে সেইদিনই সন্ধ্যার এক ট্রেণে তাদের তুলে দিয়ে এল। এদিকে সেই ভদ্রলোক কলকাতা থেকে সেখানে গিয়ে বন্ধু ও স্ত্রীকে বাড়ীতে না দেখে ও চাকরদের কাছে সমস্ত ব্যাপার শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তিনি তখুনি

কলকাতায় ফিরে এসে ডিটেক্‌টিভ লাগিয়ে তাদের ধরবার বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। পুলিশ তাদের সন্ধানে বালি, বেলগেছে, সেওড়াপুলি প্রভৃতি কয়েকটা জায়গায় ধাওয়া করেছিল; কিন্তু সব জায়গা থেকেই তারা পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে পলায়ন করেছে। এখনো তারা ধরা পড়েনি। ধরা পড়লে বোধ হয় একটা জঘন্য রকমের মামলা হবে। যদি মামলা হয় সেজন্য মামলার আগে আমরা এখন এই ব্যাপারের ওপর কোনো রকম মন্তব্য করতে পারছি না।

২। একটি উচ্চবর্ণের ভদ্রলোক, বাড়ী কলকাতায়। স্বামী-স্ত্রীতে বেশ সুখেই ঘরকন্না চলছিল, হঠাৎ এক চামারের মেয়ের প্রতি লোকটির একটু নেক-নজর হওয়ায় সংসারে অশান্তির সূত্রপাত হোতে আরম্ভ হয়। লোকটা চামারের মেয়েটিকে কলকাতা থেকে নিয়ে গিয়ে কাছেই এক বাগানে রেখেছে। ক্রমে বাড়ীতে আসা কমে যেতে লাগলো এবং সেইখানেই আহারাদির ব্যবস্থা হোলো, শেষে বিবাহিত স্ত্রী খেতে পায় না এমন অবস্থা দাঁড়াতে অবশেষে স্ত্রীকে খোরপোষের জন্য আদালতের দারস্থ হোতে হয়েছে। মামলা এখনও শেষ হয়-নি। শোনা যাচ্ছে এ-ব্যাপারের সঙ্গে অনেক রহস্য জড়িত আছে। এর ফলাফল পরে আমরা পাঠকদের জানাবো।

স্বামী-স্ত্রীতে বনিবনাও কোরে চলাটাই সঙ্গত। কিন্তু স্বামী স্ত্রীতে বনিবনাও হচ্ছে না এমন ঘটনা ঘটাও অসম্ভব নয়। স্বামীর যদি স্ত্রীকে আর ভাল না লাগে এবং সেই স্বামী যদি অন্য রমণীতে আসক্ত হয়, তা হোলে হিন্দু স্ত্রীর পক্ষে তার প্রতিবিধান করবার কোনো ব্যবস্থা নাই। এক্ষেত্রে বিবাহ বন্ধন ছেদন করবার ব্যবস্থা হওয়াই উচিত। স্বামী যদি বিবাহিত জীবনের মর্য্যাদা না রাখে তা হোলে স্ত্রীই বা সে মর্য্যাদা রাখতে বাধ্য থাকবে কেন? অসভ্য বর্ব্বরদের দেশে এ রকম নিয়ম থাকতে পারে কিন্তু বর্ত্তমান যুগে কোনো সভ্যদেশে এ রকম নিয়ম চলতে পারে না।

৩। কোনো ভদ্রলোক বিদেশে চাকরী করেন। স্ত্রী থাকেন মার অর্থাৎ তাঁর শাশুড়ীর কাছে। শাশুড়ীর চরিত্র ভাল নয়, জামাইয়ের অনুপস্থিতির সুযোগে এই রমণী তার কন্যাকে দিয়ে অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করাতে থাকে। কন্যা প্রথমে মার প্রস্তাবে অত্যন্ত আপত্তি জানিয়েছিল কিন্তু পরে তার আপত্তি টেঁকে-নি। কিছুদিন পরে স্বামী ফিরে এসে স্ত্রীকে কর্ম্মস্থলে নিয়ে যেতে চাওয়ায় স্ত্রী স্বামীকে বল্লে—আমি চরিত্র-হীনা, আমার সঙ্গে তোমার কোনো সম্বন্ধ রাখা উচিত নয়। তুমি আমাকে নিতে এসো না।

স্বামী স্ত্রীর কথা বিশ্বাস না কোরে

তাকে তার সঙ্গে যাবার জন্ম বোঝাতে থাকে কিন্তু স্ত্রী খালি বলতে থাকে যে—আমি গেলে আমার স্পর্শে তোমার শান্তিময় গৃহ কলুষিত হবে, তুমি আমায় ত্যাগ কর।

অবশেষে তার শ্বাশুড়ী এসে তাকে বল্লে যে, এখন যাওয়া হবে না।

স্বামী মনে করলে বোধ হয় শ্বাশুড়ীর জন্তুই তার স্ত্রী তার সঙ্গে যেতে চাইছে না। এই ভেবে সে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাবার অধিকারের জন্ম আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে।

মকদ্দমার দিন স্ত্রী আদালতে দাঁড়িয়ে সকলের সামনেই জোর গলায় বলে দিলে—আমি অসতী, আমার স্বামী আমায় নিয়ে গেলে তাঁর গৃহ কলঙ্কিত হোয়ে যাবে।

স্ত্রীর মুখে এই কথা শুনে স্বামী আদালতের মধ্যে অজ্ঞান হোয়ে পড়ে যায়। মূর্চ্ছা অন্তে সে মামলা তুলে নিয়ে আদালত থেকেই কোথায় চলে গিয়েছে তার কোনো খোঁজ নাই।

স্ত্রীর বয়স বেশী নয়, এখনও তাকে বালিকা বলাও চলে। বালিকা একেবারে অশিক্ষিতা, সুশিক্ষা দূরের কথা, সে তার জননীর কাছ থেকে কুশিক্ষাই পেয়ে এসেছে। উপযুক্ত শিক্ষা পেলে সে তার মার প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হোতো না, অন্তত ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াতো না সে বিষয় নিশ্চয় কোরে বলা যেতে পারে। যাঁরা বলেন যে নারীকে উচ্চশিক্ষা দেওয়া উচিত নয় এ বিষয়ে তাঁদের কি বলবার আছে তা আমরা শুনতে চাই।

ওষুধ দিয়ে মাছ ধরা

মাছ ধরবার জন্ম নানাদেশে নানারকম ফন্দি-ফিকির আছে, কিন্তু ওষধ দিয়ে মাছ ধরার কথা আপনারা কেউ শুনেছেন কি?

মালয় উপদ্বীপের লোকেরা এক মজার কায়দায় মাছ ধরে। তারা সেই দেশের দু-রকম গাছ কেটে তা থেকে রস বার করে, তারপর সেই মিশ্রিত রস নদীতে ফেলে দেয়। ফিনাইলে জল দিলে যেমন জল শাদা হোয়ে যায়, এই রসও জলে পড়লে ঠিক তেমনি শাদা হয় আর এক রকম তীব্র গন্ধ ছাড়তে থাকে। এই গন্ধ পেলেই মাছরা সব জলের ওপরে ভেসে ওঠে; কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তারা এলিয়ে পড়ে; তখন তারা একটি একটি কোরে মাছগুলি তুলে নিয়ে ঘরে চলে যায়।

নদীর জলে এই রস দেওয়ার পর দু-তিন দিন পর্য্যন্ত তারা কেউ নদীর জল ব্যবহার করে না।

টাইগ্রিস নদীতে খুব বড় বড় মাছ পাওয়া যায়। কিন্তু আরবরা এই সব মাছ ধরবার জন্ম ছিপ্ কিংবা বঁড়শী ব্যবহার করে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদে পুড়ে কিংবা জলে ভিজে ফাৎনার দিকে চেয়ে থাকা

তাদের পোষায় না। তারা ময়দার সঙ্গে বেশ খানিকটা আফিম মিশিয়ে তাল পাকিয়ে জলে ফেলে দেয়। যে মাছ এসে টোপ গিলবে তার মৃত্যু অনিবার্য্য। তারপর মরা মাছ যখন জলের ওপর ভেসে ওঠে তখন তারা সেগুলিকে তুলে নিয়ে আসে। আরবে প্রায় তিন হাজার বছর থেকে এই প্রথাতেই মাছ ধরা চলে আসছে।

বাবু-ঘড়ির বিপদ

হাতে বাঁধা ঘড়ির (wrist watch) রেওয়াজ আজকাল আমাদের দেশে খুবই বেড়েছে। কিন্তু হাতে ঘড়ি বাঁধার বিপদ আছে; যাঁরা এই ঘড়ি ব্যবহার করেন তাঁদের সেটা জেনে রাখা কর্ত্তব্য।

কখনো ঘড়ির চামড়া খুব কষে বাঁধবেন না। কব্জিতে কতকগুলি স্নায়ু আছে যারা বেশী অত্যাচার সহ্য করতে পারে না। প্রত্যহ সমস্ত দিন যদি চামড়া কিংবা নেকড়ায় সেই স্নায়ুগুলিকে বেশ কোরে বেঁধে রাখা হয়, তা হোলে এক রকম স্নায়বিক ব্যাধি (Neutritis) জন্মায়। এই ব্যাধি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। প্রথমে কব্জিতে একটু একটু ব্যথা হয়, কিন্তু ক্রমেই ব্যথা বাড়তে থাকে। শেষে ব্যথা প্রায় বগল অবধি পৌঁছায়

অনেকে বলতে পারেন যে, তিনি বহুদিন ধরে কষে হাত-ঘড়ি বাঁধছেন কিন্তু কিছুই হয় নি। কিন্তু এতদিন হয়-নি বলে যে কখনো হবে না তার কোন ঠিক ঠিকানা নাই। এ বিষয়ে সকলেরই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

স্পষ্ট কথা

ল্যাঙ্কাশায়ারের শ্রমজীবীরা সম্প্রতি এক সভা কোরে জানিয়েছেন যে. ভারত-বাসীদের আরও বিস্তৃতভাবে রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হোক। তাঁদের বিশ্বাস যে, ভারতবাসীরা আরও কিছু অধিকার পেলে ল্যাঙ্কাশায়ারের তুলোর মালের ওপর যে শুল্ক বসান হয়েছে সেটা তারা তুলে নেবে। কিন্তু হঠাৎ তাদের এই অদ্ভুত বিশ্বাস কেন যে হোলো তা বুঝতে পারা যাচ্ছে না। ভারত-বাসীদের হাতে রাজনৈতিক অধিকার যত বেশী আসবে, ল্যাঙ্কাশায়ারের তুলোর কারবার যে ততই কমতে থাকবে।

ল্যাঙ্কাশায়ারের এই বৈঠকের জেনারেল সেক্রেটারী প্রস্তাব করেছেন যে, এখান থেকে শ্রমজীবীদের জনকয়েক প্রতিনিধি ভারত-বর্ষে পাঠানো হোক। তাঁরা সেখানে গিয়ে ভারতীয় ও ইংলণ্ডের শ্রমজীবীদের মধ্যে একটা প্রেমের সম্পর্ক অর্থাৎ কিনা যাকে সদ্ভাব বলা হয় সেই রকম একটা কিছু স্থাপনের চেষ্টা করবেন। ভারতবর্ষের লোকেরা ইংলণ্ডের শ্রমজীবীদের সঙ্গে একটা যোগ স্থাপনের চেষ্টায় সেখানকার দু-জন শ্রমজীবী

নেতাকে এদেশে ডেকে এনেছিলেন। কিন্তু তখন তাঁরা মহা মুরুব্বীয়ানা চালে বলেছিলেন—রাম বল! এই অশিক্ষিত শ্রমজীবীদের সঙ্গে আমাদের দেশের শ্রমজীবীদের যোগ স্থাপন হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। এখন আবার এ-সব কি কথা বাবা? খদ্দরের ঠেলায় এখন অনেকেই দেখছি ভদ্দর বনতে বাধ্য হচ্ছেন। ল্যাঙ্কাশয়ারের শ্রমজীবীদের সঙ্গে আমাদের কোনো অসদ্ভাব নাই, কিন্তু সেখানকার কাপড় পরতে আমাদের যে বিশেষ আপত্তি আছে সেটা কি এখনও তাঁরা বুঝতে পারেন নি।

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী দুঃখ করেছেন যে, কানডায় তাঁর কথায় কেউ কানই দেয়-নি। ভারতবাসীরা যাতে সেখানে সাদা চামড়াওয়ালাদের মতই ব্যবহার পেতে পারে এই সব কথাই তিনি তাদের বলেছিলেন; কিন্তু কে কার কথা শোনে! কয়েকবছর আগে কানাডার লোকেরা যখন রবীন্দ্রনাথকে তাদের দেশে নেমন্তন্ন করেছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান কোরে বলেছিলেন—তোমরা আমার দেশের লোককে অপমান কর, তোমাদের চৌকাট আমি কখনও মাড়াবো না।

শাস্ত্রী মহাশয় হয়তো ভুলে গেছেন যে, বিদেশীর কাছে সম্মান পাবার ব্যবস্থাটা স্বদেশে বসেই করতে হয়। সম্মান দাও, অধিকার দাও বলে ভিক্ষাবৃত্তি কোরে বেড়ালে সম্মান পাওয়া যায় না, আর যদিই বা পাওয়া যায় সেটা স্থায়ী হয় না। তিনি যতদিন ধরে বিদেশে এই "দাও দাও" কোরে ঘুরে বেড়ালেন সেই সময়টা যদি স্বদেশে ঘুরে ঘুরে কাজ করতেন তা হোলে বিদেশে সম্মান পাওয়ার পথটা অনেকখানি প্রশস্ত হোয়ে যেত।

কলকাতার সহরে গুণ্ডার অত্যাচার অসহ্য হয়েছে। যে কোনো কারণেই হোক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, পুলিশ গুণ্ডার অত্যাচার নিবারণ করতে অসমর্থ। এক্ষেত্রে যদি সহরবাসীরা অগ্রসর না হন তো দু-দিন পরে গুণ্ডারা যার বাড়ীতে ইচ্ছা প্রবেশ কোরে টাকাকড়ি ছিনিয়ে নেবে। অবশ্য এখনি যে তারা এমন কাজ না করছে, তা নয়। কিন্তু গুণ্ডাদের সঙ্গে পেরে উঠতে হোলে অস্ত্র চাই। সহরের যুবকেরা যদি দল গঠন কোরে, দলে দলে সকাল সন্ধ্যায় সহরে পাহারা দিতে থাকেন এবং পুলিশ যদি তাঁদের সাহায্য করেন তা হোলে এই গুণ্ডার অত্যাচার দু-দিনে দমন হোতে পারে। আশ্চর্য্যের বিষয় সহরবাসীরা এদিকে একেবারে উদাসীন। অথচ দিনে, দুপুরে, সন্ধ্যায়, রাত্রে যখন তখন যে কোনো রাস্তায় গুণ্ডাদের অত্যাচার চলেছে।

ইংরেজ কাগজওয়ালারা বলতে চায় যে, এ-সব অসহযোগীদের কাণ্ড। আর একদল

আছে তারা বলে, এ-সব সহযোগীদের কাণ্ড। কিন্তু কাণ্ডটা যাদেরই হোক তার ফল ভুগতে হচ্ছে আমাদের। সহরবাসীরা পুলিশের হাতে সব সঁপে দিয়ে বসে আছে; কিন্তু সহর বাসীদের সাহায্য না পেলে একা পুলিশের দ্বারা গুণ্ডামি বন্ধ হওয়া সম্ভব নয়। অসহযোগীদেরও এ বিষয়ে নিরপেক্ষ হোয়ে বসে থাকাটা কর্ত্তব্যকর্ম্ম হচ্ছে বলে মনে করতে পাচ্ছি না।

লর্ড লিটন সম্প্রতি সফরে বেরিয়েছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ পরিভ্রমণ কোরে ফেরবার সময় তিনি পাবনায় এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছেন। বক্তৃতায় তিনি দুঃখ কোরে বলেছেন যে, বাংলা দেশের আমি কত জায়গায় ঘুরলুম, কত ভাল ভাল লোকের সঙ্গে আলাপ সালাপ করলুম, মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি নানা সভা সমিতি থেকে অসংখ্য অভিনন্দন পত্রও পেয়েছি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, কোথাও কারুর মুখে আমি এই রিফর্ম বা নতুন শাসন সংস্কারের কোনো উল্লেখমাত্র শুনতে পেলুম না! তোমাদের যে এতখানি অধিকার দেওয়া হয়েছে তার জন্যে কেউ তো একটু কৃতজ্ঞতা বা আনন্দ জানালেই না, তা ছাড়া, কাউকে সে অধিকারের সুযোগ নিতেও দেখলুম না। সবার মুখেই কেবল এই এক কথা শুনলুম যে—হুজুর সরকার থেকে আমাদের কিছু টাকা দেবার ব্যবস্থা কোরে দিন, নইলে আমরা এটা করতে পারছি-নি ইত্যাদি! সরকার থেকে কিছু অর্থ সাহায্য না পেলে তোমরা কিছুই করতে পারবে না এই যদি তোমাদের অবস্থা হয় তাহলে 'রিফর্ম' নিয়ে তোমাদের কি লাভ হোলো আমি তো কিছু বুঝতে পারছি-নি! বাপু হে, যদি স্বায়ত্ত-শাসন পাবার উপযুক্ত হোতে চাও তাহোলে কি হাত এমন নিরুপায়ের মত গবর্মেণ্টের মুখাপেক্ষী হোয়ে থাকলে চলবে না! নিজেরা আত্ম-নির্ভরতা শিখে আত্মপ্রতিষ্ঠ হবার চেষ্টা কর। সরকারের কাছে সাহায্য ভিক্ষা না কোরে নিজেদের সাহায্য করবার চেষ্টা কর, তবে তো মানুষ হোতে পারবে! আমি দেখছি এ দেশের মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতি সভা সমিতিগুলোর যতটা কাজ করা উচিত তার কিছুই তারা করছে না—! এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়! তাদের একটু উঠে পড়ে লাগতে হবে; দেশের উন্নতি করা তাদের ওপরই ষোলআনা নির্ভর করে!—ইত্যাদি। লাট সাহেবের কথাগুলি বেশ মুখরোচক বটে কিন্তু তাঁর যে গোড়াতেই গলদ হয়েছে সেটা তিনি বুঝতে পারেন-নি। এদেশের মিউনিসিপ্যালিটি. ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতিতে যে সব মহাপ্রভুরা আছেন দেশের সঙ্গে যে তাঁদের কোনও যোগ বা কোনও সম্পর্কই নেই, নতুন লাট বোধহয় সেটা এখনও জানতে পারে-নি। আর পারবেনও না, যতদিন না

তিনি তাঁর ঐ সরকারী গণ্ডীর বাইরে এসে বাংলাকে দেখবার চেষ্টা না করবেন। তাঁরা লাট-প্রেমিক বটেন কিন্তু স্বদেশ-প্রেমিক ঠিক নন। মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক হয় নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, নয়তো নাম কো ওয়াস্তে! স্বদেশের যথার্থ কল্যাণ কামনা তাঁদের মধ্যে একজনেরও আছে কিনা সন্দেহ! লাটসাহেব যদি বাংলাদেশের যথার্থ স্বরূপ দেখ্‌তে চান তাহলে তাঁকে গাঁয়ের ভেতর গিয়ে চাষা-ভুষোদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে, সহরের হোমরা বাবুদের সঙ্গে সেকহ্যাণ্ড কোরে এলেই চল্‌বে না। এ জাতির প্রাণের সুর সহরের কোলাহলের মধ্যে শুনতে পাওয়া যাবে না। তিনি যদি দেশের যে কোনও একটা গাঁয়ের ভেতর গিয়ে ঢুকতে পারতেন, তা হোলে বোধ হয় কতকটা বুঝ্‌তে পারতেন যে, তাঁদের এত ধুমধামের অন্তঃসারশূন্য রিফর্ম-রথখানা এমন মাঠে মারা যেতে বসেছে কেন?

জেলের ভেতর রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর নাকি ভারি অত্যাচার করা হচ্ছে, সংবাদপত্রে প্রায়ই এই রকম অভিযোগ দেখা যাচ্ছে এবং এও দেখা যাচ্ছে যে, গবর্মেণ্টের পাব্‌লিসিটি বোর্ড থেকে ক্রমাগত তার প্রতিবাদও প্রকাশ হচ্ছে! উভয়পক্ষের এই বাদ প্রতিবাদে কিন্তু একটা ব্যাপার আমরা বেশ লক্ষ্য কোরে দেখ্‌তে পাচ্ছি যে, পাবলিসিটি বোর্ড থেকে যে প্রতিবাদগুলি বেরুচ্ছে তার অধিকাংশই বন্দীদের প্রতি অত্যাচারের যে অভিযোগ আস্‌ছে—ঠিক তারই বিরুদ্ধ প্রতিবাদ নয়। সেগুলি হচ্ছে অনেকটা রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি জেলে যে দুর্ব্ব্যবহার করা হয়েছে সেটা যে আইন সঙ্গত কাজই করা হয়েছে এবং সেরূপ করা ছাড়া যে জেলের নিয়ম কানুনের মর্য্যাদা রক্ষে কোরে চলা ও কারাগারের অভ্যন্তরস্থ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা অসম্ভব এইটেই প্রমাণ করবার দুশ্চেষ্টা মাত্র! যাই হোক্‌, অত্যাচার কিছু করিনি বলার চেয়ে অত্যাচার যে কেন করিছি সে কৈফিয়ৎটুকুও মন্দের ভালো!

সেদিন ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বাটীতে খদ্দর প্রচার সমিতির উদ্যোগে যে খদ্দর-প্রদর্শনী হয়েছিল তারই উদ্বোধন সভায় শ্রীযুক্ত স্যর পি, সি, রায় মহাশয় অন্যান্য কথার প্রসঙ্গে নাকি বলেছিলেন যে, দেশের যখন এই অবস্থা তখন দেশের যুবক বৃদ্ধ কিনা তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদ নিয়ে মেতে আছে, থিয়েটার বায়োস্কোপে তো লোক ধর্‌ছেইনা—তাছাড়া সব চেয়ে দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই যে, দেশের যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি তিনি আজকের দিনে স্বদেশের চারণ গান ছেড়ে গাইছেন কিনা "বর্ষামঙ্গল!" স্যর পি, সি, রায়ের কথাগুলো হয়তো সেদিন সে ক্ষেত্রে শুনতে বেশ ভাল লেগেছিল কিন্তু

আমাদের মনে হয় যে, কবি সম্বন্ধে তাঁর ও কথাটা বলা ন্যায়সঙ্গত হয়নি,—এতে বিশ্ববরেণ্য কবির প্রতি জগৎ-বিখ্যাত রসায়ণাচার্য্যের একটা অবিচার করা হয়েছে!—কারণ যিনি কবি, গভীর স্বদেশ-প্রেমিক হোলেও তিনি প্রকৃতির ও একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিক ও পূজারী,—বর্ষার মেঘবিচিত্র আকাশ,—বিদ্যুতের তড়িৎলহরী,—গ্রীষ্মাবসানে প্রাবৃটের স্নিগ্ধ সুশীতল ঝারায় উত্তপ্ত ধরণীর ধারাস্নান তৃষার্ত্ত চাতকের মত কবির প্রাণকেও যে ব্যাকুল ও বিহ্বল কোরে তোলে! কবি যিনি, তিনি রণক্ষেত্রে মৃত্যু-কোলাহলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলেও আষাঢ়ের প্রথম দিবসেকে অভিনন্দন না কোরে থাকতেই পারেন না! বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে কবি-প্রকৃতির যে পরম যোগ রয়েছে সে কথা কি আমাদের নব-নাগার্জ্জুন একেবারেই বিস্মৃত হোয়ে গেলেন! বৈজ্ঞানিকে আর কবিতে প্রভেদ এইখানে।

প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জের 'সিভিল সার্ভিস' বক্তৃতা ভারতের মডারেটদের বক্ষে যে নিদারুণ শেলাঘাত করেছে, তার অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হোয়ে জনকতক নরমপন্থী বড়লাট সাহেবের কাছে সেদিন ধর্ণা দিয়েছিলেন। বড়লাট সাহেব তাঁদের ব্যথিত বক্ষে সস্নেহে হাত বুলিয়ে ফুঁ দিয়ে ঝেড়ে বলেছেন "মাভৈঃ বৎসগণ! প্রধান মন্ত্রী যা বলেছেন, তার প্রকৃত অর্থ তোমরা যা ভাবছ মন্ত্রীর উদ্দেশ্য মোটেই তা নয়; তিনি ঠিক সে ভাবে ও কথাগুলো বলেন-নি। তাঁর ওই রকমের একটা বক্তৃতা দেওয়ায় কোনও গুরু উদ্দেশ্য ছিল, বুঝলে! তাঁর প্রথম অভিপ্রায় হচ্ছে—অসন্তুষ্ট সিভিল সার্ভেণ্ট সম্প্রদায়কে একটু মিষ্টি কথায় শান্ত করা, এবং দ্বিতীয় অভিপ্রায় হচ্ছে—ননকো-অপারেটারদের একবার শাসিয়ে সাবধান কোরে দেওয়া। কারণ শোনা যাচ্ছে, তারা নাকি এবার সদলে কৌন্সিলে ঢুকে রিফর্ম কেতায় রাজকার্য্য চালানো অসম্ভব কোরে তুলবে স্থির করেছে! তা যদি তারা করে, তা হোলে যেটুকু শাসন সংস্কার এদেশকে দেওয়া হয়েছে সেটাও কেড়ে নেওয়া হবে—এই বলে তিনি ভয় দেখিয়েছেন বটে, কিন্তু কাজে তিনি কখনই তা করবেন না—এটা তোমরা স্থির জেনে নিশ্চিন্ত হও! যাক্, কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতার আসল গলদ যেখানে—বড়লাট কৌশলের সঙ্গে সেটা একেবারেই চাপা দিয়ে গেছেন, "Experiment" কথাটা নিয়ে মোটেই আলোচনা করেন-নি। মডারেটরা নাকি বড়লাট সাহেবের কাছ থেকে এই শান্তি প্রলেপটুকু পেয়েও এখনও সুস্থ হোতে পারছেন না, তাঁরা এখনও চারদিকে প্রতিবাদ সভা কোরে মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন! ধন্য এই মডারেট্‌পন্থদের বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতা! আজ এই দেড়শ বছর ধরে তাঁদের আবেদন নিবেদন, প্রতিবাদ, প্রার্থনা সবই ব্যর্থ হচ্ছে দেখেও তবু ও এখনও তাঁরা হতাশ হন-নি! এরাই সব কলির ভক্ত অজামীল!"

১ম বর্ষ] ১৩২৯ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

বৈশাখী

সচিত্র পাক্ষিক পত্র

কার্য্যালয়
২০৮।২এফ্ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রতিসংখ্যা
এক আনা

বার্ষিক মূল্য ২৵০

দুই টাকা দুই আনা।

বৈঠকের নিয়মাবলী

বৈঠকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ দুই টাকা দুই আনা; ভিঃ পিঃ মাশুল স্বতন্ত্র। প্রতি সংখ্যার জন্য এক আনা। নমুনারও মূল্য লাগে। যে কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া চলে। মূল্য সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়।

রিপ্লাইকার্ড কিংবা টিকিট না পাঠাইলে কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রবন্ধাদি বৈঠকের দুই পৃষ্ঠা বড় জোর আড়াই পৃষ্ঠা অপেক্ষা দীর্ঘ না হয়। টিকিট পাঠাইলে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে কিনা তাহা জানানো হয়। মনোনীত অথবা অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত পাঠান হয় না।

যদি কোন গ্রাহক বৈঠক না পান তো ৭ দিনের মধ্যে আমাদের খবর দেবেন। নচেৎ অপ্রাপ্ত সংখ্যা দামদিয়া লইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন

মলাটের চারের পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যা—৮৲

অন্যান্য পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যা—৬৲

অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—৩৷৹

কলমের প্রতি ইঞ্চি একবৎসরের চুক্তিতে প্রতিসংখ্যা—১৲

কলমের প্রতি ইঞ্চি প্রতিসংখ্যা—২৲

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়

ম্যানেজার বৈঠক

২০৮।২ এফ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এজেণ্ট :—শ্রীপরেশনাথ মিত্র

১ম বর্ষ] ১লা আশ্বিন, ১৩২৯ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

গাল-গল্প

শিক্ষক। এমন কোনো প্রথার নাম কর যা পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশেই প্রচলিত আছে।

ছাত্র। আজ্ঞে, ঘুষ।

—

যদু—তোমাদের বাড়ার কুকুরটা রোজ সকালে অত চেঁচায় কেন হে?

হরি—সকালে যে ওর ল্যাজ ছাঁটা হয়।

যদু—রোজ ল্যাজ ছাঁটা কিহে!

হরি—এক সঙ্গে কাট্‌লে যদি মরে যায়, তাই সইয়ে সইয়ে বেঁড়ে করি।

—

নরেন। কি হে মুখটি শুকিয়ে বসে আছ কেন?

যোগেন। আর ভাই বোলো না, স্ত্রী গঙ্গা নাইতে গিয়েছে, আর এই সময় জল ঝড় সুরু হোলো; রাস্তায় এতক্ষণ বোধহয় জল দাঁড়িয়ে গেছে।

নরেন। তাতে আর কি হয়েছে, কারো বাড়ীতে ঢুকে পড়লে তারা কি আর ঘণ্টা খানেকের জন্য আশ্রয় দেবে না!

যোগেন। আরে ভয়ের কারণই তো সেই!

—

কাল খুকীর বে, খুকী মুখ শুকিয়ে বেড়াচ্ছে দেখে মা বল্লেন—হ্যাঁ খুকী কাল তোর বে, কেমন ঘটা কোরে বর আস্‌বে আর তোর মুখে হাসি নেই কেন? আমি তো আমার বের দিন খালি হেসে বেড়িয়েছিলুম! মেয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে বল্লে—তোমাকে তো ভাব্‌তে হয়নি,—তোমার যে বাবার সঙ্গে বে হয়েছিল, তাইত হেসেছিলে!—আমার যে একেবারে কোথাকার কে একজন অচেনা অজানা লোকের সঙ্গে বে দিচ্ছো, তাইত আমার ভয় করছে!

—

পাওনাদারের লোক এসেছে টাকার তাগাদা করতে। দেনদারের সন্দেহ হোলো

যে, এ টাকাটা বোধহয় দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি পাওনাদারের লোককে জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ হে এ টাকাটা কি আগে দেওয়া হয়নি জানো?

—আজ্ঞে, আমি তো সেটা ঠিক জানিনি।

—তবে কে জানে? তোমার মনিবও কি জানেন না যে, এ টাকা দেওয়া হয়েছে কিনা?

—আজ্ঞে তিনিও ঠিক্ জানেন না এ টাকাটা আদায় হয়েছে কিনা।

—তবে তোমরা আবার তাগাদায় এসেছো কেন?

—আজ্ঞে টাকাটা আপনার কাছ থেকে পাওয়া গেলে তিনি বুঝতে পারবেন সেটা আদায় হোলো কিনা।

এক ভদ্রলোক বিদেশে বেড়াতে গিয়েছিলেন সঙ্গে তাঁর মোটর-কারখানি নিয়ে। মাসে তিরিশ টাকা দিয়ে এক বাড়ী ভাড়া নিয়ে তিনি সেখানে আরামে বাস করতে লাগলেন। এক মাস পরে তাঁর বাঙাল বাড়ীওলা বাড়ীভাড়ার বিল নিয়ে এলো নব্বুই টাকার! তিনি তো বিল দেখে অবাক! বল্লেন—একি হে! বাড়ী ভাড়া হোলো মাসে তিরিশ টাকা হিসাবে আর বিল কোরে আন্‌লে নব্বুই টাকার! এর মানে কি? বাড়ীওলা হাত জোড় কোরে বল্লে—আজ্ঞে বাড়ী ভাড়া তিরিশ টাকা, আর আস্তাবল ভাড়া ষাট টাকা এই একুনে নব্বুই টাকা হয়েছে! ভদ্রলোক আরও আশ্চর্য্য হোয়ে বল্লেন—বাড়ীর চেয়ে কি আস্তাবলের ভাড়া তোমাদের দেশে বেশি? বাড়ীওলা বল্লে—আজ্ঞে না তা নয়, আস্তাবল ভাড়া ঘোড়া পিছু আমরা পাঁচ টাকা কোরে নিই! তা আপনি সেদিন বল্লেন যে, আপনার মোটর গাড়ীখানা বারো ঘোড়ার জোর, তাই সেই হিসেবে ষাট টাকা ধরা হয়েছে!

মদন চাষা সেদিন তার গরুর গাড়ীতে ক্ষেতের শাক-শব্জী আনাজ বোঝাই দিয়ে হাটে গেল বেচ্‌তে; কিন্তু সন্ধ্যের পর নিয়মিত সে বাড়ী ফিরলে না দেখে সমস্ত রাত উদ্বেগে কাটিয়ে মদনের বউ ভোরে উঠে তাকে খুঁজতে বেরুল। বেরিয়ে দেখে গোয়ালের ধারে তাদের গরুর গাড়ী এসে দাঁড়িয়ে আছে আর মদন গাড়ীর উপর চিৎ হোয়ে পড়ে হাত পা ছড়িয়ে নাক ডাকিয়ে তোফা ঘুম দিচ্ছে। মদনের বউ মনে করলে মিন্সে বোধহয় কাল একটু বেশী কোরে তাড়ী-টাড়ী খেয়েছিল, আরও খানিকটা ঘুমোক্ সুস্থ হবে। এই ভেবে মদনকে আর না তুলে গাড়ীর বলদ জোড়াকে খুলে জাব খাওয়াতে নিয়ে গেল।

খানিক পরে মদন উঠে চোখ রগড়াতে রগড়াতে হাই তুলতে তুলতে বাড়ীর ভেতর এসে বল্লে—বউ, দেখ্, আমি যদি মদন চাষা হই, তা হোলে আমার বলদ জোড়াটা নিশ্চয় কাল রাতে চুরি হোয়ে গেছে! আর তা যদি

না হয়, তা হোলে নিশ্চয় কাল আমার একখানা গরুর গাড়ী লাভ হয়েছে বুঝলি ?

মদনের বউ হেসে বল্লে—মুখে আগুন তোমার, এমন নেশা কি না খেলেই নয় !

——

কলকাতার গঙ্গার ধারে সেবার এক যুদ্ধের জাহাজ এসে হাজির হয়েছিল। হুজুগে বাঙালীর দল সকাল-সন্ধ্যায় গঙ্গার তীরে জেটির ধারে গিয়ে রোজই ভিড় করে। কেউ জাহাজে ঢুকতে পায় কেউ পায় কেউ পায় না, এই রকম অবস্থা, এমন সময় নদেরচাঁদ শুনলে যে, কোট প্যাণ্টলুন পরে গেলে নাকি কেউ আটকায় না। এক রবিবারে আফিসের ছুটিতে নদেরচাঁদ ধুতির ওপরে এক প্যাণ্টলুন চড়িয়ে তার ওপরে এক লাল বনাতের কোট গায়ে দিয়ে যুদ্ধের জাহাজ দেখতে গেল।

নদেরচাঁদ উৎসাহ কোরে গেল বটে, কিন্তু জেটির ধারে গিয়ে ভিড় দেখে ভড়কে গেল—ভেতরে ঢুকতে আর সাহস হোলো না, সেও ভিড়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। ভিড়ের জনকয়েক লোক তার সাজ-পোষাক দেখে ঠাট্টা কোরে বল্লে—আপনার তো মশায় ইজের পরা আছে, আপনি যান না। তাদের কথা শুনে নদেরচাঁদ সাহস পেয়ে গট্ গট্ কোরে জেটি দিয়ে এগিয়ে চল্লো। জাহাজের সিঁড়ির কাছে একজন সেলার দাঁড়িয়েছিল সে ইংরেজীতে তাকে কি বলায় নদেরচাঁদ ইসারায় দেখিয়ে দিলে যে, সে জাহাজ দেখতে চায়।

সেলার তাকে বল্লে—কাম্ অন্ থার্সডে।

সেলারের কথা শুনেই নদেরচাঁদ পেছু ফিরে একরকম দৌড়িয়ে ফিরে এল। তার রকম-সকম দেখে সবাই জিজ্ঞাসা কল্লে—কি মশাই কি হলো ?

নদেরচাঁদ। এখন কামান ঠাস্‌ছে, এখন যাওয়া হবে না।

ঘণ্টাখানেক পরে আবার তারা নদেরচাঁদকে পাঠিয়ে দিলে। কিন্তু সেবারেও সেলারেরা সেই কথাই বলে দিলে। নদেরচাঁদ ফিরে এসে বল্লে—এখনও কামান ঠাস্‌ছে।

ভিড়ের লোকেরা বল্লে—কি এমন কামান বাবা, যে ঘণ্টাখানেক ধরে ঠাস্‌ছেই।

তখন একজন লোক একটু এগিয়ে গিয়ে সেই সেলারকে জিজ্ঞাসা কোরে জানলে যে, বেস্পতিবার ছাড়া বাইরের লোককে ঢুকতে দেওয়া হয় না। সেলার বলেছিল—'কাম্ অন্ থার্সডে,' নদেরচাঁদ তার অর্থ করলে—'কামান ঠাস্‌ছে।'

তারপরে নদেরচাঁদের যে অবস্থা হোলো সেটা এখানে প্রকাশ না করাই ভাল।

——

ছুটো খবর

কবিবর রবীন্দ্রনাথ বেশ ভাল ছবিও আঁক্‌তে পারেন।

গত জুন মাসের একটা সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত বাংলা দেশে চল্লিশটা ডাকাতি হোয়ে গেছে।

পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত যত সোনা পাওয়া গেছে তার চল্লিশ ভাগ আছে মার্কিন যুক্ত রাজ্যে।

সিংহলে একরকম ঘাস আছে, বৃষ্টি হোলে সেই ঘাস নাকি আপনিই জ্বলে ওঠে। এই সময় সেই ঘাস থেকে একরকম শব্দও শুনতে পাওয়া যায়।

মৌমাছিরা ঝড় হবার অনেক আগে বুঝতে পারে যে, ঝড় আসচে। ঝড়ের সম্ভাবনা দেখলেই মধু সঞ্চয়ের কাজ ফেলে তারা নিজেদের বাসায় পালিয়ে যায়।

মার্কিনের সোনার খনির মালিকরা স্থির করেছেন যে, সোনা গলিয়ে বার করবার সময় অনেক সোনা ধোঁয়া ও বাতাসের সঙ্গে উড়ে যায়। বাতাস ও ধোঁয়া থেকে তাঁরা সোনা বার কোরে নেবার ব্যবস্থাও কোরে ফেলেছেন।

বেরালের গায়ে রং

বিলাসিতা মানুষকে যে কতদূর নির্ব্বোধ ও হৃদয়হীন কোরে তুলতে পারে তার ঠিকানা নাই। মার্কিনের রমণী-মহলে পোষাকের সঙ্গে মিলিয়ে সেই রংঙের জুতো, ছাতি, মোটরগাড়ী পর্য্যন্ত ব্যবহার করা হচ্ছে। সম্প্রতি সেখানকার জনকয়েক উচ্চশ্রেণীর মহিলা বেরালের গায়ে লাল, নীল প্রভৃতি পোষাকের সঙ্গে মিলিয়ে রং মাখিয়ে কোলে কোরে রাস্তায় বেড়াতে আরম্ভ করেন। বেরালের গায়ে রং মাখালে তারা বেশীদিন বাঁচতে পারে না; কারণ গা চাটবার সময় সেই বিষাক্ত রং তাদের পেটে যায় ও সপ্তাহ কয়েকের মধ্যে অত্যন্ত যন্ত্রনা ভোগ কোরে তারা মারা যায়। ব্যাপার দেখে মার্কিন সরকার আইন কোরে দিয়েছেন যে, কেউ বেরালের গায়ে রং মাখালে তার সাজা হবে। এই সম্পর্কে সেদিন সেখানকার পুলিশ এক-জন বড় লোকের বাড়ী খানাতল্লাসী কোরে তেরো চৌদ্দটি রং-মাখানো বেরাল আবিষ্কার করেছে। এই বাড়ীর গিন্নি প্রত্যেকটি ঘরের দেয়াল ভিন্ন ভিন্ন রংয়ে রঞ্জিত করেছেন। দেয়ালের রংয়ের সঙ্গে মিলিয়ে ঘরের আসবাব-পত্রেরও রং করা হয়েছে, এবং প্রতি ঘরে সেই রংয়ের একটি কোরে বেরালও ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল; পুলিশ বেরালগুলি নিয়ে গিয়েছে। বাড়ীর গিন্নিকে এখন আদালত ছোটাছুটি করতে হচ্ছে। বলিহারি সখ!

নোয়ার নৌকো

পাঠক নোয়ার নৌকোর কথা নিশ্চয় জানেন। বাইবেল ও অন্যান্য ধর্ম্ম গ্রন্থে আছে যে, বহু সহস্র বৎসর আগে পৃথিবী পাপে পূর্ণ হওয়ায় ভগবান একবার জলপ্লাবন কোরে দিয়ে পৃথিবীকে ধ্বংস কোরে ফেলেছিলেন। সেই জলপ্লাবনে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীই মারা যায়, কেবল ঈশ্বর নোয়া নামক একজন ধার্ম্মিক লোককে বাঁচিয়ে রাখেন। এই নোয়া একটি বড় জাহাজ তৈরি কোরে তাতে চড়ে প্রাণ বাঁচিয়ে ছিলেন। মিশরের কাইরো সহরে ইহুদীদের গির্জ্জার এক দেওয়ালের ধারে এক টুকরো কাঠ সযত্নে রেখে দেওয়া হয়েছে. সেখানের লোকেরা বলে য, সেই কাঠের টুকরোটা নোয়ার নৌকোর ভগ্নাংশ। এই পবিত্র কাষ্ঠখণ্ড পাছে কেউ চুরি করে অথবা অপবিত্র কোরে দেয় এই ভয়ে সেখানে দিনের বেলা চারজন ও রাত্রে আটজন পাহারা খাড়া থাকে। কাঠখানাকে দেখে পুরোনো আমলের কোনো জাহাজের কাঠ বলে মনে হয়। কেউ দেখতে গেলে সেখানকার গাইডরা গদ্যে পদ্যে এই কাঠের গুণ বর্ণনা করে ও য়সা আদায় করে। আমাদের দেশে বৃন্দাবনে কদম গাছ দেখার মতন এক্ষেত্রেও অধিকাংশ লোকেই নোয়ার নৌকোর কথা বিশ্বাস করে না বটে, কিন্তু দক্ষিণা কিছু দিয়ে আসে।

আমাদের সমাজ

সম্প্রতি বৌ-বাজারের কাছে শ্রীমন্ত দের লেনে এক বাড়ীতে একটি শোচনীয় কাণ্ড হোয়ে গেছে। কার্ত্তিকচন্দ্র সেন নামে এক যুবক কলকাতর এক সওদাগরী অফিসে চাকরী করত। কার্ত্তিকের ঘোড়দৌড় খেলার বাতিক ছিল। অফিসে সে অতি সামান্যই মাইনে পেত, তার ওপরে গরীবের এই ঘোড়ার রোগ হোলে যা দাঁড়ায় তাই হোলো। কার্ত্তিক সর্ব্বস্বান্ত হোয়ে পড়লো, সংসার আর চালাতে পারে না। অবশেষে কার্ত্তিক ও তার স্ত্রী প্রভাবতী দু-জনে কাপড়ে কেরোসিন তেল ঢেলে তাতে অগ্নি-সংযোগ কোরে আত্মহত্যা করেছে। কার্ত্তিকের বয়স চব্বিশ ও প্রভাবতীর বয়স ষোলো।

কার্ত্তিক ছিল যুবক। সে বয়সে কোনটি কর্ত্তব্য এবং কোনটি অকর্ত্তব্য তা বেশ বুঝে নিতে পারা যায়। প্রথম কথা, সংসার চালাবার যার শক্তি নেই তার বিয়ে করা কেন? আমাদের দেশের বাপ-মা ছেলের বিয়ে দিয়ে দেয় কিন্তু তারা গত হোলে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার যে কোথা দিয়ে চলবে সে বিষয় একবার চিন্তাও করে না। কার্ত্তিকের অভিভাবক কার্ত্তিকের বিয়ে দিয়ে কত টাকা পেয়েছিল সে সংবাদটা আমরা নিতে পারি-নি। তবে বিয়ের সময় যে তারা প্রভাবতীর অভিভাবকদের এমনিতে

ছেড়ে দিয়েছিল তাই বা বিশ্বাস করি কি কোরে।

কার্ত্তিক বিয়ে করেছিল এবং সদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন কোরে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ চালাতে সে আইনত এবং ধর্ম্মত বাধ্য ছিল। কিন্তু সে কাজ না কোরে সে স্ত্রীকে বুঝিয়ে তাকে আত্মহত্যা করালে। এর জন্য পরোক্ষভাবে আমাদের সমাজ যে কতটা দায়ী তা ভাববার কথা। স্ত্রীর এই রকম পাপের জন্য আমাদের দেশের কোনো স্বামী স্বেচ্ছায় জীবন্তে এই ভাবে দগ্ধ হোয়েছেন—এমন দৃষ্টান্ত আমাদের ধর্ম্ম পুস্তকেও নাই।

সমাজ কর্ত্তারা ব্যবস্থা কোরে দিয়েছেন যে, একটা বয়স পার হবার আগেই মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে। এইজন্য গরীব যারা,তারা সমাজচ্যুত হবার ভয়ে চোখে কানে না দেখে অক্ষমের হাতেও কন্যা সমর্পণ কোরে চৌদ্দ পুরুষকে নরক থেকে বাঁচিয়ে ফেলেন—ফলে কার্ত্তিকের মতন জামাই জোটে। পাঠক একবার ভেবে দেখুন যে, ষোল বছরের মেয়ে প্রভাবতী—সে সংসারের কিছুই জানে না, অথচ কার পাপে তাকে জীবন্তে দগ্ধ হোতে হোলো? এর কি প্রতিকার নাই?

আমাদের সমাজের দেহ নানা রকম কুৎসিত ব্যাধিতে পরিপূর্ণ, তার ওপর গত কয়েকবছর থেকে এই ঘোড়দৌড় খেলায় সমাজের যে কি সর্ব্বনাশ হচ্ছে তা একবার কেউ ভাবেন কি? আগে শুধু বড়লোকদের গণ্ডীতেই এই ব্যাধি আবদ্ধ ছিল, কিন্তু গত যুদ্ধের প্রারম্ভ কাল থেকে এই ব্যাধি সমাজের সমস্ত দেহেই সংক্রামিত হয়েছে। ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়ে দেখবেন যে,মেথর থেকে আরম্ভ কোরে লক্ষপতি পর্য্যন্ত এই জুয়ায় মত্ত হচ্ছে, কত লোকের, কত পরিবারের যে এতে সর্ব্বনাশ হয়েছে তার আর ইয়ত্তা নাই। সমাজ ইচ্ছা করলেই এই সাংঘাতিক ব্যাধির প্রসার বন্ধ করতে পারেন কিন্তু তা কি তাঁরা করবেন! কোনো নির্দ্দিষ্ট বয়সের মধ্যে মেয়ের বিয়ে না হোলে চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ হয়, আর ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়ে জুয়া খেললে কি তাঁরা স্বর্গস্থ হন?

কিছুদিন আগে টার্ফ ক্লাব রেঙ্গুনের বিশপের হাতে একটা মোটা রকমের চাঁদা দিতে চেয়েছিলেন—সেখানকার অন্ধদের আশ্রমের সাহায্যের জন্য। রেঙ্গুনের বিশপ এই জুয়ার টাকা অগ্রাহ্য কোরে চাঁদা ফিরিয়ে দিয়ে বলেছেন যে, ও tainted money আমরা চাইনা—কারণ সে অর্থ ঘৃণ্য। রেঙ্গুনের এই বিশপের দৃষ্টান্ত আমাদেরও আদর্শ হওয়া উচিত।

সম্প্রতি আদালতে কার্ত্তিকচন্দ্র সামন্ত নামক এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হত্যা করার চেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিল। কার্ত্তিকের স্ত্রী সত্যদাসী আদালতে এই সম্পর্কে

যে কথা বলেছে তার মর্ম্ম এই যে, তাদের দেশ মেদিনীপুরের কোনো এক গ্রামে। অতি শৈশবে তার সঙ্গে কার্ত্তিকের বিয়ে হয়। বিয়ের কিছুদিন পরে কার্ত্তিক মোক্ষদা নাম্নী এক স্ত্রীলোককে নিয়ে কলকাতার কাছে টালিগঞ্জে এসে স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করতে থাকে। এই ব্যাপারের কিছুদিন পরে সত্য দাসীর বাপ ও মা মারা যাওয়ায় সে একেবারে আশ্রয়হীনা হোয়ে পড়ে। কার্ত্তিকের একজন প্রতিবেশী তার ওপরে দয়া-পরবশ হোয়ে তাকে নিজের বাড়ীতে এনে ও খেতে পরতে দেয়। অনেকদিন পরে এই লোকটী খোঁজ কোরে কার্ত্তিকের সন্ধান পেয়ে সত্যকে নিয়ে একেবারে তার বাড়ীতে এসে হাজির হয় ও সেখানে সত্যকে রেখে যায়। এখানে কার্ত্তিকের উপপত্নী মোক্ষদা তার ওপর অত্যাচার করতে থাকায় সে সত্যকে অন্য আর এক জায়গায় রেখে দেয়। কিছুদিন আগে কার্ত্তিক সত্যকে গিয়ে বলে যে, সে দেশে গিয়ে চাষবাস কোরে খাবে। এই বলে দেশে নিয়ে যাবার নাম কোরে সে সত্যকে নিয়ে ডায়মণ্ড হারবারে যায়। তারপর তাকে বাঁধের ওপর দিয়ে অনেকদূর অবধি নিয়ে যায়। এদিকে সন্ধ্যে হোয়ে আসায় কার্ত্তিক সত্যকে কাছের একটা জঙ্গলে নিয়ে যায়। সেখানে হঠাৎ মোক্ষদার আবির্ভাব—মোক্ষদা সত্যকে চিৎ কোরে ফেলে তার দু-পা চেপে ধরে ও কার্ত্তিক ক্ষুর দিয়ে তার গলা কাটতে সুরু করে। সত্য সেই সময় কার্ত্তিককে বলে—আমি জীবনে আর কখনো তোমায় কোনো রকমে বিরক্ত করব না, তুমি আমার প্রাণে মেরো না। কিন্তু কার্ত্তিক তার কোনো কথা না শুনে তার গলায় ক্ষুর বসিয়ে দেয়। শেষে সত্য মরে গেছে মনে কোরে তাকে ফেলে রেখে চলে আসে, আসবার সময় তার পরণের কাপড়খানা খুলে নিয়ে আসে। সত্যর জ্ঞান হওয়ার পর কোন রকমে কষ্ট কোরে সে হামাগুড়ি দিয়ে উলঙ্গ অবস্থাতেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে। সকালে লোকজনের চোখে পড়ায় তারা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে দু-মাস থাকার পর সে প্রাণে রক্ষা পায়। সত্যর বয়স এখন মাত্র পনেরো বৎসর।

কার্ত্তিক আমাদের দেশের নিম্ন অর্থাৎ চাষা শ্রেণীর লোক। আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকদের মেয়েদের সম্বন্ধে ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই ভদ্রলোক শ্রেণীদের চেয়ে অনেকগুণে মনুষ্যোচিত ছিল। তাদের মধ্যে বাল-বিধবার বিবাহ চলিত ছিল এবং এখনও অনেক স্থানে আছে। নির্জ্জলা একাদশীর প্রথাও ছিল না। নারীর সতীত্বের মর্য্যাদা তারা ভদ্রলোদের চেয়ে যে কিছু কম বুঝতো তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু ভদ্রলোকদের দেখাদেখি তারাও এখন বিধবা-বিবাহ তুলে দিচ্ছে, তাদের মধ্যে একাদশী প্রভৃতি প্রথা প্রচলিত হচ্ছে। বিনাদোষে পত্নীকে পরিত্যাগ কোরে উপপত্নীর সঙ্গে ঘর করা এবং বিনা

দোষে নিরীহ পত্নীকে হত্যা করবার চেষ্টাও বোধহয় ভদ্রলোকদের অনুকরণ করবার চেষ্টারই ফল।

শরীর ও স্বাস্থ্য

বাঙালী গায়ে জোর কর। বাহুতে দুর্জ্জয় শক্তি ও হৃদয়ে অমিত সাহস এই দুইটি জিনিষই জীবন-যাত্রার প্রধান পাথেয়। যদি রেলে শ্বেতাঙ্গদের কাছে অপমানের হাত থেকে রক্ষা পেতে চাও, যদি রাস্তায় কাবুলীওয়ালার লাঠি থেকে বাঁচতে চাও, যদি সারা জীবন সুস্থ সবল কর্ম্মক্ষম থাকতে চাও তো গায়ে জোর কর। বাঙালী যে কাপুরুষ তার অনেকগুলি কারণ আছে কিন্তু তার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কারণ হচ্ছে বাঙালীর দৈহিক শক্তি নাই। আমরা দৈহিক শক্তিতে হীন বলেই এত আধ্যাত্মিকতার বড়াই করি। লেখা পড়া অথবা অর্থোপার্জ্জন করা সকলের ভাগ্যে হয় না, এমন কি প্রাণপণ চেষ্টা কোরেও হয় না, কিন্তু নিয়মিত ব্যায়াম কোরে শক্তি সঞ্চয় করতে পারে-নি এমন লোক পৃথিবীতে দুর্লভ। আমরা আজ এখানে যাঁর ছবি দিচ্ছি
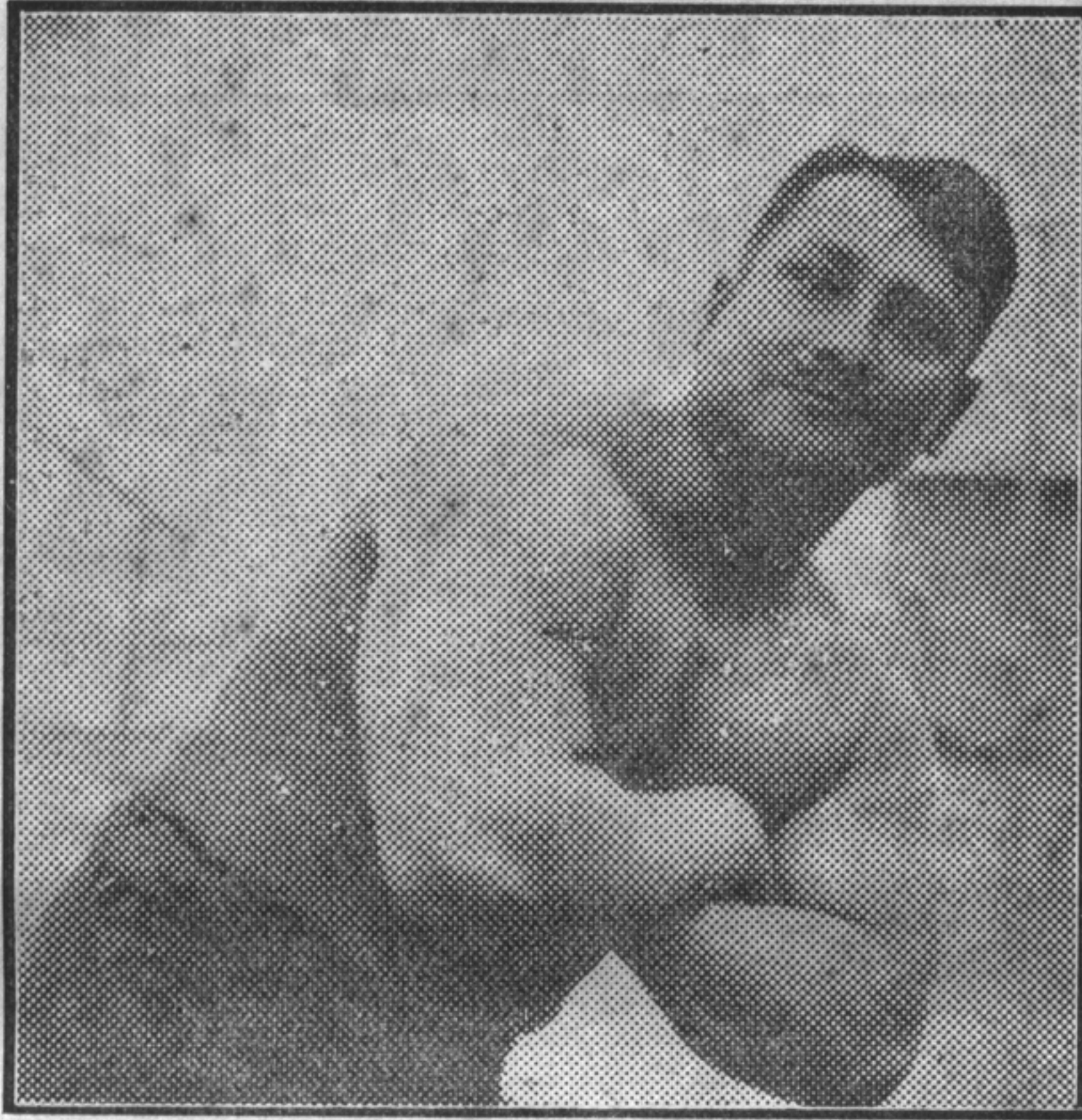
শ্রীফণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

শ্রীফণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

ইনিও একজন বাঙালী। এঁর নাম ডাক্তার ফণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত। ইনি স্বভাব-কবি স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কনিষ্ঠ সহোদরের দৌহিত্র। ইনি বাল্যে অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিলেন, কিন্তু পরে বিখ্যাত বাঙালী মল্ল অম্বুচরণ গুহ ও ক্ষেত্রচরণ গুহের শিষ্য হন। এখন ইনি নিজে একটি ব্যায়ামের প্রণালী আবিষ্কার করেছেন, যাতে অতি সামান্য সময়ের মধ্যে ব্যায়াম শেষ করতে পারা যায়। এখন ফণীন্দ্রকৃষ্ণের বয়স চল্লিশ বছর। চল্লিশ বছর বয়সে অধিকাংশ বাঙালীই কাবু হোয়ে পড়ে, তার কারণ তারা জীবনে কোন দিন ব্যায়াম করে না। ফণীন্দ্রকৃষ্ণ নিজে চিকিৎসক, তিনি তাঁর প্রণালীতে ব্যায়াম শিক্ষা দেবার জন্য একটা ব্যায়ামাগার খুলতে চান। সর্ব্বসাধারণের তাঁকে সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

স্পষ্ট কথা

স্যর্ জন উড্রফ্ হাইকোর্টের জজিয়তি থেকে অবসর নিয়ে দেশে ফিরে গেছেন। তিনি ব্রাহ্মণের মতে ম্লেচ্ছ হোলেও হিন্দু শাস্ত্রে বিশেষ সুপণ্ডিত ছিলেন। তন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান অনেক খ্যাতনামা তান্ত্রিকের চেয়েও যে
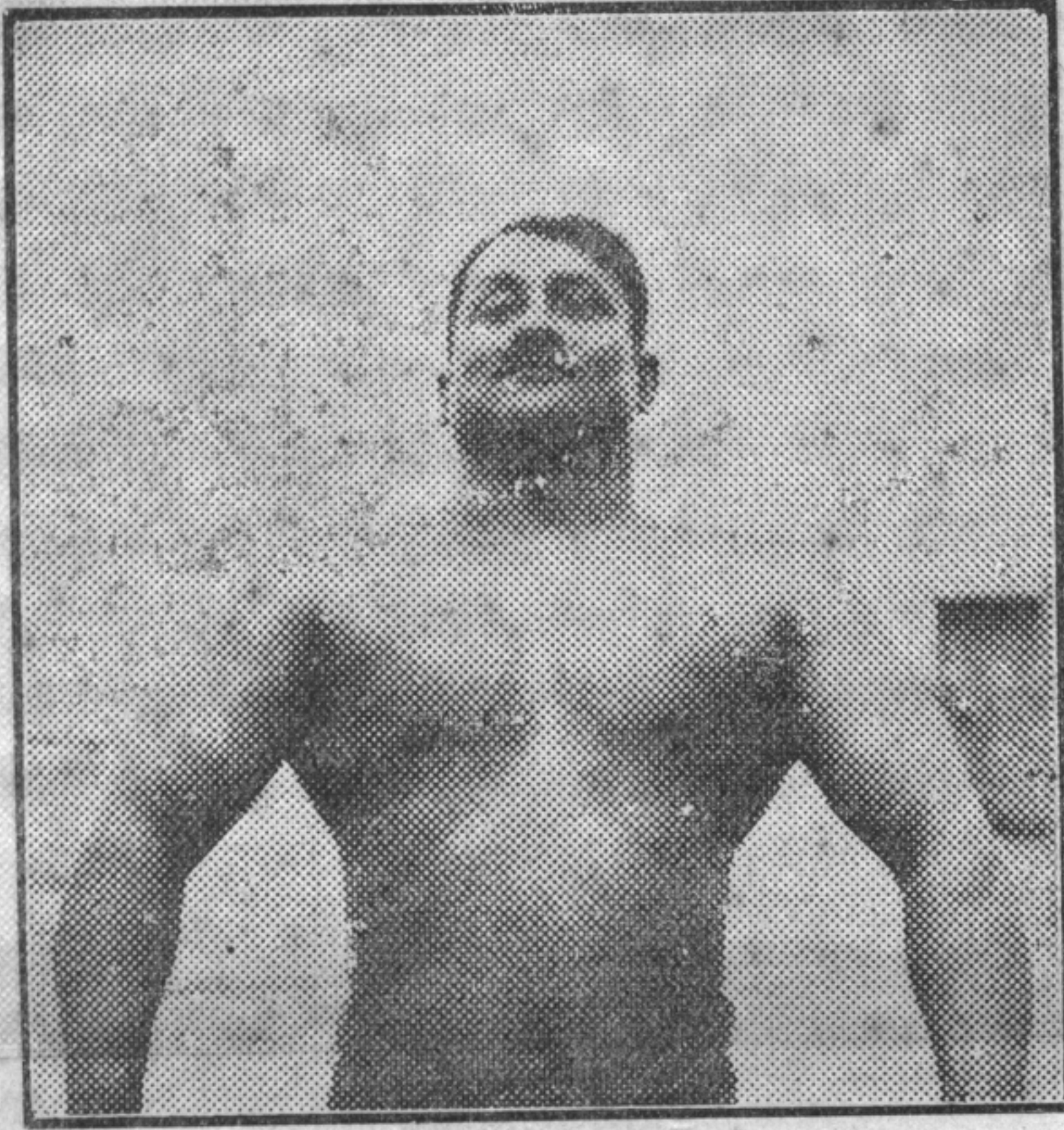
শ্রীফণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

গভীর ছিল তার পরিচয় আমরা 'আর্থার্ আভেলনের' অনুদিত "মহানির্ব্বাণ তন্ত্র" প্রভৃতি গ্রন্থে অনেকবার পেয়েছি। কিন্তু ভারতবর্ষকে তিনি যে কতটা ভালবাসতেন এর পরিচয় এদেশের অনেকেই জানেন না। আর্থার আভেলন স্যর জন উড্রফেরই ছদ্মনাম। এই মহাপ্রাণ আইরীশ পণ্ডিত ভারতের শিক্ষা ও সভ্যতাকে সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করতেন। ভারতের নিন্দা তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

বিখ্যাত ইংরেজ লেখক উইলিয়ম আর্চ্চার তাঁর "India and the Future" নামক গ্রন্থে ভারতের সভ্যতাকে বর্ব্বরতার নামান্তর মাত্র বলে উল্লেখ করেছিলেন। এদেশের শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প, সমাজ ও সভ্যতার নিন্দাবাদ তাঁর গ্রন্থের অনেক স্থলে তীব্র হোয়ে উঠেছিল। স্যর জন উড্রফ এই পুস্তক দেখবামাত্র তাঁর এই ভ্রান্ত স্বদেশবাসীর লজ্জাকর ভুলের প্রতিবাদ কোরে Is India Civilised নামক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—"প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই উভয়

জাতির মধ্যে এক পক্ষের ওপর অপর পক্ষের অন্যায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবী এবং পরস্পরের আরও নানা ভুল ধারণা যাতে বিদূরিত হয়ে সেই বিষয়ে সাহায্য করাই আমার উদ্দেশ্য!"

তিনি যে কেবলই একজন সংস্কৃতজ্ঞ ও তান্ত্রিক পণ্ডিত ছিলেন তাহা নয়। এদেশের শিল্প, সঙ্গীত, চিত্র ও ললিত কলারও তিনি একজন মুগ্ধ প্রেমিক ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত প্রতীচ্য কলাভবনের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই ভারত প্রেমিক মহাপুরুষ আজ এদেশ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলন যেন নিতান্ত একজন অজ্ঞাত অপরিচিত অনাত্মীয়ের মত! এটা আমাদের পক্ষে একটা লজ্জার কথা! স্যর্ জন যদি আর কিছু না করতেন, তাহলে কেবল তাঁর রচিত "ভারত শক্তি" গ্রন্থখানার জন্যও অন্ততঃ কৃতজ্ঞতার খাতিরে তাঁকে একটা দেশবাসীর পক্ষ থেকে বিদায় অভিনন্দন দেওয়া উচিত ছিল। সেটা না করাতে আমাদের ললাটে অকৃতজ্ঞতার কলঙ্ক লেপিত হয়েছে।

অধ্যাপক রাশ্‌ব্রূক্ উইলিয়ামস্ তাঁর সম-সাময়িক ভারত ইতিহাসের আর এক পৃষ্ঠা লিখে ফেলেছেন! এ বইখানির নাম হচ্ছে "১৯২১।২২ সালের ভারত।" এই গ্রন্থে তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে ভারতের বিদ্রোহ ঘোষণা থেকে সুরু কোরে, মহাত্মা গান্ধীর অধঃপতন ও অসহযোগ আন্দোলনের পৃষ্ঠভঙ্গ পর্য্যন্ত আলোচনা করছেন। যদিও বইখানির অধিকাংশ পৃষ্ঠা সত্যের চেয়ে কল্পনার ছায়াতেই একটু বেশি মাত্রায় অন্ধকার হোয়ে উঠেছে তথাপি অধ্যাপক রাশব্রূক্ অসহযোগ আন্দোলনের খানিকটা সার্থকতা কোনও মতেই অস্বীকার করতে পারেন-নি। তিনি তাঁর আলোচ্য গ্রন্থের এক জায়গায় বলেছেন "অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে সব দিক থেকে বিচার কোরে দেখ্‌লে এটা যে একেবারেই নিষ্ফল হয়েছে, এ কথা বলা চলে না! মহাত্মা গান্ধীর অক্লান্ত চেষ্টায় আজ ভারতের এমন এক শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে বিরাট ভাবে একটা গৌণ স্বদেশ প্রেম জাগ্রত হয়েছে যারা এর আগে স্বদেশ বলে কোনও কিছু জানতো না! সহসা তাদের মধ্যে এই ভাব আসার মূল উৎস হচ্ছে বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষ আর জাতি বিরোধ। সহর ও পল্লীবাসীর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ও আজ দেশের রাজনৈতিক অবস্থা বুঝ্‌তে পেরেছে, তবে তাদের সে বোঝার মধ্যে অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত মিথ্যা অতিরঞ্জনই বেশি কাজ করেছে! মোটের ওপর একথা বল্‌তেই হবে যে, অসহযোগ আন্দোলনের ফলেই উপরোক্ত ব্যাপারটা সম্ভব হয়েছে! এই নূতন আন্দোলনের দ্বারা যে দেশের সত্যিকার ভাল হোতে পারে,—এই বিশ্বাসটা যেমন অনেকের মনে বদ্ধমূল হোয়ে গেছে, তেমনি এই আন্দোলনের ফলে দেশে যে

অনেক হাঙ্গাম হুজ্জৎ বাড়বে এ আশঙ্কাও বড় কম লোকের মনে জাগে নি!"

বিপক্ষ দলের লোক বলে অধ্যাপক রাশব্রুক্ উইলিয়মসের একটা অখ্যাতি রটে গেছে; সে কথাটা কতদূর সত্য মিথ্যা সেটা তাঁর গ্রন্থের পাঠকেরা সহজেই বুঝতে পারবেন, আমাদের কেবল এই মাত্র বক্তব্য—অসহযোগ আন্দোলনের নিষ্ফলতা সম্বন্ধে যাঁরা কৃতনিশ্চয় হোয়ে বসে আছেন তাঁরা তাঁদেরই পরম বিশ্বাস ভাজন এই প্রফেসারটীর কাছ থেকেই সে খবরটা শুনুন।

বড় লাট লর্ড রেডিং শাসন পরিষদের শারদীয় অধিবেশনের উদ্বোধনের যে বক্তৃতা দিয়েছেন তাতে রিফর্মানন্দ গোস্বামীরা বোধ হয় একটু খুসি হোয়েছেন; কারণ তাঁদের মত নির্ব্বোধের দলকেই বোকা বোঝাবার জন্য বড়লাটের অত বড় বক্তৃতা! যাক্, আমরা তাঁদের হরিষে-বিষাদ ঘটাতে ইচ্ছে করি-নি, একে এই সবে তাঁরা লয়েড জর্জ্জের টিল-ফ্রেমের ধাক্কা সাম্‌লে ওঠবার চেষ্টা করেছেন তবে স্পষ্টবাদীতা রক্ষা করতে হোলে যে দুটো কথা নিতান্তই বলা দরকার, কেবল তাই বল্‌বো। প্রথম কথা হচ্ছে—ভূতপূর্ব্ব আইন ব্যবসায়ী ও ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি লর্ড রেডিং রিফর্মানন্দ গোস্বামীদের টিকিটি এবার বেশ কোরে টেনে ধরে বলে দিয়েছেন যে, বাপ সকল মালপো খাবার লোভে রসনা লালাসিক্ত করবার আগে—শাসন সংস্কার আইনের "প্রীয়্যাম্বেলটা" খুলে দেখো। এই প্রীয়্যাম্বেলের কথাটা একবৎসর আগে দেশবন্ধু সি আর দাস তাঁর কংগ্রেস-বক্তৃতায় বলেছিলেন! আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে—রিফর্ম যে সার্থক হবেই সে বিষয়ে কোনও ভুল নেই, তবে সময় লাগ্‌বে। কেননা সবুরেই মেওয়া ফলে। হয়ত আরও আগে মেওয়া ফল্‌তে পার্‌তো কিন্তু ওই দুষ্ট নন্-কো-অপারেটারের দল অনেকটা পেছিয়ে দিলে। যাই হোক, তোমার হতাশ হোয়ো না! নন্-কো-অপারেশনের ছুতো ধরে লাট সাহেব সবই বলেছেন বটে, কিন্তু, যে কথাটা শোন্‌বার জন্য গোস্বামী প্রভুরা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ট্যাঁকে হাত বুলোচ্ছিলেন সেই ট্যাঁকের কথাটা লাট সাহেব একেবারে বেমালুম চেপে গেছেন! রিফর্ম চল্‌বার টাকাটা কোথা থেকে আসবে সেটা এখনও রিফর্মবাদীদের দুর্ভাবনার বিষয়ই হোয়ে রইল বোধহয়। সবই ভাল, কেবল যা দুঃখ অন্ন বস্ত্রের!

তেলিনীপাড়া আর মুলতানের দাঙ্গা যে হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে এ কথা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ করা হবে! কেউ হয়ত বলবেন যে এর মধ্যে রহস্য আছে; এ বিরোধ উভয় সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাকৃত নয়, কোনও কিছুর

লোভে প্রলুব্ধ কোরে মুসলমানদের দ্বারা হিন্দুদের গৃহ লুট করানো হয়েছে, এবং সেটা এমন কোন দলের প্ররোচনায় ঘটেছে—যাদের হিন্দু-মুসলমানের সংঘাতে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে! যাই হোক্ এ সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান ও প্রমাণ না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা কোনও অনুমানের ওপর নির্ভর করতে প্রস্তুত নই।

তেলিনীপাড়ার ব্যাপার অনেকদিন ধরেই ধোঁয়াচ্ছিল! ও পাড়ায় মুসলমানেরা বকরীদের সময় হিঁদুদের একটা ধর্ম্মের ষাঁড় জোর কোরে ধরে জবাই করেছিল। দাঙ্গা বাধানোই এই অন্যায় কাজের উদ্দেশ্য হোলেও দাঙ্গা কিন্তু সেবার বাধে-নি। হিন্দুরা এ ব্যাপারে যথেষ্ট উত্তেজিত হওয়া সত্ত্বেও তারা নিরুপদ্রব পন্থাই অবলম্বন করেছিল, অগত্যা এবার তাদের বাড়ী চড়াও হোয়ে মেরে আসা হয়েছে! হতাহতের তালিকায় একজনও মুসলমান নেই, হাঁসপাতালের সব কজন ঘায়েল জখমীই হিঁদু! সুতরাং দাঙ্গাটা যে এক তরফাই হয়েছিল তাতে আর কোনও ভুল নেই! তেলিনীপাড়ায় পুলিশ ছিল। দিন দুয়েকের মধ্যেই অত বড় দাঙ্গাটা থামিয়ে ফেলেছে! বাহাদুরী আছে দেখ্‌ছি!

মুলতানের কাণ্ড আরও গোলমেলে! দু-দিন ধরে সহরের বাইরে পুলিশ ও মিলিটারি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো, আর ওদিকে সহরের ভেতর দু-দিন ধরে খুন দাঙ্গা লুটপাট চলতে লাগল! এ ব্যাপারটা কেমন সন্দেহজনক! কর্ত্তারা কৈফিয়ৎ দিচ্ছেন যে, দাঙ্গাবাজরা দলে ভারি ছিল বলে এঁরা সাহস কোরে সহরের ভেতর ঢুকতে পারেন নি! কিন্তু এ জবাবটা এমন হাস্যকর যে, কিছুতেই টেঁকতে পারে না! গুলিবন্দুক নিয়ে গোটাকতক সশস্ত্র সেপাই আর পুলিশ যে এদেশের কতগুলো নিরস্ত্র লোকের মওড়া রাখতে পারে সে কথা কারো অবিদিত নেই!

এতো গেল হিন্দু মুসলমানের হাতাহাতির ব্যাপার, তারপর লাহোরে আবার বেধে গেছে দু-দলের মুখোমুখি ঝগড়া! সেখানে শিক্ষা সচীব ফজলি হোসেন সাহেব নতুন নিয়ম করেছেন যে, সরকারী আপিসে, ইস্কুলে মেডিকেল কলেজে কেরানী বা ছাত্র নেওয়া হবে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে! এইতেই সেখানের হিঁদুরা একেবারে কান্না জুড়ে দিয়েছেন! কাউন্সিলের শিখ আর হিন্দু সদস্যরা মিলে এই নতুন নিয়মের বিপক্ষে এক লম্বা দরখাস্ত দিয়েছেন লাট সাহেবকে, ওদিকে মুসলমানরা এক বিরাট সভা কোরে সেই দরখাস্তর প্রতিবাদ করেছেন এবং হিঁদুদের এই

ব্যবহার যে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির বিরুদ্ধাচরণ করছে একথাও জোর গলায় বলে দিয়েছেন! যাক্ এখন এই নিয়ে শেষটা ওখানেও একটা দাঙ্গা না বাধলে বাঁচি! হিন্দু মুসলমানের স্থায়ী মিল সম্বন্ধে এসব ঘটনা নিরাশার পরিপোষক!

—

প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জের "ষ্টীল ফ্রেম" বক্তৃতার প্রতিবাদ কোরে সেদিন ভারত শাসন পরিষদের সভ্যরা দিল্লীতে মহা হৈ-চৈ সুরু করেছিলেন। অনেকদিনের পাকা 'ষ্টীল' স্যর উইলিয়ম ভিসেন্ট তিন ধমকে খোকাদের ঠাণ্ডা কোরে দিয়েছেন। কিন্তু এই ধমকানি দেবার সময় তাঁর মুখ দিয়ে এমন দু-একটা বেফাঁস কথা বেরিয়ে পড়েছে, যাতে বোঝা যায় যে, মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনের ফলে ষ্টীল ফ্রেমের অনেক জায়গায় বেশ চীড় খেয়েছে।

—

এতদিন প্রভুদের মুখে শোনা যাচ্ছিল যে, অসহযোগ-আন্দোলনে দেশের বারো আনা লোক যোগ দেয়-নি সুতরাং ও কোনা কাজের নয়; আজ কিন্তু রাগে ঝন্ ঝন্ কোরে উঠে ষ্টীল ফ্রেম বলে ফেলেছেন যে—"প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে ভোট-দাতার সংখ্যা এত অল্প হয়েছে আর মডারেটদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতগুলো মিটিং পণ্ড হোয়ে গেছে যে, অসহযোগীর দল দেশে খুব বেশী আছে একথা স্বীকার করতেই হবে। তারা যদি কাউন্সিলে এসে ঢোকে তাহলে শাসন-কার্য্য পরিচালনা করা দুরূহ হোয়ে উঠবে! আমি তাদের কাউন্সিলে আসায় ভয় পাইনি, কিন্তু প্রধান মন্ত্রী, যিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধার তিনি এ ব্যাপারটা নিশ্চিন্ত-ভাবে অগ্রাহ্য করতে পারবেন না! এদেশে রাজ-নৈতিক উন্নতি, শিল্প-বানিজ্যের উন্নতি, সত্য কথা বলতে কি, তোমাদের সর্ব্ব প্রকার উন্নতির প্রধান শত্রু হচ্ছে মিঃ গান্ধী। অর্থাৎ বোঝা গেল যে, ভারতের সর্ব্ব প্রকার কল্যাণকামী হচ্ছেন স্যর উইলিয়ম ভিন্সেট! গান্ধী ভারতের শত্রু এ কথা একজন বিদেশীকে বলতে শুনলে আমাদের সেই মেয়েলী প্রবাদ বাক্যটাই মনে পড়ে যায়-যে "যার চোয় যার টান।

তাকে লোকে বলে ডান!"

—

অদ্বিতীয় চিত্র-শিল্পী ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত প্রতীচ্য কলা-ভবনে (Oriental Art Society) গবর্মেণ্ট কিছুদিন থেকে বার্ষিক আঠার হাজার টাকা কোরে দান করছেন। ভারতীয় শিল্পানুরাগী লর্ড কারমাইকেল ভারতীয় চিত্র-কলার উন্নতি কল্পে এই দান মঞ্জুর করেছিলেন। সেদিন বঙ্গীয় লাট পরিষদে চিকিৎসা-ব্যবসায়ী হরিধন দত্ত প্রস্তাব করেন যে, এ টাকাটা বন্ধ কোরে দেওয়া হোক্। কারণ ওখানে যে চিত্র বিদ্যা শেখানো হয় সেটা কোনও কাজের নয়! আইন-ব্যবসায়ী সুরেন্দ্র মল্লিক সে প্রস্তাব

সমর্থন কোরে বলেন, ওখানে যে পদ্ধতিতে চিত্র অঙ্কিত হয় তাকে আদৌ চিত্র-শিল্প বলা যেতে পারে না। কারণ তারা নাকি বড়ই ভুল আঁকে। তাদের আঁকা স্ত্রী-পুরুষ সবাই একধার থেকে ক্ষীণজীবী, তার ওপর তাদের হাত দুটো সরু মোটা দু-রকমের! হাতের পাঁচটা কোরে আঙুলও নাকি তারা ঠিক সমান আঁকতে পারে না! অতএব বছরে আঠার হাজার টাকা জলে ফেলে দেবার দরকার নেই!

দেশের দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে? আজ ভারতীয় চিত্র সমালোচনা করছেন কে কে? না, তুলি ধরায় বদলে ছুরি ধরাই যাঁর পেশা। আর ফাইন আর্টের বদলে যিনি আইন হাটের একজন সুপরিচিত ব্যবসাদার! দেশের এই সবজান্তা মুরুব্বীদের অনধিকার চর্চ্চা দেখে হাসিও পায় দুঃখও হয়! চিত্র বন্যায় এই সব মহাপুরুষদের বিরাট অনভিজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে তাঁদের ভারতীয় চিত্রকলা বোঝাবার চেষ্টা করা অনাবশ্যক মনে করছি—কারণ সে অনেকটা যেন জীব বিশেষের গলায় মুক্তোর মালা পরানোর মত পণ্ডশ্রম আর অনুশোচনার ব্যাপার হবে। তাঁদের শুধু মোটা কথায় এই বলে বিদায় নেওয়া ভাল যে, বিধাতার সৃষ্ট অনেক প্রাণীর আকারের তুলনায় কান দুটো বেশি লম্বা হোলেও অথবা বুদ্ধি ও আকৃতিতে ঐরাবতের সাদৃশ্য থাকলেও আমরা যখন তাঁদের মানুষ বলেই ধরে নিই তখন ভারতীয় চিত্রকলাকে ছবি বলে গ্রহণ কোরে নিতে তাঁদের কোনও রকম আপত্তি চলতে পারে না!

যাক্ এতদিনে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। মালাবারে চলন্ত অন্ধকূপে মোপলা বন্দীদের হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী যে কে, সেটা জানতে পারা গেছে। ভারত গবর্মেণ্ট তদন্ত কোরে জানতে পেরেছেন যে, মোপলা বন্দীদের যে লোকটি ট্রেনে কোরে নিয়ে যাচ্ছিল সেই সার্জ্জেণ্ট এণ্ডরুজই এই ব্যাপারের জন্য দায়ী। অতএব ভারত গবর্মেণ্ট মাদ্রাজ গবর্মেণ্টকে সার্জ্জেণ্ট এণ্ডরুজের নামে মামলা রুজু করতে হুকুম দিয়েছেন।

ইংরেজরা কল্পনা করে যে, কলকাতার যুদ্ধের সময় এখানে অন্ধকূপ হত্যা বলে একটা কাণ্ড হয়েছিল। সেই কাল্পনিক কাণ্ডের জন্য ইংরেজ পণ্ডিত ম্যাকলে নবাব সিরাজ উদ্দৌলাকে গদ্যে গদ্যে মাত্রা ও ছন্দের তাল বিসর্জ্জন দিয়েও যাকে 'কাঁচা খিস্তি' বলে তাই করেছেন। এবারে ম্যাকলের এই পুস্তকখানির যখন আবার সংস্করণ হবে তখন যেন নবাবের ওপর গালি-গালাজটা বাদ দেওয়া হয়; তা না হোলে ছন্দের ভুলটা থেকেই যাবে। মোপলা বন্দীদের হত্যা কাণ্ডের জন্য যদি একমাত্র সার্জ্জেণ্ট এণ্ডরুজই দায়ী হয়, তা হোলে কলকাতার অন্ধকূপ হত্যার জন্য (যদি তা হোয়ে থাকে) সেই

ঘরে ইংরেজ বন্দীদের যে পুরেছিল সে ছাড়া অন্য কেউ দায়ী হোতে পারে না।

ভারত গবর্মেণ্ট প্রকাশ করেছেন যে, যে গাড়ীতে এই কাণ্ড হয়েছিল—সার্জ্জেণ্ট এণ্ডরুজ খালি সেটি থেকে কোনো সুযোগে বন্দী পালাবার উপায় নেই এইটে দেখেই নিশ্চন্ত হয়েছিল। ঐ গাড়ী মানুষের ব্যবহার্য্য কিনা সেটাও তার দেখা উচিত ছিল। অবশ্য ভারত গবর্মেণ্ট এই কথা বলে খুব উদারতা দেখিয়েছেন। উদারতার খাতিরে একথাও বলা চলে যে, যে লোকটি ইংরেজ বন্দীদের অন্ধকূপে ঢুকিয়েছিল তার কেবল বন্দী পালাবার পথ নেই এইটুকু দেখেই নিশ্চিন্ত হওয়াটা উচিত হয়-নি, অতগুলো লোককে একটা ঘরে পুরলে তারা বাঁচবে কিনা সেটাও তার বিবেচনা করা উচিত ছিল। কিন্তু যাই হোক যার দোষেই বন্দীরা মারা যাক না কেন, মালবারে এবার গবর্মেণ্টের খরচায় একটা মনুমেণ্ট তৈরি কোরে দিতে হচ্ছে, নইলে লালদীঘির অন্ধকূপের মনুমেণ্টটা আর শোভা পায় না।

পরলোকে মতিলাল

অমৃতবাজারের মতি ঘোষ মারা গিয়েছেন। মতিবাবু বহুদিন থেকেই শয্যাশায়ী হোয়ে কষ্ট পাচ্ছিলেন, মৃত্যু এসে তাঁর সমস্ত যন্ত্রণা লাঘব কোরে দিয়েছে। মতিলাল প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরে অমৃতবাজার পত্রিকার সংস্রবে ছিলেন এবং এই পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি কায়মনবাক্যে অমৃতবাজার পত্রিকা ও দেশের সেবা কোরে এসেছেন। এজন্য তাঁকে বহুবার আদালতে যেতে হয়েছে কিন্তু বরাবরই তিনি সেখানে নির্ভীকতার ও স্পষ্টবাদিতার পরিচয় দিয়ে এসেছেন। মতিবাবুর জীবনের কথা মনে করতে গেলে অনেক কথা, মনে পড়ে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও "বেঙ্গলীর" কথা, মনে পড়ে, স্বর্গীয় কালী প্রসন্ন কাব্যবিশারদের এবং আরও অনেকের ও অনেক ঘটনার কথা। তার জীবনের সঙ্গে বাংলা দেশের ও ভারতবর্ষের এই পঞ্চাশ বছরের সমস্ত রাজনীতিক আন্দোলনের কথাও মনে পড়ে। দেশের মঙ্গলের সঙ্গে তিনি নিজের মঙ্গলকে কখনো জড়িয়ে ফেলেন নি। তাঁর পরিচালিত পত্রিকাকে ছাপিয়ে তিনি নিজে কখনো বড় হোতে চান-নি। তাই তাঁর সহযোগীরা আজকে কেউ স্যর কেউ বা মন্ত্রী কিন্তু তিনি যে মতি ঘোষ সেই মতি ঘোষই থেকে গেলেন। অমৃতবাজার পত্রিকা ছিল তাঁর প্রাণ, তাই সে পত্রিকা আজ মাদ্রাজী মাড়োয়ারীর হাতে চলে যায় নি। কাঠের টাইপ দিয়ে একদিন যে পত্রিকা ছাপা হয়েছিল সেই পত্রিকার জন্য আজ রোটারী মেশিনের ফরমাস দেওয়া হয়েছে। মতিলাল ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম যুগের একজন নেতা ছিলেন। এ যুগে নেতাদের মধ্যে অনেকেই কালের প্রভাবে দেশবাসীর অন্তর থেকে দূরে চলে গিয়েছেন কিন্তু তিনি আমরণ দেশের প্রতিনিধি ছিলেন। মৃত্যুর সময়ে তাঁর ৭৫ বৎসর বয়স হয়েছিল। এই দীর্ঘকালের অধিকাংশ সময়ই তিনি দেশের সেবায় কাটিয়ে গিয়েছেন। এই সেবা করতে গিয়ে তিনি নিন্দিতও হয়েছেন প্রশংসাও পেয়েছেন—কিন্তু আজ তিনি নিন্দা ও প্রশংসার অনেক দূরে। আমরা এই পরলোকগত মহান আত্মার তর্পণ করি, স্তুতি করি আর কামনা করি যে যুগে যুগে যেন তার মতন লোক আমাদের দেশে জন্ম গ্রহণ কোরে দেশকে উন্নতির পথে চালিত করে।

১ম বর্ষ] ১৩২৯ [৭ম সংখ্যা

সচিত্র পাক্ষিক পত্র

কার্য্যালয়	প্রতিসংখ্যা	বার্ষিক মূল্য ২৶০
২০৮।২এক্ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	এক আনা	দুই টাকা দুই আনা।

বৈঠকের নিয়মাবলী

বৈঠকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ দুই টাকা দুই আনা; ভিঃ পিঃ মাশুল স্বতন্ত্র। প্রতি সংখ্যার জন্য এক আনা। নমুনারও মূল্য লাগে। যে কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া চলে। মূল্য সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়।

রিপ্লাইকার্ড কিংবা টিকিট না পাঠাইলে কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রবন্ধাদি বৈঠকের দুই পৃষ্ঠা বড় জোর আড়াই পৃষ্ঠা অপেক্ষা দীর্ঘ না হয়। টিকিট পাঠাইলে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে কিনা তাহা জানানো হয়। মনোনীত অথবা অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত পাঠান হয় না।

যদি কোন গ্রাহক বৈঠক না পান তো ৭ দিনের মধ্যে আমাদের খবর দেবেন। নচেৎ অপ্রাপ্ত সংখ্যা দামদিয়া লইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন

মলাটের চারের পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যা—৮৲

অন্যান্য পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যা—৬৲

অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—৩॥০

কলমরে প্রতি ইঞ্চি একবৎসরের চুক্তিতে প্রতিসংখ্যা—১৲

কলমের প্রতি ইঞ্চি প্রতিসংখ্যা—২৲

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়

ম্যানেজার বৈঠক

২০৮।২ এফ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এজেন্ট :—শ্রীপরেশনাথ মিত্র

১৩২নং বাগমারি রোড, কলিকাতা

১ম বর্ষ] ১৫ই আশ্বিন, ১৩২৯ [৭ম সংখ্যা

গাল গল্প

—সুশীলাকে ছেড়ে তুমি আর একদণ্ডও বাড়ীতে থাকতে পারছো না! সত্যি?

—তোর গা ছুঁয়ে বলছি! এই দু-দিন হোলো সে বাপের বাড়ী গেছে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যেন দু-বছর তাকে দেখি-নি!

—তুমিই তাকে যথার্থ ভালবাস দেখ্‌ছি! তার আপনার বাপ-মা তাকে ছেড়ে এক বছর নিশ্চিন্ত ছিল, কিন্তু তার দুটো দিনের চোখের আড়ালও তোমার সহ্য হচ্ছেনা!

—

—তুমি আমাদের সমিতির সভাপতি হবে?

—না ভাই, আমায় একটা ছোটখাটো কাজ কিছু দিও।

—তবে সহকারী সভাপতি কিম্বা সম্পাদক হও।

—ওরে বাপ্‌রে! ওসব আমার দ্বারা হবে না!

—ব্যস্! তবে তুমি কি হোতে চাও বল?

—আমি!—আচ্ছা আমাকে তোমাদের সমিতির কোষাধ্যক্ষ কোরে দিও। টাকা-কড়ির হিসেবটা আমি রাখ্‌তে পার্‌বো!

—

ম্যাজিষ্ট্রেট। (আসামীকে) তুমি রাস্তায় মাতলামী করেছিলে?

আসামী। আজ্ঞে না হুজুর, আমি মদ খাই-নি।

পাহারোলা। মিথ্যে কথা হুজুর, ও যদি মদ না খেতো তা হোলে নিশ্চয় বুঝ্‌তে পারতো যে, রাস্তায় মাতলামী করা উচিত নয়।

—

—হ্যাঁ দিদি, শৈলর নাকি সাত মাসে ছেলে হয়েছে?

—তার আর আশ্চর্য্য কি? সাত মাসে

ছেলে তো অমন ঢের হয়। আমার বোন্ বিনীর এবার পাঁচ মাস অন্তর এক একটি ছেলে হয়েছে যে!

—দূর্ তা বুঝি আবার কখন হয়?

—আ মর্! বিশ্বাস কর্‌লিনি বুঝি! ওরে সত্যি হয়েছে গো! বিনির যে এবার যমজ ছেলে হয়েছে!

—আর্ট একজিবিশনে এবার কি ছবি দিচ্ছ?

—"পানোন্মত্ত!"

—সে কিহে? আর কিছু না এঁকে শেষে এক মাতালের মাত্‌লামো এঁকেছো!

—আরে না না —"পানোন্মত্ত" ছবিখানায় মাতালের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।

—তবে?

—সে ছবিটা হচ্ছে কি জানো?—ওই যে ফুটপাথের ধারে ঘোড়ার জল খাবার এক একটা লম্বা টব বসানো থাকে না? সেই একটা জলের টব না দেখে ছুটো ভাড়াটে গাড়ীর ঘোড়া সোয়ারী সমেত গাড়ী নিয়ে ছুটেছে সেই দিকে জল খাবার জন্যে। কোচম্যান চাবুক হাঁক্‌ড়ে,রাশ টেনে কিছুতেই তাদের বশে আনতে পাচ্ছে না!

—ওঃ! তাই বলো!

পুজোর ছুটিতে সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ী রিজার্ভ কোরে কলকাতার সেরা গুটিকতক বাইজী নিয়ে নতুন কাপ্তেন ইয়ার বক্সীর সঙ্গে কার্‌মাটারে বেড়াতে যাচ্ছেন। রাত্রে গাড়ীতেই বোতল গ্লাসের সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান চলছিল। হঠাৎ মাঝ-রাস্তায় চলন্ত গাড়ীর দরজা খুলে দু-বেটা ষণ্ডামার্ক ছোরা হাতে গাড়ীর ভিতর ঢুক্‌ল! গান বাজনায় দফা গয়া! সবার মুখ শুকিয়ে আম্‌শী!

যে লোকটার হাতে বড় ছোরা ছিল সে বল্লে—খবরদার কেউ চেঁচালেই খুন করবো! তারপর তার সহকারীর দিকে ফিরে বল্লে—খালি মেয়েদের গায়ের গয়নাগুলো নিয়ে নেবে যা, বাবুদের কিছু বলিস্‌-নি!

বাবুদের ধড়ে প্রাণ এল! কিন্তু সহকারী দস্যু বল্লে—না সর্দ্দার মেয়েদের গায়ে হাত দিয়ে কাজ নেই, বরং বাবুদের কাছে নগদ যা আছে নিয়ে সরে পড়ি এস!

এই কথা শুনে বাবুর ইয়ারদের মধ্যে একজন আর থাক্‌তে পার্‌লে না, সে তাড়াতাড়ি বলে ফেল্লে—বাবা সর্দ্দার যা বল্‌ছেন তাই কর না মাণিক্,তোমায় তো উনি আর মোড়লী করবার জন্যে সঙ্গে আনেন নি!

আর একজন বলে উঠ্‌ল—এদিকে নজর কেন চাঁদ! আমাদের ট্যাঁক তো গড়ের মাঠ!

কি একটা কাজে সেদিন কলকাতায় এক বড় লোকের বাড়ীতে সহরের যত নামজাদা

লোক নেমন্তন্ন খেতে এসেছে। মজলিস একেবারে জম-জমাট! সেই মজলিশে হাইকোর্টের একজন খুব বড় ব্যারিষ্টার কি কোরে আদালতে তাঁর প্রথম পসার জমেছিল তার গল্প করছিলেন!—দেখ বছরখানেক শুধু হাতে আদালতে যাওয়া আসা করবার পর জীবনে প্রথম যেদিন একটি মামলা পেলুম—এমনি অদৃষ্ট দেখি যে, মক্কেলটী একেবারে পাকা জোচ্চোর! কি একটা জাল-জালিয়াতি ব্যাপারে ফেঁসে গিয়ে সেশনে চালান হয়েছেন। ভদ্রলোকের ছেলে, কলকাতার নামজাদা ঘরের ছেলে—কি করি কোনও রকমে সাজিয়ে গুজিয়ে লম্বা বক্তৃতা দিয়ে—তাঁকে অনেক কষ্টে জেল থেকে বাঁচিয়ে আনি। সেই থেকে ক্রিমিন্যাল প্র্যাক্‌টীস্ আমার একেবারে একচেটে হোয়ে গেল!

এমন সময় রাস্তা কাঁপিয়ে মস্ত এক জুড়ি এসে সেই বাড়ীর ফটকে দাঁড়ালো। একজন হোম্‌রা-চোমরা কলকাতার নামজাদা বড় লোক গাড়ী থেকে নেমে ভেতরে ঢুক্‌লেন। বাড়ীর কর্ত্তা এগিয়ে এসে তাঁকে খুব খাতির যত্ন কোরে মজলিশে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন। মজলিশের সবাই সমাদরে তাকে অভ্যর্থনা করলেন। যে বড় ব্যারিষ্টার তাঁর পসারের গল্প করছিলেন গৃহস্বামী তাঁর সঙ্গে এঁর আলাপ পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে যেমন বলেছেন যে, ইনি আমাদের হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার মিঃ—নবাগত ভদ্রলোকটী একগাল হাসতে হাসতে বল্লে—আরে ওঁর সঙ্গে আর আমার পরিচয় করিয়ে দিতে হবেনা; ওঁকে খুব জানি! হাইকোর্টে ওঁকে দাঁড়িয়ে করিয়ে দিলে কে? সে তো আমি—আমিই হচ্ছি ওঁর প্রথম মক্কেল!

মজলিশে হঠাৎ একটা প্রচণ্ড হাসির তাণ্ডব রোল উঠে গেল!

—

(২)

জামাই একদিন মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় বাড়ী ফিরছে। গলির ভেতর ঢুকেই দেখে ওধার থেকে শ্বশুর মশাই আসছেন! এরকম অবস্থায় তাঁর সামনে পড়াটা বড়ই লজ্জার ব্যাপার মনে কোরে জামাই গলির একধারে ঝুপ কোরে বসে পড়ে ঘাড় হেঁট কোরে রাস্তার ওপোর হাত বুলোতে সুরু কোরে দিলে, মনে মনে ঠিক করলে যে শ্বশুর মশাই যদি দেখতে না পান তো ভালই, আর যদি দেখতে পান তা হোলে বল্‌বো যে, বাড়ীর জন্য ছুঁচ কিনে নিয়ে যাচ্ছিলুম এখানে হঠাৎ হাত থেকে পড়ে গেল তাই ছুঁচ কটা খুঁজছি! ইতিমধ্যে শ্বশুরমশাই তার কাছে এসে পড়লেন এবং জামাইকে চিন্‌তে পেরে জিজ্ঞেস করলেন,—কি বাবাজী! এখানে বসে কি কর্‌ছো? জামাই তখন নেশার ঝোঁকে যা বলবে ঠিক কোরে রেখেছিল সে সব একেবারে ভুলে গিয়ে বলে ফেল্লে—[illegible]! এই ছুঁচো [illegible]

খাচ্ছি! তার কথার টানও তখন মাতালের মত এড়িয়ে এসেছে! শ্বশুর অবস্থা বুঝে আর দ্বিরুক্তি না কোরে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

— —

যদুর সহর বর্ণনা

পূজোর বাজারে এক মহাজনের সঙ্গে তাঁর এক বিশ্বাসী চাকর একবার কলকাতায় এসেছিল। চাকরের নাম যদু, এর আগে সে জীবনে কখনো কোনো সহর দেখে-নি। মহাজন বড় বাজারের এক হোটেলে উঠেছিলেন, চাকরকে বলে দিয়েছিলেন যে, কলকাতার সহর, বড় ভারি সহর। একা কখনও পথে বার হোস্‌নে। যখনই যাবি কাউকে সঙ্গে নে যাবি। যদু যে-আজ্ঞে বলে ক্রমাগত একটা লোক খুঁজতে লাগল যার সঙ্গে সহর দেখতে যাবার সুবিধে হোতে, পারে। কিন্তু সে বেচারি যাকেই ধরে সেই বলে—আমার কাজ আছে আর কাউকে ধর। শেষে হোটেলের বামুন ঠাকুরকে চার আনা পয়সা কবলে যদু তার সঙ্গে সহর দেখ্‌তে বেরুলো। সমস্তদিন টো টো কোরে কলকাতার সহর ঘুরে যদু যখন ফিরে এল বামুন ঠাকুর তার মজুরী চার আনা চাইতে যদু খুসি হোয়ে তাড়াতাড়ি তার কোমরে বাঁধা গেঁজের ভেতর থেকে ঠাকুরকে চার আনা পয়সা বার কোরে দিতে গিয়ে একেবারে আঁৎকে উঠ্‌লো!—ওগো বাবু, আমার—সর্ব্বনাশ হয়েছে! আমার সর্ব্বস্ব গেছে! যদুর চিৎকারে হোটেলের মেলা লোক জন জড় হোয়ে গেল,—কি হোয়েছে, কি হোয়েছে জিজ্ঞেস কোরে জানা গেল যে, তার গেঁজেতে যা-কিছু টাকাকড়ি ছিল সব চুরি গেছে! কোমর থেকে তার গেঁজে খুলে নিয়ে দেখা গেল যে, গেঁজেটি একেবারে লম্বালম্বী কোরে কাটা—একটি আধলাও তার ভেতর নেই। বোঝা গেল যে, বড় বাজারের পকেট-কাটাদের কাজ; যদু কিন্তু প্রবল ভাবে ঘাড় নেড়ে বল্লে—তা হোতেই পারেনা! পকেট-কাটা শালারা আমার গেঁজের সন্ধান পাবে কি কোরে? এ নিশ্চয় কোনও অপদেবতার কাজ! শুনিছি সহরে এলে টাকা পয়সা উড়ে যায়। এ টাকা আমার শনিতে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। আমি আর একদণ্ডও এ ভুতুড়ে কলকাতার সহরে থাক্‌বো না! এই বলে সে একেবারে হাউ হাউ কোরে কাঁদতে লাগল! মহাজন তখন কোথায় বেরিয়েছিলেন, তিনি ফিরে এসে সব শুনে যদুকে তিরস্কার করলেন যে টাকা নিয়ে পথে বেরিয়েছিলি কেন? তারপর তাকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তার যে কটা টাকা চুরি গেছে তিনি দেবেন বলে ভুলিয়ে জিজ্ঞেস্ করলেন—সহরে কি, কি নতুন জিনিস দেখলি বল!

যদু টাকা কটা মনিবের কাছ থেকে পাবে শুনে আশ্বস্ত হোয়ে বল্লে—কর্ত্তা!—কলকাতার

সহরটা বানিয়েছে বোধকরি সেই লোকটাই কি বলেন ?

—কোন্ লোকটারে ?

—সেই যে গো, কটা চাম্ড়া, পা-জামা পরা, গোঁফ দাড়ী ওঠেনি, খাঁদা নাক ক্ষুদে ক্ষুদে চো । সেই যে আসবার দিন যাকে দেখলাম কাঠ কেটে হাব্ড়ার পুল মেরামত কচ্ছে ! সেধারে গে দেখি, সেইটেই জাহাজ বানাচ্ছে আবার ওধারে গে দেখি, সেটাই জুতো বানাচ্ছে ! আবার সেধারে দেখি সেটা আংরেজের বাড়ীর দোর জানালা বানাচ্ছে !

মহাজনের বুঝতে বাকী রইল না যে, তাঁর ভৃত্য যদুনাথ বিভিন্ন চীনেম্যানকে চিন্তে না পেরে তাদের সকলকেই একই লোক মনে কোরে তাকেই কলকাতা সহরের বিশ্বকর্ম্মা ঠাউরেছে। তিনি হাস্তে হাস্তে জিজ্ঞেস করলেন—তারপর ? আর কি দেখলি বল্ ?

যদু হঠাৎ উৎসাহিত হোয়ে উঠে বল্লে—হ্যাঁ দেখেন কর্ত্তা, ঐ যে কি বলে গো—তোমার গিয়ে—আহা হ্যাঁ, ঐ কান বালিশ আর হরি মেনের রাস্তার মোড়ের বাগে লোহার গারদে ঘেরা এক পাথরের ঢিবির ওপোর চোগা চাপকান পরা শাম্লা মাথায় এক উকীল বাবু খাড়া হোয়ে আছেন দেখলাম—ওনার কি কোনও কাজ কর্ম্ম নাই ? চৌপোর দিনটা দাঁড়িয়ে কেবল রাস্তাই চৌকী দিচ্ছেন ? যাবার বেলাও দেখি যেমনি খাড়া হোয়ে আছেন, আস্বার বেলাও দেখি ঠিক তেমনিই খাড়া হোয়ে রয়েছেন ! তিনি নেমে আসলে আমার ইচ্ছেটা ছিল একবার ঢিবীটার পরে উঠে দেখবার লেগে। ওটার ওপর দাঁড়ালে সহরটা কেমন দেখতে হয় নজর করব—তা সে একালঘেঁড়ে নিকাম্মা বাবুর লেগে কি তা হবার যো আছে ? কিছুতে সারাদিনের মধ্যে একবার সেথান থেকে নড়্ল না !

স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পালের মর্ম্মর-মূর্ত্তির বিরুদ্ধে যদুর এই অভিযোগ শুনে হাস্তে হাস্তে মহাজন জিজ্ঞেস্ করলেন—তারপর ? আর কি নতুন রকম সব দেখলি বল্—

যদু মাথা চুল্কে বল্লে—ওইটে কর্ত্তা ঠিক ধরতে পার্লেম না—ওই যে যেটাকে বামুন ঠাকুর মটর-কড়াই বল্লেন ! সেটা না গাড়ী না পাল্কী, না রেল, অথচ দেখেন ঠিক রেলের মতই আওয়াজ কিন্তু চলে লাইনের বাইরে দিয়েই আর ধোঁয়া ছাড়ে পেছন থেকে ! হ্যাঁ একটা কল বটে ! আংরেজ ওটা বানিয়েছে খুব বুদ্ধি কোরে—আমি রাস্তায় শুয়ে পড়ে হেঁট বাগে—কত ঠাওর কোরে দেখলুম, কিন্তু পারলেম না কিছু ঠিকানা করতে ! ঘোড়াটারে যে কোথায় লুকিয়ে থুয়েছে তার কোনও হদিস পেলাম না !

যদুর মহাজন মনিব একেবারে হো হো কোরে হেসে লুটিয়ে পড়তে লাগল ! যদুও

তাঁর দেখাদেখি খুব হাসছিল হঠাৎ সে হাসিটা চতুর্গুণ চড়িয়ে দিয়ে বলে উঠল। আজ ট্রামারে চড়িয়েছিলুম কর্ত্তা। ও ট্রামারের চালাকী আমি সব আজ ধরে ফেলেছি, বুঝলেন! ওটার চারগণ্ডা চাকা থাক্‌লি কি হবে, ওটা গাড়ি না! ওটারে যে গাড়ী বলে যে মুখ্‌খু!

মহাজন বল্লেন—ওটারে তুমি কি ঠাউরেছে যদু?

যদু চোক দুটো কপালে তুলে বল্লে—শোনেন কর্ত্তা যদুরে ফাঁকি দেওয়া বড় সোজা না। দু-দিন ওটারে বেশ কোরে লক্ষ্য কোরে কোরে তিন দিনের দিন ওটার জাতের ঠিকানা করিছি। ওটা গাড়ী না ওটা নৌকো!—

—নৌকো ডাঙায় চলে যদু?

—কেন চলবে না কর্ত্তা! পদ্ম যদি ডাঙায় ফুট্‌তি পারে নৌকো কি আর চল্‌তে পারে না? কলিকাতার সহরে ও সবই ঘট্‌তে পারে।

—পদ্ম ডাঙায় ফুটতে দেখলি কোথা?

কেন সেই হোথা শিবপুরকে, গঙ্গা পারে কোম্পানী যে ছায়ের বোটকানাল বাগান বানিয়েছে তার মধ্যে মেলা স্থলপদ্ম ফুটিয়েছে দেখলাম! ও ট্রামারটাকে আপনি 'স্থল-ডিঙা' কইতে পারো কর্ত্তা, তবে ওটার দোষের মধ্যে দেখলাম হালে-পালে আদপেই চলে না, মাস্তুলে দড়ী বেঁধে গুণ টেনে নিয়ে যায়! কিন্তু মাস্তুলটো আবার দেখি উল্টে বাগে হেলা! কলকাতার সহর কিনা, সবই বিপরীত!

মহাজনের হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবার যোগাড়! তিনি আর সাহস কোরে যদুকে কিছু জিজ্ঞেস্ করতে পারলেন না! যদু মনে করলে, কর্ত্তা বুঝি তার কথা বিশ্বাস করলে না, তাই হেঁসে উড়িয়ে দিচ্ছেন! যদু গম্ভীরভাবে বল্লে কথাটা হেসে উড়াবেন না কর্ত্তা যা বলছি যথার্থ কথা। শোনেন তবে দুঃখের কথা কই, আপনি রাগ্‌বে বলে এতদিন বলি নাই, দেখেন,—কল্‌কাতার কলে নেয়ে সুখ পাইনি কর্ত্তা! আমরা চাষাভুষো গেঁয়ো লোক পুকুরে একটা ডুব না দিলে স্নান করিছি কিনা ঠাওর হয় না; তাই সেদিন সেই সেথারে একটা পুষ্করিণীর সন্ধান পেয়ে মাথায় তেল দিয়ে একটা ডুব দিতে গেছলাম! এক সেপাই না জমাদার মাথায় পকড়, হাতে ছপটি, দৌড়ে এসে আমাকে নাইতে মানা করলে! পুকুরডা কোন্ বাবুর জিজ্ঞেস্ ক'য় সে বল্লে—মন্‌সা পালের। তা ছাই আমি কি তখন অত জানি যে, এ মনসা পাল আমাদের মাঝের গাঁয়ের জমীদার সে মন্‌সা পাল নয়। আমি মনে কর্‌লুম তেনারাই বুঝি কল্‌কাতায় স্নানের সুবিধার জন্যে এই পুকুর প্রতিষ্ঠা করেছেন; তাছাড়া চার কোণা পুকুরটোর নাম শুনলুম যখন গোলদিঘী! তখন আমার একেবারে স্থির বিশ্বাস হোলো যে, এ সেই

আমাদের মাঝের গাঁয়ের মনসা পালের না হোয়ে আর যাবে কোথা ?—কেন না মনসা পালের মায়েরই নাম ছিল যে 'গোলাপা বেওয়া' কিনা। আমি আন্দাজ করলুম তবে বুঝি মায়ের নামেই মনসা পাল এখানে দিঘী কাটিয়েছে ! আমি তখন জমাদারকে এক ধমকানী দিয়ে পুকুরে নেমে গেলাম, বললাম বাবুকে বলিস—'ন'পাড়ার যদু সামন্ত, বিশ্বম্ভর মহাজনের পাইক তাঁর পুকুরে স্নান কোরে গেছে ! তোর বাবু আমাদের চেনে। কিন্তু জমাদারটা বড়ই অসভ্য, একটা ডুব মারতে না মারতে আমার চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে তুলে দু-তিন ঘা ছপটি মেরে পুলিশে ধরিয়ে দিলে !

থানায় গিয়ে দারোগা বাবুকে যখন কাঁদতে কাঁদতে সব বুঝিয়ে বল্লুম, তখন তিনি আমার ভুল দেখিয়ে দিলেন ! তখন বুঝলুম যে, এ আমাদের মাঝের গাঁয়ের জমীদার মনসা পালের মায়ের নামের দিঘী নয়, এ মনসা পাল হচ্ছে তোমার গিয়ে এই কলকাতারই কর্পূর সেনের কে হয়। তাকে চেন কি কর্ত্তা ? আচ্ছা কলকাতার এই কর্পূর সেন লোকটা কি পাগল ? কাউকে নাইতে দেবে না তো পুকুর কাটাবার কি প্রিয়জন ছিল ? আমি বলি কি ভাত যদি খাবিইনে তবে রাঁধলি কেন বাপু ?—

বিশ্বম্ভর মহাজনের পেটে খিল ধরে তখন অবস্থা সঙ্গীন হোয়ে উঠেছে।

রাম ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার হরিধন হঠাৎ একটা চাক্‌রী পেয়ে কম্পাউণ্ডারী ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।

দিন কতক পরে রাম ডাক্তার একদিন ডাক্তারখানায় এসে দেখে হরিধন ফিরে এসে আবার কম্পাউণ্ডারী করছে ! তিনি জিজ্ঞেস করলেন—হরি, চাক্‌রী ছেড়ে আবার ডাক্তারখানায় এলি যে !

হরিধন গম্ভীর ভাবে বল্লে, ও আমার স্যুট করবে না ! যে বড়-বাবুটি আছেন মুখে যেন তার গালাগালি একেবারে ইনজেক্ট (inject) কোরে দেওয়া হয়েছে। তার উপর ভয়ানক রাগী। কথায় কথায় টেম্পারেচার (temperature) লুজ (loose) করছে মশাই !

বেগুণ পোড়া

(ছক্‌-মার্কা বাক্তেলা)

তারা তিন ভাই, বেশ সুখে ঘরকন্না করছিল। কিন্তু চিরদিন তো কারুর সমান যায় না ; হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে বড় ভায়ের স্ত্রীটি মারা গেল।

পাড়ার পাঁচজনে বল্লে,—দাদা একটা বে কর !

দাদা বল্লেন, না ভাই, এ বুড়ো বয়সে আর বন্ধনে দরকার নেই। ভাই-ভাজেরা রয়েছে, অসময়ে দেখবে অখন। আমার আর অভাব কি ?

(২)

তারপর অনেক দিন কেটে গেল। স্ত্রীর অভাব যে কতটা দুঃখের ক্রমে সেটা বুঝতে দাদার আর বাকী রইল না, কিন্তু তবুও ছেলেমেয়ে দুটোর মুখ চেয়ে দাদা আর বিবাহ করতে পারলেন না। তিনি নিজেই একাধারে তাদের বাপ মার কাজ করতে লাগলেন। এই স্নেহপরায়ণ বাপটিকে পেয়ে মাতৃহারা শিশু দুটী ক্রমে মায়ের অভাব ভুলে গেল।

(৩)

সেবার শীতকালে একদিন দাদার একটু বেগুণ পোড়া খাবার ভারি ইচ্ছে হোলো। সকালে উঠে তিনি ভাজেদের উদ্দেশে বল্লেন—বৌমারা আজ আমায় কেউ একটু বেগুণ পোড়া কোরে দিও তো মা!

তারা ঘোমটার ভেতর থেকে ঘাড় নেড়ে জানালে, কোরে দেবে। এমন সময় মেজ ভাই বাজার থেকে নতুন আলু, ভেট্‌কী মাছ আর মুলো এনে হাজির কোরে বল্লে—ওগো! আজ একটু ভেট্‌কী মাছের ঘণ্ট কোরোতো গা!

খানিক পরে ছোট ভাই ফুলকপি আর গল্‌দা চিংড়ী হাতে কোরে বাড়ী এসে বল্লে—ওগো! আজ ফুলকপি দিয়ে গল্‌দা চিংড়ীর কালিয়া বানিও তো একটু!

(৪)

খেতে বসে দাদা দেখলেন, ভেট্‌কী মাছের ঘণ্ট আর গল্‌দা চিংড়ী দিয়ে ফুলকপির কালিয়া ঠিক হয়েছে বটে কিন্তু তাঁর জন্যে বেগুণ পোড়াটুকু আর হোয়ে ওঠে-নি!

তার পরদিন তিনি আবার বলে দিলেন—আজ যেন বেগুণ পোড়াটা করতে ভুলো না মা!

মেজ ভাই বল্লে—ও-বেলা আজ একটু ডিমের মাম্‌লেট্‌ কোরোতো গা।

ছোট ভাই বল্লে—সকালে যে কই মাছ এনেছি, ওবেলা সেই পয়জারে কই দিয়ে একটু মালাই কারী কোরে দিও গো।

(৫)

ডিমের মাম্‌লেট এবং পয়জারে-কই দিয়ে মালাই কারী ঠিক যথাসময়ে তৈরী হোলো কিন্তু দাদার বেগুণ পোড়া আর বরাতে জুটলো না! পৌষ গেল, মাঘও যায় যায়! ভায়েরা যখন যা খেতে চাচ্চে ঠিক তৈরী পাচ্ছে, বড়দার আর বেগুণ পোড়াটুকু কিন্তু এ পর্য্যন্ত আর হোয়ে উঠল না! দাদা অভিমান কোরে বেগুণ পোড়ার আর নামও করেন না!

(৬)

মাঘ মাসও চলে গেল। হঠাৎ ফাল্গুন মাসের গোড়াতেই দাদা কাউকে কিছু না বলে চুপি চুপি কোথা থেকে বে কোরে এক ডাগর বউ নিয়ে এসে হাজির! ভায়েরা সব অবাক হোয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল! দাদা কোনও কথা কন না,

দেখে শুনে তারা জিজ্ঞেসা করলে—ব্যাপার কি দাদা! এতদিন বে করবে না বলে এসে তারপর হঠাৎ একেবারে এ কি?

দাদা, গম্ভীরভাবে বল্লেন—কি করব? কন্যাদায়ে ঠেকেছিল ভদ্রলোক, পেড়াপিড়ী করে ধর্‌লে তাই আর এড়াতে পার্‌লুম না।

(৭)

দিনকতক পরে দাদা একজোড়া ভাল বেগুণ এনে বলে—ওগো নতুন বৌ! আজ তোমার বুড়োকে একটু বেগুণ পোড়া কোরে খাইয়ো তো!

খাবার সময় দাদার পাতে আজ আদা বাটা, সরষে বাটা, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে তোফা বেগুণ পোড়া এসে হাজির!

দাদা তখন ভায়েদের ডেকে বল্লেন—দেখছিস, মেজো সেজো, বে' কি সাধে আমায় কর্‌তে হোলো! আজ দু-মাস ধরে একটু বেগুণ পোড়া খেতে চেয়ে পাই-নি! স্ত্রী না হোলে ভাল মন্দ রেঁধে খাওয়াবে কে?

ছুটো খবর

তিরিশ কোটী ভারতবাসী বছরে সাড়ে তিন কোটী টাকারও বেশী বিলিতী মদ খেতো! এবার ননকো-অপারেশনের গুণে তারা মোটে এককোটী তেরো লাখ টাকার মদ খেয়েছে! মন্দের ভাল!

চাল ডালের কথা ছেড়ে দাও, আমরা সুপুরী খাই বছরে এক কোটী পঞ্চান্ন লক্ষ টাকার! তবে কেবল বাঙালী নয়, ভারতের সব জাত মিলে।

মদের নেশা এই গরীব দেশে মহাত্মা গান্ধীর কৃপায় যেমন ঢের কমে গেছে; তামাক, চুরুট, সিগারেট, নস্য এসবও এবার অনেকটা নেমেছে। গেল বছর দু-কোটী ছিয়ানব্বই লাখ টাকার এই খুচরো নেশা আমরা বিদেশ থেকে আমদানী করেছিলেম। এবার মোটে এক কোটী পঁয়ষট্টি লাখ টাকার এই সব মাল আমদানী হয়েছিল। তা বলে বাংলা দেশের ছেলেরা যে সিগারেট ছেড়েছে এ যেন কেউ মনে কর্‌বেন না। তারা কেউ কেউ সখ কোরে খদ্দর পরছে বটে কিন্তু সিগারেট ঠিক ফুঁক্‌ছে!

গুড়ের দেশে, আকের ক্ষেতের পাশে, তাল খেজুরের মিষ্টি রসে ডুবে থেকেও আমরা বিলিতী চিনি খেয়েছি এক বছরে সাতাশ কোটী পঞ্চাশ লক্ষ টাকার। এই গুণেই বোধহয় এদেশের লোকের মুখে মিষ্টি কথার মাত্রা এত বেশী!

কলিকাতা কর্পোরেশন এবার "কুকুর-কর" আদায় কর্‌বেন বলে ভয় দেখিয়েছেন। কুকুর পিছু পাঁচ টাকা কোরে ট্যাক্স ধরা হবে। এটা বাঙালীদের চেয়ে শ্বেতাঙ্গদেরই

লাগবে বেশী, কেন না কুকুর-প্রীতিটা চৌরঙ্গীওয়ালাদেরই একচেটে। আর অধিকাংশ বাঙালী যে কুকুর পোষে তার দামই পাঁচ টাকা নয়।

আগামী অক্টোবর মাস থেকে থিয়েটার বায়োস্কো প প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টিকিট বেচার দরুণ টেক্স আদায় করা হবে! তবে সুখের বিষয় এই যে, এতে গরীব মারা যাবে না। কারণ আট আনার চেয়ে বেশী দামের সিটে যারা বস্‌বেন টেক্সটা তাঁদেরই পকেট থেকে দিতে হবে।

গড়ের মাঠের 'মনস্থুন রেস্' আর ব্যারাক পুরের ঘোড়দৌড় থেকে এত টাকা এবার গবর্মেণ্টের আয় হয়েচে যে, আশা করা যাচ্ছে কেবল এই শীতকালের ঘোড়দৌড়ের আয় থেকেই আমোদ-প্রমোদ টেক্স বাবদ মোট যতটাকা আদায় হওয়া সম্ভব বলে বাজেটে ধরা হয়েছে তার চেয়ে বেশী উঠে আস্‌বে! তা যদি হয়, তা হোলে থিয়েটার বায়োস্কোপে লোককে উপস্থিত রেহাই দেওয়াই উচিত। কিম্বা বালিগঞ্জ, হাওড়া, বরানগর প্রভৃতি জায়গায় নতুন রেস কোর্স খুলে এই নেশা আর যে কটা লোকের এখনও শিখতে বাকি আছে তাদের ধরিয়ে দেওয়া হোক।

কলিকাতার সহরে প্রতি সপ্তাহে সদ্যজাত শিশুর মধ্যে হাজার-করা পাঁচশো ছেলের বেশী মারা পড়ছে!—এইভাবে আর কিছুদিন চললে বাঙালীর বংশ লোপ হোতে আর বেশি বিলম্ব হবে না।

স্পষ্ট কথা

পুলিশের খরচ বছর বছর বেড়েই চলেছে কিন্তু চুরি ডাকাতি কি রাহাজানী একটুও কমেছে বলে শোনা যাচ্ছে না। কলিকাতার সহরে গ্যাসের আলো জ্বালা, পাহারাওয়ালা খাড়া করা বড় বড় রাস্তায় সন্ধ্যে রাত্রেই রাহাজানি হচ্ছে! চারিদিক থেকে গুণ্ডার অত্যাচার শুন্‌তে শুন্‌তে যেমন পুলিশের ওপর বিরক্তি হচ্ছে তেমনি আমাদের অসহায় নিরস্ত্র অবস্থার কথা স্মরণ কোরে ক্ষোভ ও লজ্জাও বড় কম হচ্ছেনা!

সেদিন হাওড়া শিবপুরের এক ভদ্রলোক সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ বড় বাজার থেকে একখানা ট্রাম ধরে শিয়ালদহ ষ্টেশনের দিকে যাচ্ছিলেন। চিৎপুর রোড পার হতেই দু-জন মুসলমান গুণ্ডা সেই গাড়ীতে উঠে দাঁড়ায়। একজন দাঁড়ায় গাড়ীর পেছনে কণ্ডাকটারের জায়গায়, আর একজন গাড়ীর ফুটবোর্ডের ওপর। ট্রামখানা শিউদাস বগলার হাঁসপাতালের কাছাকাছি আসতেই, একজন গুণ্ডা ভদ্র

লোকের গলা থেকে দামী গরদের চাদরখানা টেনে নিয়ে গাড়ী থেকে নেমে গেল! সেখানে কণ্ডাকটারও দাঁড়িয়েছিল, ভদ্রলোক চেঁচামেচি করতেই, ফুটবোর্ড থেকে দ্বিতীয় গুণ্ডাও নেমে সরে পড়ল!

এ রকম ঘটনা এই প্রথম নয়। আরও অনেকবার অনেকের শাল আলোয়ান এমনি চলন্ত ট্রাম থেকে কিম্বা ওঠা নামা করবার সময় খোয়া গেছে। অনেকেরই সহসা-অদৃশ্য নোটের তাড়া, মনিব্যাগ, ঘড়ি, ঘড়ির চেনের করুণ স্মৃতি এই রকম ট্রাম যাত্রার সঙ্গে জড়িত! কিন্তু এ পর্য্যন্ত এর কোনও প্রতিকারের ব্যবস্থা হোলো না! ট্রাম কোম্পানীও প্যাসেঞ্জারদের প্রতি তাদের কর্ত্তব্য ভুলে যেমন নিশ্চিন্ত আছে, পুলিশও তেম্‌নি সহরবাসীদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি সমান উদাসীন!

আর একটা কথা এই যে, ট্রামের কণ্ডাকটররা বিনাটিকিটের যাত্রীদের—গাড়ীতে থাক্‌তে দেয় কেন? সন্দেহজনক লোক ওঠবামাত্র তাদের কাছে টিকিট নেওয়া হয় না কেন? টিকিট কিন্‌তে অসম্মত যাত্রীদের গাড়ী থেকে নামিয়ে দেওয়া হয় না কেন?—ফুটবোর্ডে বা কণ্ডাক্‌টরের জায়গায় যাত্রীদের—দাঁড়িয়ে যেতে দেওয়া হয় কেন? এতে শুধু রাহাজানী নয়, দুর্ঘটনা আর অপঘাত মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়ানো হচ্ছে! ট্রাম কোম্পানী যদি এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকে তবে দেশের গবর্মেণ্টের উচিত কোম্পানীকে এবিষয়ে সচেতন হোয়ে উঠ্‌তে বাধ্য করা!

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা ঘাটতি হয়েছে; শিক্ষা-সচিব মাত্র আড়াই লাখ টাকা ভিক্ষা দিয়েছেন! তাও নাকি আবার কত কি সর্ত্তে! কাউন্সিল আর সেনেটে যে রশি টানাটানি চল্‌ছিল গবর্মেণ্টের যিনি প্রধান হিসাবনবীশ তিনি একরকম তার মধ্যস্থ হয়েছেন। তিনি বলেন, য়ুনিভার্সিটিকে বাঁচাতে হোলে সর্ব্বাগ্রে তাকে এই সাড়ে পাঁচ লাখ টাকার দেনাটা খাতায় জমা খরচ কোরে নিতে হবে। দেনার কারণ দেখিয়েছেন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষা বিভাগ!

বেঙ্গল-গবর্মেণ্টের আয়ের অধিকাংশ যেমন পুলিশের গর্ভে চলে যাচ্ছে আর ভারত গবর্মেণ্টের আয়ের পনেরো আনা যেমন সমর বিভাগেই ব্যয় হোয়ে যাচ্ছে; য়ুনিভার্সিটির আয়েরও সাড়ে পনোরো আনা তেমনি ঐ পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষা রাক্ষস গিলে ফেল্‌ছে! অতএব ঐ রাক্ষসটিকে বধ করতে না পারলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শনি ছাড়বার আর কোনও উপায়ই নেই। অর্থাৎ যেমন কোরে হোক্‌ বাংলাদেশের ছেলেদের উচ্চ শিক্ষার পথ বন্ধ

কোরে দিতেই হবে। আশু মুখুর্য্যের ওপর রাগ কোরে আমাদের দেশেরও অনেক নির্ব্বোধ লোক য়ুনিভার্সিটীর মাথায় লগুড়াঘাত করতে উদ্যত হয়েছেন! দুর্ব্বুদ্ধি আর কাকে বলে?

প্রায় চৌদ্দ বছর নির্ব্বাসন আর কারাদণ্ড ভোগ করবার পর বোম্বায়ের শ্রীযুক্ত গণেশ সাভারকার মরণাপন্ন অবস্থায় মুক্তি পেয়েছেন। চৌদ্দবছর আগে ইনি এবং এঁর ভাই শ্রীযুক্ত বিনায়ক সাভারকার রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনা করার অপরাধে অভিযুক্ত হোয়ে বোম্বায়ের বিচারপতি স্যর চন্দ্রভারকরের আদেশে নির্ব্বাসিত হয়েছিলেন। তখন গণেশ সাভারকার মাত্র পঁচিশ বৎসরের এক যুবা, তাঁর অপরাধ— তিনি একখানি কাব্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাতে নাকি এমন সব কবিতা ছিল যা পাঠককে রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত কোরে তুলতে পারে। সেই গ্রন্থ প্রকাশের প্রায় দেড় বছর পরে তাঁকে এই শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

স্বদেশ প্রেমোদ্দীপক কবিতা লেখার জন্যে কোনো সভ্যদেশের কবি যে কখনো এত বড় শাস্তি পেয়েছেন জগতের ইতিহাসে সে রকম দৃষ্টান্ত বিরল! জগতের কোনও দেশে কখনও যা হতে পারে না, ভারতবর্ষে সেরকম ব্যাপার আজ পর্য্যন্ত অনেক ঘটেছে এবং ঘটছেও! এখানে রাজার নন্দিনী প্যারী যা করে তা শোভা পায়!

শ্রীযুক্ত গণেশ সাভারকারের সম্বর্দ্ধনার জন্যে সেদিন বোম্বায়ে শ্রীযুক্ত ব্যাপটিষ্টার নেতৃত্বে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়েছিল। সেই সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ব্যাপটিষ্টা বলেছেন—যেদিন গণেশ সাভারকারের প্রতি যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন-দণ্ডের আদেশ হোলো, গণেশ সহাস্যমুখে আমায় প্রশ্ন করলে, ব্যাপটিষ্টা সাহেব! যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন মানে ক-বছর জানো? বিষণ্ণ মুখে আমি উত্তর দিয়েছিলেম, বিশবছর গণেশ! গণেশ খুসি হোয়ে বলে উঠল, তবে আর অত ভাবছ কেন? বিশবছর বই ত নয়! আমার বয়স ত এখন সবে পঁচিশ বছর! পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে আমি যখন দেশে ফিরে আসবো তখন আবার নতুন উৎসাহে দেশের কাজে লেগে যাবো।

এমনিই নির্ভীক, অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেমিক ছিল গণেশের ভাই বিনায়ক সাভারকারও। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি এখনও মুক্তি পান নি! তাঁর শরীরও খুব খারাপ হয়েছে। তাঁর দণ্ডকালও উত্তীর্ণ হোয়ে গেছে। তাঁর মুখও দেখবার জন্যে ভারতবর্ষের লোক উৎসুক হোয়ে আছে। কিন্তু গবর্মেণ্ট তাঁকে ছাড়তে এখনও সাহস করছেন না। এই দুই বীর যুবকের কাছে তাঁদের স্বদেশবাসী চির কৃতজ্ঞ থাকবে।

পাঞ্জাবে অকালি

পঞ্চ নদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে
জাগিয়া উঠেছে শিখ্

*　　*　　*　　*　　*

হাজার কণ্ঠে গুরুজীর জয়
ধ্বনিয়া তুলেছে দিক

পাঞ্জাব থেকে খবর এসেছিল ;—

অমৃতসরে গুরু-কা-বাগ-যাত্রী অকালি শিখদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চলেছে। নিরুপদ্রব-মন্ত্রে দীক্ষিত শিখেরা দলে দলে অমৃতসর থেকে গুরু-কা-বাগে যাচ্ছে সেখানকার বাগান অধিকার করতে ; আর সরকারী লোকেরা তাদের মেরে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তারা প্রাণ পণ কোরে সেখানে গিয়েছে, লাঠির আঘাতে তাদের কারো হাত ভাঙছে, কারো পা, কারো মাথা ভাঙছে, কারো চোখ ঠিক্‌রে বেরিয়ে পড়ছে, কিন্তু সমস্ত যন্ত্রণা অগ্রাহ্য কোরে তারা আবার উঠছে—যতক্ষণ জ্ঞান থাকছে ততক্ষণ অগ্রসর হবার চেষ্টা করছে, অজ্ঞান ও মুমূর্ষু হোয়ে পড়লে তাদের সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

হিন্দুদের প্রতিনিধি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য সেখানে উপস্থিত। আর্য্য সমাজের প্রতিনিধি স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এই অত্যাচারের প্রতিবাদ কোরে সেখানে গ্রেপ্তার হয়েছেন। জালন্ধর কন্যা মহাবিদ্যালয়ের কুমারী লজ্জাবতী সেখানে, মুসলমানদের নেতা হাকিম আজমল খাঁ—এঁরা সকলেই সেখানে উপস্থিত।

নিগৃহীত শিখদের অবস্থা দেখে হাকিম সাহেব সেদিন ঝর ঝর কোরে কেঁদে ফেলেছিলেন।

সরকারী তরফ থেকে মাঝে মাঝে আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে—যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করা প্রয়োজন বোধ করা যাচ্ছে তার অধিক শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে না।

ভারতবর্ষের এই উর্ব্বরভূমি ভ্রাতৃ-বিরোধের আত্মীয়-বিরোধের, ধর্ম্ম-বিরোধের, পিতা ও পুত্রের বিরোধের রক্তে বহুবার কলঙ্কিত হয়েছে। হীন ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য ভারতবাসী আজও যেমন দেশবাসীর বুকে অবলীলায় ছুরি বসায়—জগতের ইতিহাসে তার আর তুলনা নাই। আজ পাঞ্জাবের এই ধর্ম্মপ্রাণ নিরুপদ্রব শিখদের রক্তে ভারতের বহুযুগ সঞ্চিত এই কলঙ্কের কালিমা ধুয়ে যাক্। এ রকম নিরুপদ্রব যুদ্ধ জগতে আর কোথাও কখনো হয়নি, এমন দৃশ্য এর আগে আর দেখা যায়-নি! যাঁর জন্য পাঞ্জাবে এই নিরুপদ্রব-যুদ্ধ সম্ভব হয়েছে, আজ আমরা আবার তাঁকে স্মরণ করি, তাঁকে অন্তরে উপলব্ধি করি ও বার বার তাঁকে প্রণাম করি ও প্রাণ খুলে বলি—জয় মহাত্মা গান্ধী জী কা জয়।

আর

ভাই পাঞ্জাবের নিগৃহীত অকালি শিখগণ! তোমরা আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর। তোমরা যা সত্য বলে জেনেছো, যাকে ধর্ম্ম বলে জেনেছো তার জন্য তোমরা নিরুপদ্রবে সমস্ত অত্যাচার এমন কি মৃত্যুকে পর্য্যন্ত আলিঙ্গন করছো—এ শিক্ষা বাংলায় দুর্লভ। বাংলায় প্রাণ নাই। সত্যের জন্য, বাঙালী যে এমন ভাবে অত্যচারের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারে না সহস্রবার তার পরীক্ষা হোয়ে গেছে। দাও তোমাদের সত্যনিষ্ঠা আমাদের, তোমাদের সত্যাগ্রহের রক্ত পাঞ্জাবের মাটি চুঁইয়ে বাংলার মজ্জায় প্রবেশ করুক বাংলা সত্য মন্ত্রে দীক্ষিত হোক, বাঙালী উদ্ধার পেয়ে যাবে। বাংলার স্বেচ্ছা সেবকেরা যেদিন পুলিশের লাঠি মাথা পেতে নিয়েছিল সেদিন অসহযোগের অহিংস মন্ত্রের প্রথম কথা ক্ষীণ রেখায় জাতির নব জীবনের গগণ ভালে দেখা দিয়েছিল মাত্র আজ সেই রেখা ষোলো কলায় সমুজ্জ্বল হোয়ে পূর্ণচন্দ্রের আকারে ফুটে উঠেছে পঞ্চনদের তীরে অকালিদের শান্ত সংযত অহিংস শৌর্য্য বীর্য্যে! আজ তোমরা দেহের শোনিত দান কোরে বুঝিয়েছে—পশুবল অজেয় নয়, আত্মার বলই অজেয়।

অসহযোগের অহিংস-মন্ত্র তোমাদের শুদ্ধি-আন্দোলনে মুর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে এবং সমগ্র ভারতবাসীকে বুঝিয়ে দিয়েছে—অহিংসা যে আন্দোলনের মূল তার শক্তি অপ্রমেয়। ভারতের অহিংসামন্ত্র আজ কেন্দ্রীভূত হয়েছে—তোমাদের আত্মদানে। তাই হে অকালি ভ্রাতৃবৃন্দ! বাঙালী আজ তোমাদের অভিবাদন করছে, আমাদের অভিবাদন গ্রহণ কর।

তোমরা অহিংসার দ্বারা হিংসাকে, সহিষ্ণুতার দ্বারা নির্য্যাতনকে, ধৈর্য্যের দ্বারা অত্যাচারকে, প্রতিতিক্ষার দ্বারা শত্রুর প্রহারকে ব্যর্থ করেছো। তোমাদের অকুতোভয়তা ও সাহসের পশ্চাতে বন্দুক তলোয়ার কামান অথবা অন্য অস্ত্রবল নাই—আছে কেবল দুর্ব্বার মনোবল। এই মনোবল বা হৃদয়ের শক্তি দিয়ে তোমরা পীড়নের পশুশক্তিকে পরাজিত করেছো। তাই বাংলার জনসাধারণের পক্ষ থেকে আমরা তোমাদের অভিবাদন করছি। এই অভিবাদন গ্রহণ কোরে আমাদের কৃতার্থ কর।

মহাত্মার অহিংস অসহযোগ নীতির পূর্ণতত্ত্ব তোমরা আজ জগৎবাসীর সমক্ষে প্রকট কোরে দিয়েছ—তোমরা জগতে অতুলনীয় কীর্ত্তি স্থাপন করলে—তোমাদের অবদান মহাত্মার অহিংসাবাদের মহিমালোকে জগতের ইতিহাসে চিরভাস্বর হোয়ে থাকবে। তাই বাঙালী আজ তোমাদের সসম্ভ্রম অভিবাদন ও তোমাদের বিজয় কামনা করছে।

তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোক্, তোমাদের অহিংস আন্দোলন সফল হোক, তোমাদের ধর্ম্মমন্দিরের শুদ্ধি কল্পে প্রচেষ্টা সার্থক হোক, বাংলার ও বাঙালীর এই কামনা।
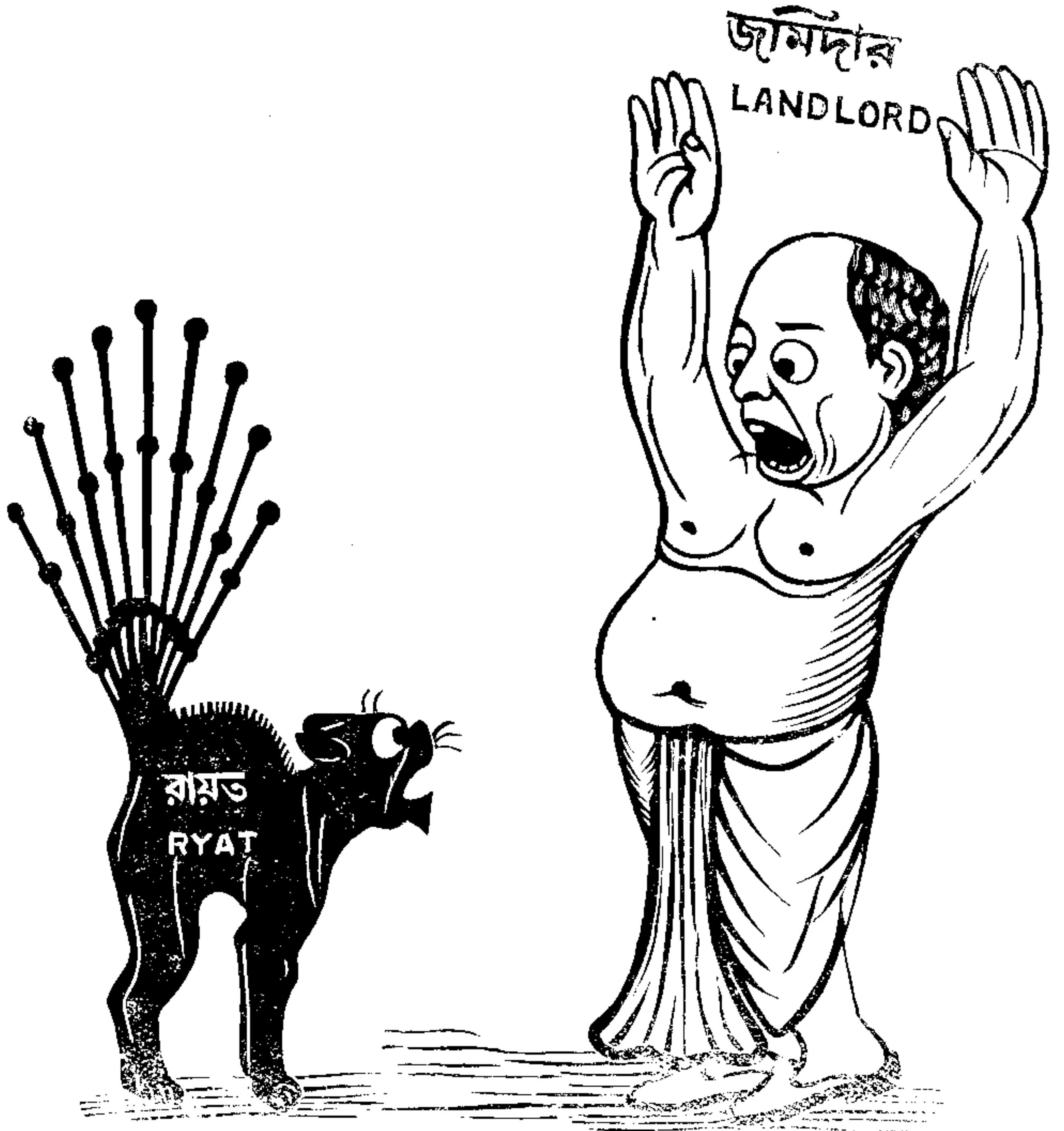
বিড়াল। ম্যাঁও-ও-ও!

কর্ত্তা। ও বাবা! একি! ছিল একটা ল্যাজ কোনও রকমে তার ঝট্‌কাটা বরদাস্ত হ'তো। এখন যে দেখ্‌ছি একেবারে ন'টা গজিয়েছে।

ভাষায় সংখ্যার সার্থকতা

আমরা বেশ গবেষণা কোরে দেখেছি যে ঠিক মনের ভাবের গভীরতা ফুটিয়ে তোল্‌বার মত বিশেষণ ভাষায় নেই। এই ধরুন আমার মনের মানুষটিকে আমি বর্ণনা কোরবো। সে খুব সুন্দর, সে যার পর নাই সুন্দর, সে অতুলনীয় সুন্দর, বড় জোর আমরা এই রকম সব কথা দিয়ে তার স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের মনের যা ধারণা তা লিপি বদ্ধ কোরতে পারি। একজন নিতান্ত কৃশ লোককে বর্ণনা কোরতে হোলে আমরা বলি সে ভয়ঙ্কর রোগা, একেবারে কাঠিটি—এই পর্য্যন্ত। কিন্তু আমার মনের মানুষের সৌন্দর্য্য বা ঐ রোগা লোকের ক্ষীণতা ওতে ঠিক্ যেন প্রকাশ হয়না। ওর চেয়ে বেশী কিছু বোল্‌তে পারলে যেন হৃদয়ের ভাব যোগারূপে ফুটে ওঠে। কিন্তু ভাষায় ওই সব ব্যাপারের ঠিক্ ধারণাটি লোককে করিয়ে দেবার মত বাক্য নেই।

আমরা এর একটা ব্যবস্থা কর্ব্বার চেষ্টায় লেখক লেখিকাদের সুবিধার জন্য অনেক দিন থেকেই মাথা ঘামাচ্ছি। আমরা অনেক আলোচনার পর স্থির করলুম যে সংখ্যা দিয়ে যদি এইরকম বর্ণনার প্রকাশ হয়, তো চমৎকার হয়। যেমন ধরুণ, সকল বিশেষণের চরম বা তার পূর্ণ সংখ্যা হোল ১০০; আমরা এই পূর্ণ সংখ্যা একশ'র অনুপাতে যদি সব বর্ণনার সংখ্যাপাত করি তো বিশেষ বিশেষ বস্তুর ঠিক্ আন্দাজটি পাওয়া যাবে। যেমন আমরা যদি বলি:—

কাল রাত্তিরে একজন ৯৯ রোগা লোকের সঙ্গে একজন ১০০ চমৎকার মেয়েকে যেতে দেখ্‌লুম। মেয়েটির গলার আওয়াজ ছিল ৭৪ মিহি আর লোকটির ৯৬ মোটা।

আমরা জানি যে চমৎকার, রোগা মিহি, মোটা এসবেরই চরম হোল ১০০। সুতরাং ৯৯ রোগা, ১০০ চমৎকার, ৭৪ মিহি, ৯৬ মোটা বল্‌লে আমরা ঠিক্ অবস্থাগুলির মান বুঝ্‌তে পারবো।

ভাষা তত্ত্ববিদরা এ বিষয়টি ভেবে দেখলে আমরা খুসী হব। ———

সমালোচনা

দন্ত-বিকাশ। শ্রীউদ্‌ভ্রান্ত চৈতন্য গোস্বামী কর্ত্তৃক বিকাশিত ও শ্রীরামরঞ্জন গোস্বামী বি-এ দ্বারা মুখোদ্‌ঘাটিত একখানি হাস্য-রসাত্মক কবিতা পুস্তক। শেষ দিকে কতকগুলি গদ্যে রচিত সরস চুটকী আছে। বত্রিশ পাতা। দাম চার আনা। সুকবি কাজী নজরুল ইসলাম দন্ত-বিকাশে 'উস্‌কুনী' দিতে গিয়ে যথার্থই বলেছেন যে "দন্তবিকাশ দর্শক মাত্রেরই দন্তবিকাশ অবার্থ।" রামরঞ্জন গোস্বামী মহাশয় মুখোদ্‌ঘাটনে দন্ত বিকাশের ওজোন দিয়েছেন যে "ছটাক্‌খানিক হাস্যরসের গন্ধ!" কিন্তু আমাদের হিসাবে ওজোন ঢের বেশি হচ্ছে। হাসির পাল্লা বাটখারারার পাল্লার চেয়ে অনেক ঝুলে পড়েছে! উপস্থিত এদেশে হাসির একান্ত অভাব। ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মৃত্যুর পর ব্যঙ্গ কবিতা বাংলা দেশ থেকে একরকম উঠেই গেছল। উদভ্রান্ত চৈতন্য যে আবার ডি. এল রায়ের সেই পুরোণো সুর ধর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছেন এদেখে আমরা খুসী হয়েছি আশা করি তাঁর লেখনী একদিন সার্থক হবে।

———

১ম বর্ষ] ১৩২৯ [৮ম সংখ্যা

সচিত্র পাক্ষিক পত্র

কার্য্যালয়
২০৮.২ এক্ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রতিসংখ্যা
এক আনা

বার্ষিক মূল্য ২৵৹
দুই টাকা দুই আনা।

১ম বর্ষ] ১৫ই কার্ত্তিক, ১৩২৯ [৮ম সংখ্যা

গাল গল্প

সতীশ। (অন্য ফুটপাথ থেকে) ওহে হরিশ তোমার ছেলে হয়েছে শুনলুম।

হরিশ। তোমাদের পাড়া অবধি তবে তার গলার আওয়াজ পাওয়া যায় নাকি?

পিতা। (পুত্রকে উপদেশ দিচ্ছেন) অর্থ উপায় করবার রাস্তা অত্যন্ত দীর্ঘ ও বিপদসঙ্কুল। এই পথে—

পুত্র। অর্থ উপায় করবার কোনো সোজা রাস্তা নেই বাবা।

পিতা। সোজা রাস্তায় গেলে একেবারে জেলের দরজার কাছে গিয়ে পৌছবে।

নগেশ। ভূমিতত্ত্ববিদ্‌দের কাছে হাজার দু-হাজার বছর কিছুই নয় বল্লেও চলে।

সুরেশ। বল কিহে! কাল আমার এক ভূমিতত্ত্ববিৎ বন্ধু আমার কাছে পাঁচশো টাকা ধার নিয়ে গেছে!!

শ্যাম। যদু মদই খাক, আর যাই করুক তার যথা সর্ব্বস্ব সে অনাথ আশ্রমে দিয়ে গেছে।

রাম। তাই ত হে, না মারা গেলে লোক চেনা যায় না। যদু অনাথ আশ্রমে কি দিয়ে গেল?

শ্যাম। চারটি ছেলে, আর তিনটি মেয়ে।

অপূর্ব্ব। যে লোক স্ত্রীকে ধরে প্রহার করে তার প্রতি আমার কোনো সহানুভূতি নেই।

সুধীর। যে স্ত্রীকে প্রহার দেয় সে কারো সহানুভূতির তোয়াক্কা রাখে না।

ছেলে। (বাপকে ঠকান প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে) আচ্ছা, কাল মুরগী শাদা মুরগীর চেয়ে চালাক কেন বলতো?

বাবা। কেন রে?

ছেলে। কাল মুরগী শাদা ডিম পাড়তে পারে কিন্তু শাদা মুরগী কাল ডিম পাড়তে পারে না।

ছুটো খবর

তিমি মাছের জিভ খুব লম্বা বটে কিন্তু তাদের আস্বাদনের শক্তি একেবারেই নাই।

শিশুদের আস্বাদন-শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। বয়সের সঙ্গে তাদের এই শক্তি কমে আসে।

যুদ্ধের পরে আজ পর্য্যন্ত ইংরেজরা মেসোপোটেমিয়ায় ১০০,০০০,০০০ পাউণ্ড খরচ করেছে।

লণ্ডনে আজকাল একরকম দাড়ি কামাবার বুরুষ বেরিয়েছে, তার দাম প্রায় দেড়শো টাকা।

একজন জার্ম্মাণ ইঞ্জিনিয়ার এক উড়ো-জাহাজ তৈরি করছেন। এই জাহাজে দুশো যাত্রীর বসবার ও রাত্রে শোবার স্থান হবে। তা ছাড়া জাহাজখানা একশো টন মাল বইতে পারবে। চার হাজার মাইলের মধ্যে জাহাজ কোথাও নাম্‌বে না। জাহাজ-খানা নশো ফুট লম্বা।

শেষদান

"ঠাকুর্দ্দা!—"

"কি দিদি—"

"আজ যে—"

"কিছু নাই বুঝি?—"

"না, সমস্ত বাড়ন্ত!"

"ওঃ! তাই ত বলি আজ এত বেলা হোলো তবু উনুনে আগুন পড়্‌ল না কেন?"

"কি কর্ব্ব ঠাকুর্দ্দা, সেই পরশু কয়লা ফুরিয়েছে, কাল আর পয়সা ছিল না বলে তো আনা হয় নি, অম্‌নি ছুটো কাঠ-কাঠ্‌রা জেলে ভাতে ভাত ফুটিয়ে দিয়েছিলুম। আজ যে চাল ডালের একটা দানাও নেই, উনুনে চড়াবোই বা কি বল?"

"তাইত ভাই, একেবারে শিরে সংক্রান্তি কোরে বল্‌লি, এখন কার কাছে যাই? কোথায় কি পাই বল্‌তো?"

"আমি মনে করছিলুম তুমি হালচাল বুঝে কিছু যোগাড় কোরে আন্‌বে! তাই আর কিছু বলি-নি, আর রোজ রোজ তোমাকে অভাবের তাড়নায় পীড়িত করতেও আমার বড় কষ্ট হয়! আহা কত বড়লোকের ছেলে রাজ-রাজেশ্বর তুমি, কি থেকে কি হোলে? এমন সর্ব্বনাশও মানুষের হয়?—আজ তোমার এ দশা দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। একেতো বাবা তোমাকে ধনে প্রাণে মেরে শেষটা নিজেই বিষ খেয়ে মলেন—তার ওপর আমি পোড়ারমুখী আবার সীঁথের সিঁদুর মুছে হাতের নোয়া ঘুচিয়ে তোমার এই অসময়ে এসে তোমার গলগ্রহ হলুম। ভাগ্যে মা ঠাকুমা আমার সতী লক্ষ্মী তাঁরা,—সকাল সকাল স্বর্গে গেছেন নইলে আজ এ দৃশ্য

তাঁদের দেখ্‌তে হোতো। রাজার ছেলে ভিক্ষে করছে।"

তরুণীর ডাগর চোখ দুটী জলে ভরে উঠ্‌ল। সে তার পরিহিত শ্বেতাঞ্চলবাস তুলে যখন অশ্রুজল মুছ্‌তে গেল, দারিদ্র্যের নিরুপম প্রতিমূর্ত্তির মত তার জীর্ণ বস্ত্রের ছিন্নাংশ ভেদ কোরে উপবাসক্ষিন্ন-যৌবনের ম্লান লাবণ্য ক্ষণেকের জন্য অনাবৃত হোয়ে পড়্‌ল।

—"দিদি ভাই তোর একখানা কাপড় আর না কিনে দিলে তো চল্‌ছে না। ছেঁড়া কাপড়খানা পরেতো আজ প্রায় দু-বছর কাটালি! আহা আমার এখানে এসে তোর কি কষ্টই না হচ্ছে!—"

"সে এর পর না হয় হবে এখন, তার জন্য তোমায় কিছু ভাব্‌তে হবে না, আমাদের পাশের বাড়ীর বিনোদের মা নিজেই উপযাচক হোয়ে আমাকে একখানা পুরাণো থান দেবে বলেছে, আমাকে চাইতেও হয়-নি! এখন যা হোক একটা উপায় কর! ওদের সেই তের আনা পয়সা অনেকদিনের ধার আছে, এখনও শুধ্‌তে পারিনি, ওদের কাছেত আর একটী পয়সার জন্যেও হাত পাততে পারবো না। কাঁসা পেতলের বাসন আর এক টুক্‌রোও নেই যে বেচিয়ে আনবো! হ্যাঁ ভাল কথা, তুমি যখন গঙ্গা নাইতে গেছ্‌লে ঠাকুর্দ্দা, বাড়ীওলা এসে ঘরভাড়ার কড়া তাগাদা কোরে গেলে, বলে দু-মাসের ভাড়া নাকি বাকি পড়েছে! —"

—"তা পড়্‌লোই বা!—দু-মাসের ভাড়া বাকী পড়েছে তাতে আর হয়েছে কি? ভারি তো একখানা একতলার এঁদো-পড়া ঘর, স-চারটাকা তার ভাড়! আমার যে হাতী-বাগানের চৌদ্দখানা দোতলা বাড়ীর ভাড়াটেরা কেউ ছ-মাস কেউ এক বচ্ছর ভাড়া বাকী ফেলে রাখ্‌তো, কই আমি তো তাদের কোনও দিন কড়া তাগাদা করি-নি!—"

নিরাভরণা বিধবার অভাব নিষ্পেষিত শুষ্ক মলিন অধরপ্রান্তে ঠিক রোদনের মত একটু ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিল। তরুণী ভারি গলায় বল্‌লে, "তোমার কথা ছেড়ে দাও ঠাকুর্দ্দা, সবারই কি আর তোমার মত দিল্‌-দরিয়া মেজাজ? অতবড় দরাজ বুকের পাটা এই কলকাতার সহরের কটা বড়লোকের ছেলের আছে বলো? তোমার আজ আর কিছু নেই বটে কিন্তু আকাশের চেয়ে যে উদার মহাপ্রাণ তোমার অন্তরটীকে আজও এই সহস্র দুঃখ কষ্টের মধ্যেও এখনও রাজ রাজেশ্বর কোরে রেখেছে তার দাম যে ক্ষতিয়ে পাওয়া যায় না ভাই!"

মুহূর্ত্তের জন্য অভাব ও দৈন্যের সমস্ত বেদনা ভুলে গিয়ে বৃদ্ধের লোল-বক্ষ আনন্দে গর্ব্বে স্ফীত হোয়ে উঠলো!—

তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর ঢুকে বাক্সের চাবি খুলে কি একটা বার কোরে এনে নাতনীর হাতে দিয়ে, প্রসন্ন মুখে বৃদ্ধ বল্‌লে, "এই নে

দিদি আজকের মতো এইতে চালিয়ে দে, তোর এই বুড়ো ঠাকুর্দ্দা যে কদিন বেঁচে আছে তুই কিছু ভাবিস নি !"

তরুণীর পদ্মকলির মতো হাতের মুঠোয় সেটা চক্ চক্ কোরে উঠলো দেখে সে কৌতুহলের সঙ্গে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লে সেটা রামচন্দ্রের আমলের একখানা মোহর ! অবাক্ হোয়ে সে তার ঠাকুর্দ্দার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল ! তার পর আস্তে আস্তে তার দাদার দিকে মোহরখানা এগিয়ে দিয়ে বল্‌লে, "না ঠাকুর্দ্দা, তুমি যার স্মৃতির সম্মানের জন্যে সহস্র দুঃখ কষ্টের মধ্যেও এ মোহরখানিকে বাঁচিয়ে এসেছো, আমি তো প্রাণ থাক্‌তে তা আজ খরচ করতে পার্ব্বো না, এ তুমি তুলে রেখে দাও। অন্য যে কোনও একটা উপায়ে হোক্ আজকের মত চলে যাবে এখন।"

"ওরে নারে দিদি না ! ওটাকে খরচ করতেই হবে নইলে যে আমি নিশ্চিন্ত হোতে পার্চ্ছিনি !"

"কেন, ঠাকুর্দ্দা এটাকে যে তুমি আমার ঠাকুরমার প্রেমের অমর প্রতীক্ কোরে রাখতে চেয়েছিলে ! কতবার আমাকে বলেছো—বুড়ি তোর ঠাকুরমার মোহর খানা কিন্তু খুব টেঁকে আছে ! দেখিস্ ওটা যেন না বেরিয়ে যায় !"

"আঃ !—তুই কিছু বুঝিস্‌নে বুড়ি,— তখন আমি ভাব্‌তুম যে, আমিই বুঝি বাহাদুরী কোরে সব চালাচ্ছি, কিন্তু সেদিন তোর ঠাকুমা আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে যেন বল্‌লে, "ওগো, ভগবানের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর রেখো কোনও দিন কষ্ট পাবে-না। সেদিন থেকে আমি বেশ বুঝতে পেরেছি বুড়ি যে, এ শতছিদ্র সংসার চলেছে এই অশক্ত নিরুপায় বৃদ্ধের বাহাদুরীতে নয়, সর্ব্বশক্তি-মানের অপরিসীম কৃপায় !"

বল্‌তে বল্‌তে বুড়ো আকাশের দিকে চেয়ে দু-হাত তুলে কপালে ঠেকালে। তার পর নাত্‌নীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্ ফিস্ কোরে বললে, "আর কি জানিস্ বুড়ী, বাক্সের মধ্যে মোহরখানা লুকিয়ে রেখে লোকের কাছে গিয়ে বল্‌তে লজ্জা করে যে, আমার হাতে কিছু নেই ! কারুর কাছে চাইতে গেলেই—তৎক্ষণাৎ এই মোহরখানা যেন বাক্স ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে আমার চোখের সাম্‌নে ঝক্ ঝক্ কোরে উঠে, আমায় জানিয়ে দেয় যে, বুড়ো তুমি লোকের সঙ্গে প্রতারণা কর্‌চো কাজটা ভাল নয় ! বুঝ্‌লি। এইটে আমার বুকে বড্ডই বাজেরে দিদি—আমার ধোনসর্ব্বস্ব যাক্ তাতে আমি কাতর নই, কিন্তু লোকে যেন না বলে যে, আমি তাদের ঠকিয়ে খেয়েছি।—অপবাদ আমি সহ্য করতে পারবো না !—"

"ঠিক বলেছো দাদা, তুমি এখন গিয়ে কোনও পোদ্দারের ওখানে এ মোহরখানা

বেচে এসো—এ যতক্ষণ আমাদের হাতে থাক্‌বে ততক্ষণ তুমি আমি কিছুতেই নিজেদের নিঃস্ব বলে মান্‌তে পারি-নি!”

বুড়ো আবার ঘরের ভেতরটা হাত্‌ড়ে একখানা জীর্ণ মলিন উত্তরীয়—তার অসময়ের সেই একমাত্র অবশিষ্ট অঙ্গবাস কাঁধের ওপর ফেলে,—কম্পিত মুষ্টির মধ্যে মোহর খানা চেপে ধরে চঞ্চলপদে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল!

হঠাৎ ‘বুড়ীর’ মনে পড়্‌ল তাইত,—কি কি কিনে আন্‌তে হবে দাদাকে বলে দেওয়া হোলো না তো!—দেখি কতদূর গেলেন—যদি ফেরানো যায়,—বলে তাড়াতাড়ি সে বাতায়নের ধারে ছুটে গেল—কিন্তু দাদাকে কোথাও দেখ্‌তে পেলেনা—ঠিক সেই সময় তার কানে একটা করুণ গানের সুর ভেসে এল,—সে সেইদিকে চেয়ে দেখ্‌লে একদল ছেলে নগ্নপদে গান করতে করতে রাজপথ দিয়ে চলেছে। তাদের মধ্যে কারুর কাঁধে বাঁশের ওপর স্তূপাকার কাপড় জামা জড়করা—কারুর হাতে ঝোলায় করা রাশিকৃত চাল, কারুদের হাতে চাদরের দোলায় অসংখ্য নোট, টাকা রেজ্‌কী পয়সা!—ছেলেরা গাইছিল—

—ওই শোন কাঁদে কাতরে কাহারা;
প্লাবন তাড়নে আশ্রয়হারা—
তোমাদেরই যে গো ভাই বোনতারা—
মরিতেছে অনাহারে!
ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও,
করুণা নয়নে ফিরিয়া চাও,
দয়া কর দাতা, এসেছি দ্বারে!—

গান শুন্‌তে শুন্‌তে পেছন থেকে হঠাৎ বুড়ি যেন তার ঠাকুর্দ্দার গলা পেয়ে ফিরে দেখ্‌লে—বৃদ্ধ হন্তদন্ত হোয়ে এসে বলছে, “বুড়ি! দেনা—আর কিছু নেই? হ্যাঁরে দেখ দিখিন্‌, আমাদের বাড়ী থেকে ওরা যে শুধু ঐ মোহর আর চাদরখানা পেলে আর কিছু দিবি-নি?—বুড়ির চোখ দিয়ে ঝর ঝর কোরে জল পড়তে লাগল।

অকালি নিগ্রহের প্রমাণ

তারা সিং, মৃত্যুর পর ফটোগ্রাফ গৃহীত।
মাথায় তিন ইঞ্চি গভীর ক্ষত।
(ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টের সৌজন্যে)
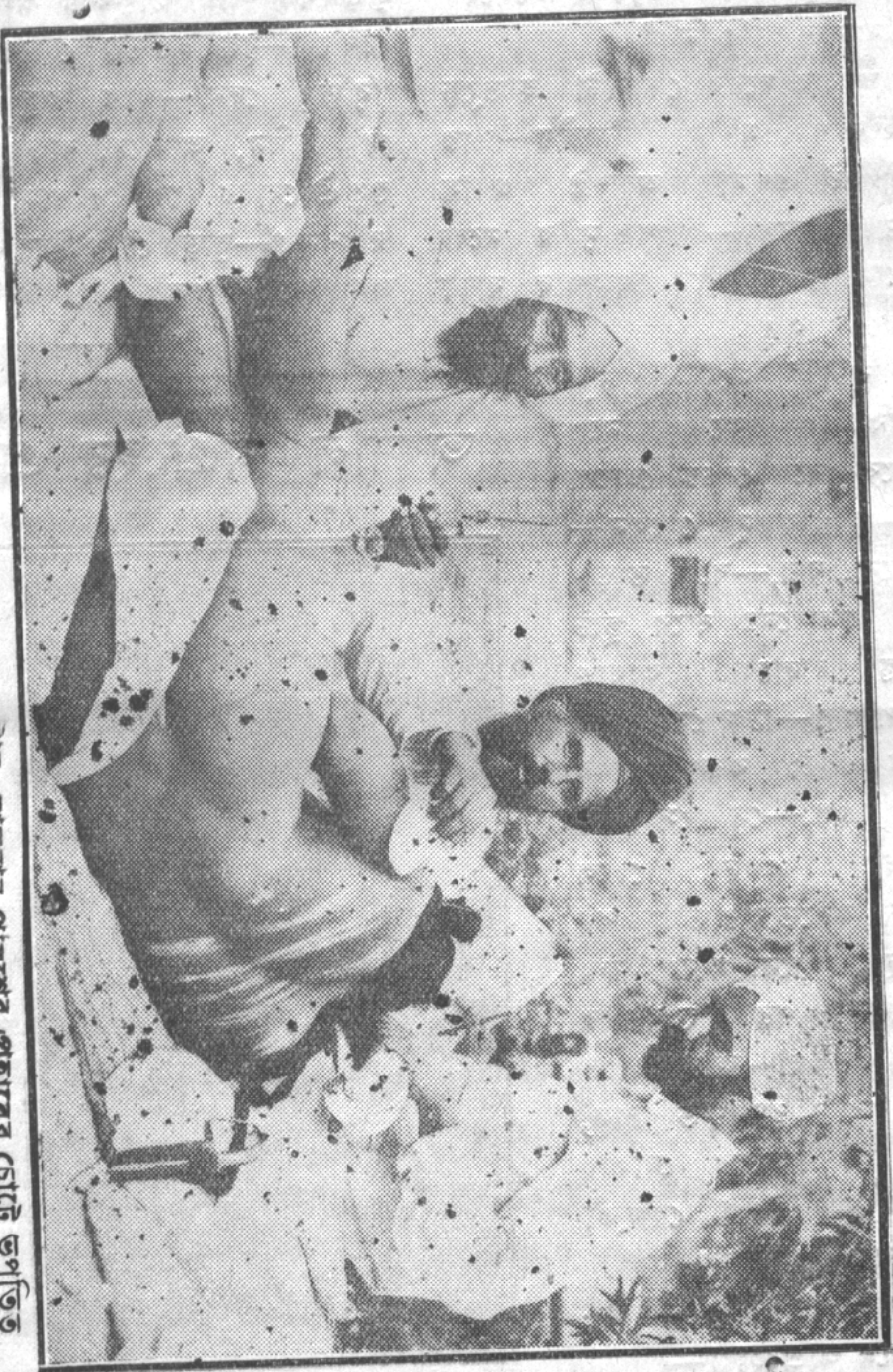
লায়ালপুরের ভাই পৃথীপাল সিং, বয়স ২২ ইনি সাতবার পুলিশের প্রহারের চোটে ভূপতিত হন এবং সাতবার উঠিবার চেষ্টা করেন।

(ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টের সৌজন্যে)

স্পষ্ট কথা

আমরা পূজোর সময় এক পক্ষের জন্য ছুটি নিয়েছিলুম বলে গেল পক্ষে বৈঠক বের হয়-নি। পূজোর পর বৈঠক আবার বেরুল। আমরা আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠক-পাঠিকাদের আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

এবার পূজোর সময় আমাদের দেশের এক দিকে সর্ব্বনাশের বন্যা বয়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষের কোথাও শান্তি নাই। এদিকে উত্তর-বঙ্গের ভীষণ প্লাবনে প্রায় পনেরো লক্ষ লোক অন্নহীন, গৃহহীন, বস্ত্রহীন হয়েছে, ওদিকে পাঞ্জাবে অকালিদের নিরুপদ্রব যুদ্ধ চলেছে। শুধু তাই নয়, ভারতের রাজনৈতিক গগনে মেঘের পর মেঘ এসে জমছে। রাজনৈতিক গগন যেমন অন্ধকার, ভারত-বাসীর হৃদয়ও তেমনি একটা নিরাশার অন্ধকারে অবসাদগ্রস্ত হোয়ে পড়েছে।

শুধু ভারতবর্ষ নয়, ওদিকে ইউরোপ-খণ্ডে তুরস্ক ও গ্রীসের যুদ্ধে ইউরোপময় একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গিয়েছে। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জের পতন জগতের ইতিহাসে একটা চিরস্মরণীয় ঘটনা হোয়ে রইল। চারিদিকেই অমানিশার ঘোর অন্ধকার। পরিবর্ত্তনের মুখে এই রকমই হয়। এই পরিবর্ত্তনের সময় আমরা মানুষ ও পৃথিবীর দুঃখ সুখের দণ্ডবিধাতা একমাত্র পরমেশ্বরের নিকট ভিক্ষা চাই যে, এবার তিনি মানুষকে শান্তি দিন। মানুষ বহুদিন নিজের নিজের বুকে স্বার্থের জন্য ছুরি মেরে এসেছে। মানুষের সভ্যতা অন্যভাবে গঠিত হোক, মানুষ মানুষ হোক।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, মিঃ ভি জে পটেল, ডাক্তার গৌর এতদিন ধরে যে আন্তর্জাতিক বিবাহটাকে আইনসিদ্ধ করবার চেষ্টা করছিলেন, এতদিন পরে ডাঃ গৌরের পুনঃ পুনঃ চেষ্টায় সেটা একটা কমিটির হাতে অর্পিত হয়েছে! কাউন্সিলের হিন্দু, মুসলমান বহু সদস্য এ বিষয়ে ঘোর প্রতিবাদ করেছিলেন! তাঁরা কাতর হোয়ে বলেছিলেন যে, এ আইন বিধিবদ্ধ হোলে হিন্দু ও মোসলেম ধর্ম্ম একেবারে রসাতলে যাবে। এই কথা শুনে অনেকেই জাতিধর্ম্ম রক্ষাকল্পে মিশ্র-বিবাহের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন। মাত্র কেবল একটী ভোট বেশী হওয়ায় ডাঃ গৌরের বিল কমিটির হাতে গেছে, নইলে অঙ্কুরেই বিনাশ হোতো!

ধর্ম্মভীরু হিন্দু-মুসলমানেরা কেন যে এত চঞ্চল হোয়ে উঠেছেন তার কোনও সঙ্গত কারণ আমরা খুঁজে পাচ্ছি-না! ডাঃ গৌরের এই আন্তর্জাতিক বিবাহ বিলে এমন কোনও বিধান নেই যেটা কোনও

ধর্ম্মানুরাগী হিন্দু বা ধর্ম্ম-বিশ্বাসী মুসলমানকে বিধর্ম্মী স্ত্রী গ্রহণে বাধ্য করবে! বিধবা-বিবাহ আইনসিদ্ধ হোলে বাংলা দেশ কটা বাল-বিধবার বিবাহ দিয়ে সৎসাহস দেখাতে পেরেছে? অশিক্ষিতা বাল-বিধবারা কুপথগামিনী হচ্ছে দেখেও তাঁরা হিন্দুধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষা করবার ব্যর্থ চেষ্টায় বিধবা মেয়ের বিবাহ আর দিচ্ছেন না। সুতরাং মাভৈঃ! তাঁদের ধর্ম্মনষ্ট ও জাতঃপাত হবার কোনো আশঙ্কা নেই।

—

ডাঃ গৌরের বিল কেবল তাঁদেরই সাহায্য করবে, যাঁরা বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হোলেও পরস্পরকে ভালবেসে ধন্য হয়েছেন এবং স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ না কোরেও পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হোয়ে তাঁদের প্রেমকে একটা দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চান। আমরা মনে করি, প্রত্যেক মানুষেরই এই সাধু চেষ্টার সমর্থন করা উচিত। যেখানে প্রাণের বিনিময়ে দুটি হৃদয়ের সত্যকার পরিণয় হোয়ে গেছে, সেখানে আর আইনের বাধাকে মিলনের অন্তরায় কোরে রাখা ঠিক নয়!

—

রুগ্ন-মরণাপন্ন-শয্যাগত বৃদ্ধবার তুর্কীর সহসা হুঙ্কার দিয়ে বীরদম্ভে জেগে ওঠা ইউরোপের ইতিহাসে এই প্রথম নয়। খৃষ্টান তুর্কীকে তার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত রাখবার জন্যে চিরদিন লড়াই করতে হয়েছে, এবং বার বার এই রণশ্রান্ত আহত পীড়িতকে রোগশয্যার একান্ত আকাঙ্ক্ষিত বিশ্রাম পরিত্যাগ কোরে দেহের ওপর থেকে শত্রুর আঘাতের বেদনা ও ক্ষতচিহ্ন আরোগ্য হবার আগেই হাতিয়ার টেনে নিয়ে খাড়া হোতে হয়েছে, কেবল আত্মরক্ষার জন্যে!

—

তুর্কীর দুর্দ্দমনালা (Dardanelles) আজ মিত্রশক্তির অধীনে। সুলতান রুমের (Constantinople) হারেমে বেকারে বন্দী! সাম্রাজ্যের অধিকাংশ আজ পরহস্তগত। স্বদেশ-প্রেমিক মহাবীর কামাল পাশা চোখের সামনে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হোয়ে আসছে দেখতে পেয়ে জনকতক দেশভক্ত অনুরাগী বীরের সাহায্য নিয়ে শত্রুর হাত থেকে স্বদেশ ও সাম্রাজ্য উদ্ধার করবার জন্যে প্রাণপণ কোরে অগ্রসর হয়েছেন। এই অদম্য সাহসী অমিততেজ বীর্য্যবান পুরুষের কীর্ত্তি দেখে মুগ্ধ হোয়ে বিজয়লক্ষ্মী আজ তাঁকে আপন হাতে বরমাল্য পরিয়ে দিয়েছেন!

—

সমর্ণা উদ্ধার হয়েছে, কিন্তু এখনও আড্রিয়ানোপাল, থ্রেস্, গ্যালিপলি, দার্দ্দানেলাস্ কন্স্টান্টিনোপল্ অন্যের অধিকারে! এসব একে একে ফিরিয়ে না নিয়ে কি কামাল

তারপর সে যে আরব, মেসোপোটেমিয়া, প্যালেসটাইন, সিরিয়া, এশিয়া-মাইনার এমন কি মিশর, আল্জিরিয়া প্রভৃতি তুর্কীর ভূতপূর্ব্ব অধীন রাজ্য,—সেগুলো তার দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে সুযোগ বুঝে পাঁচজনে ভাগাভাগী কোরে নিয়েছে, হয়ত জয়গর্ব্বে উন্নতশির কামাল সেই সব অপহৃত রাজ্যসম্পদ ও পুনরুদ্ধারে প্রবৃত্ত হোতে পারে!

সুতরাং কামালের অভ্যুদয়ে আজ ইংরেজ যে সকলের চেয়ে চঞ্চল হোয়ে উঠবে এটা খুবই স্বাভাবিক! আজ এই পঞ্চাশ ষাট বছর ধরে ক্রমাগত চেষ্টা কোরে ও সুযোগ খুঁজে খুঁজে সে এ অঞ্চলের অনেকটা নিজের দখলের মধ্যে এনে ফেলেছে!—এশিয়া ইউরোপে একচ্ছত্র রাজচক্রবর্ত্তিনী হবার যে সুখস্বপ্ন দেখে বৃটানীয়া গোপনে ছদ্মবেশে দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিল, আজ তার সেই স্বপ্ন সফল হবার পথে নির্বিঘ্নে উড়ে চলেছিল, হঠাৎ কামালের কামান গর্জ্জে উঠে তাকে স্বপ্নলোকের মেঘের উপর থেকে টেনে এনে শাহারা মরুভূমির উত্তপ্ত বালির নীচে আছাড় মেরেছে!

কামালের বিরুদ্ধে তাই ইংরেজ আজ 'সামাল সামাল' কোরে তার নৌবহর, সৈন্য সামন্ত, কামান-বন্দুক পুষ্পকরথ নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল,—অবশ্য ভারতবাসী মুসলমানদের পক্ষে ব্যাপারটা বেশ প্রীতিকর নয় বটে, কিন্তু তবুও তাদের এটা চুপ কোরে সহ্য করতেই হোতো, কারণ এটা কেবলমাত্র খেলাফৎ সমস্যা নয়, এ রাজ্য নিয়ে স্বার্থের বিরোধ!

ব্যয়-সংক্ষেপ-সমিতির নেতা হোয়ে লর্ড ইঞ্চকেপ ভারতে আসছেন। তাঁর খুব বিশ্বাস যে, তিনি এদেশের খরচ নিশ্চিত কমাতে পারবেন এবং দরিদ্র প্রজাদের দুর্ব্বল স্কন্ধের ওপর থেকে অতিরিক্ত কর-ভার অনেকটা হাল্কা কোরে দিয়ে যাবেন। ভগবান তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন! কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ভদ্রলোকের বোধ হয় বৃথাই কেবল পণ্ডশ্রম করা হবে। কারণ ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনকারীর দল এখন সমস্বরে চাইছেন protective tariff!—বাণিজ্য-সংরক্ষণ-বিধি! কিন্তু সেটা তাদের পাবার আশা নেই, কারণ অবাধ-বাণিজ্য লোভী বিদেশী বণিকের দল তাতে ঘোর আপত্তি করবেন! দ্বিতীয় দফায় তাঁরা চাইছেন যে, ভারতে ইংরেজ সৈন্যের পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র দেশী সেপাই রাখা হোক্ এবং দেশী সৈন্যদলের বিলাতী অধিনায়কের বদলে, দেশী অধিনায়ক বাহাল করা হোক্। কিন্তু ব্রিটিশ 'সাম্রাজ্য-রক্ষক-সঙ্ঘ' তাঁদের এই সর্ব্বনেশে আব্দারে কিছুতেই সায় দেবে না, তৃতীয় দফায় তাঁরা চাইছেন—যে ভারতের শাসন-কার্য্য পরিচালনের জন্য উচ্চ রাজ-

কর্ম্মচারীর দল বিলাত থেকে আর আমদানী না কোরে এদেশেই সংগ্রহ করা হোক্, আর শাসন-সংস্কার-আইন অনুসারে এদেশের দেওয়ানী কাজ সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের হাতে আস্‌তে অনেক বিলম্ব হবে বলে সেটা যাতে যথাসম্ভব সত্বর সুসম্পন্ন হোতে পারে তার ব্যবস্থা করা হোক্! কিন্তু "ষ্টীল ফ্রেম" তাতে বিদ্রোহী হোয়ে উঠ্‌বে!

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, লর্ড ইঞ্চকেপের সাধু উদ্দেশ্য সফল হবার সম্ভাবনা খুবই কম। যে কটা মোটা খরচ তাতে ভদ্রলোক মোটেই দন্তস্ফুট করতে পারবেন না। অবশিষ্ট রইল পুলিশের ক্রমবর্দ্ধিত ব্যয়ভার! কিন্তু পুলিশ যেন গভর্ণমেণ্টের স্ত্রী-ধন,—কাহারও তা দান বিক্রয় বা বন্ধকের হুকুম নেই, সুতরাং ওটা সংক্ষেপ করা তো দূরের কথা, প্রতি বৎসর পূজার সময় গৃহিণীকে নতুন গহনা উপহার দেওয়ার মত প্রতিবৎসর বাজেটের হিসাবে পুলিশের ব্যয় বরং কিছু বাড়িয়েই দিতে হবে।

তবে ইঞ্চকেপ একথা বলতে পারেন বটে যে, আমি উপায় বাৎলে দিলেই খালাস! গবর্মেণ্ট যদি তদনুসারে কাজ না করেন তবে সেটা তো আর আমার কমিটীর দোষ নয়! দেখা যাক্ কতদূরের জল কতদূরে গড়ায়!

কলিকাতার অগ্নি-যোদ্ধারা (Fire Brigade) আজকাল যোগ্যতায় ইউরোপের যে কোনো প্রধান সহরের অগ্নি-যোদ্ধাদের সঙ্গে সমান, কিন্তু হোলে কি হবে, তাদের সমস্ত বাহাদুরীই নষ্ট কোরে দিচ্ছে অকর্ম্মণ্য কলিকাতা মিউনিসিপালিটির শোচনীয় জল সরবরাহ বিধি। সেদিন মিনার্ভা থিয়েটারে আগুন লাগবার সময় কলিকাতা কর্পোরেশনের এই দৈন্য একেবারে নির্লজ্জের মত অনাবৃত হোয়ে পড়েছিল! সেই সঙ্গে আর একটা কদর্য্য জিনিষও সেদিন কলিকাতার আপামর জন সাধারণের কাছে প্রকাশ হোয়ে পড়েছিল, সেটা সহরের কোনও বড়লোকের নির্ব্বুদ্ধিতা আর পশুর মত হৃদয়হীনতা!

এই ধনী ব্যক্তিটী নাকি অগ্নি সংযোগ স্থলের নিকটেই বাস করেন—এবং সৌভাগ্যবশতঃ তাঁর বাড়ীতে এখনও একটী পুষ্করিণীর অস্তিত্ব আছে। উপযুক্ত পরিমাণ জলের অভাবে উৎকণ্ঠিত অগ্নি-যোদ্ধার দল তাঁর পুষ্করিণীর সন্ধান পেয়ে জল নেবার জন্যে ছুটে গিয়ে তার অনুমতি প্রার্থনা করে—কিন্তু পুকুরে মাছ নষ্ট হবার ভয়ে তিনি প্রথমটা জল নেবার অনুমতি দেন-নি! মিনার্ভা থিয়েটারের আশে-পাশের বাড়ী নষ্ট হওয়া বা জনকতক লোক পুড়ে মরার চেয়ে তাঁর পুকুরের মাছ নষ্ট হওয়াটাই ধনকুবের মহাশয়ের বিবেচনায় অধিক ক্ষতি-

জনক বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু পুলিশ এই বোকা বড় লোকটীর নির্লজ্জ আপত্তি অগ্রাহ্য কোরেই তাঁর পুকুর থেকে জল নিতে প্রস্তুত দেখে শেষটা ভয়েই হোক বা যে কোন কারণেই হোক তিনি আর আপত্তি করেন-নি।

—

এই মহাপুরুষটীর আর একটী কীর্ত্তিও এই প্রসঙ্গে আমাদের কানে এসেছে, সেটাও পাঁচজনের শুনে রাখা উচিত। এঁর বাড়ীতে কোন একটা উৎসব উপলক্ষে পাড়ার এক ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন কিন্তু তাঁর শরীর অসুস্থ থাকায় এদেশের চিরন্তন সামাজিক প্রথা হিসেবে তিনি নিমন্ত্রণ-কর্ত্তার সম্মান রক্ষার্থে তাঁর পুত্রকে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু বড় লোক মহাপ্রভু এতে ভীষণ চটে তাঁর পুত্রকে অপমান কোরে তাড়িয়ে দিতে উদ্যত হন। তিনি নাকি ছেলেটিকে বলেছিলেন "তুমি কে? তুমি এখানে কি করতে এসেছ? তোমাকে তো কেউ নিমন্ত্রণ করেনি! তোমার বাপ্‌কে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, সে আস্‌তে পারেনি বলে যে তার গুষ্টীকে খাওয়াতে হবে এমনত কোনও কথা নেই, তুমি বাপু বাড়ী যাও!—ইত্যাদি!—" ভদ্রলোকের ছেলে এই দারুণ অপমানে ক্রুদ্ধ হোয়ে উদ্ধতভাবে জবাব দিয়েছিল, যে মহাশয়ের ছেলে গিয়ে আমাকেও আসবার জন্য বিশেষ কোরে যদি না বলে আস্‌তো তা হোলে আপনার মত ইতরের বাড়ী আমি কখনই মাড়াতে আসতুম না!" সেই সময় সৌভাগ্যক্রমে ঐ ধনীর পুত্র সেখানে এসে উপস্থিত হয় এবং নিমন্ত্রিত ছোকরার কথা সমর্থন করে, তখন ধনী মহাপ্রভু তাচ্ছিল্যের সহিত বলেন, "তবে যা ছাতে নিয়ে গিয়ে কপোত খাইয়ে ছেড়ে এদিগে যাঃ—" বলা বাহুল্য যে ভদ্রলোকের ছেলেটী সে বাড়ীতে আর জলগ্রহণ পর্য্যন্ত না কোরে খুলো পায়েই চলে এসেছিল। এখন বোঝা যাচ্ছে যে, এই লোকটা সেদিন আগুণ নেবাবার জন্যে পুকুরের জল দিতে কাতর হয়েছিল কেন?

—

লর্ড রেডিংয়ের পদত্যাগের গুজবটা ঠিক লয়েড জর্জ্জের মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে রটতে সুরু হয়েছে। এর সুর বিলেতের কাগজেও বেজে উঠেছে, অথচ এখানে মধ্যে একটা প্রতিবাদও হোয়ে গেল! ব্যাপারটা ঠিক কিছু বোঝা যাচ্ছে না! তবে, আমাদের মনে হয় লর্ড রেডিংয়ের আবার ইংলণ্ডের আদালতে ফিরে যাওয়াই ভাল। জজিয়তী থেকে একেবারে লাটগিরীটা তাঁর ঠিক বরদাস্ত হচ্ছে না। তা ছাড়া এই চাকরীটা নিয়ে পর্য্যন্ত তাঁর আশেপাশে যে সব শম্ভু-নিশম্ভু বিরাজ করছে, সে সব পুরানো পাপীদের এড়িয়ে তিনি নিজে কিছু একটা কোনো দিন করতে পারবেন এমন ত মনে হয় না!

—

অতএব পুতুলের মত চেয়ার জুড়ে বসে না থেকে তাঁর ছেড়ে দেওয়াই উচিত, কিন্তু ছাড়েনই বা কি বলে ? লর্ড সিংহ তো অসুস্থতার দোহাই দিয়ে পরিত্রাণ পেয়েছেন। দিনকতক আগে হোলেও বা ভারতের জল হাওয়া সহ্য হচ্ছে না বলে ইনিও সরে পড়তে পারতেন, কিন্তু এখন কি বলবেন ? বিলাতের—"ডেলী এক্সপ্রেস্" বলে একখানা সংবাদ পত্র লিখেছে, যে লর্ড রেডিং ভারতের শাসনভার গ্রহণ করবার সময় এই কড়ারে চুক্তি কোরে এসেছিলেন যে, আড়াই বৎসর পরেই তিনি দেশে ফিরে আস্‌বেন। এ কথাটা যদি সত্য হয় তা হোলে আর কোনও ভাবনা নেই !

বনার্ ল'র তত্ত্বাবধানে এবারে বিলাতে যে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে তাদের মধ্যে অধিকাংশ সভ্যই ভারতের উন্নতির বিরোধী। সুতরাং এখন কিছুদিনের মত সব রকম আব্দার বন্ধ রেখে মডারেট্ ভায়াদের বসে বসে আঙুল চুষ্‌তে হবে !

উত্তর বঙ্গের জল-প্লাবনে আশ্রয়হীন অনাহারী, বিবস্ত্র ও ব্যাধিগ্রস্ত বিপন্নদের সাহায্যকল্পে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর স্বদেশ-বাসীকে ডাক দিতেই তারা যে ভাবে আচার্য্যের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে সেটা বাস্তবিকই আশাতীত ও বিস্ময়কর ! দেশের আপামর জন-সাধারণ আজ চারিদিক থেকে অন্ন, বস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহ কোরে পাঠাচ্ছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, পার্শী সবাই আজ একত্রে মিলিত হোয়ে এই মহৎকার্য্যে সহায়তা করতে অগ্রসর হয়েছে ! এমন কি দেশের পতিতা নারীরাও আজ দলে দলে সহরের দ্বারে দ্বারে ঘুরে দেশের দুঃস্থ ভাই বোনেদের সাহায্য করবার জন্য চাঁদা সংগ্রহ কোরে বেড়াচ্ছে !

ভ্রষ্টা-ভগিনীদের এই সাধু চেষ্টা খুব প্রশংসনীয় বটে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের মনে হয় এর আর একটা দিকও ভাব্‌বার আছে। দেশে চাঁদা সংগ্রহ করবার লোকের যখন অভাব নেই তখন সহসা রাজপথে এত অসংখ্য নারীর আবির্ভাব স্বদেশী ও বিদেশী উভয়ের চক্ষেই যেন এই জাতির লজ্জা ও কলঙ্ক বিশেষভাবে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ কোরে দেখিয়ে দেয় !

এই প্রবুদ্ধ নারীশক্তি যদি আজ তাঁদের ওই সেবাপরায়ণ হাত দু-খানি প্রসারিত কোরে পথে পথে চাঁদা সংগ্রহের পরিবর্ত্তে উত্তর বঙ্গের পীড়িত আতুরদের শুশ্রূষার কাজে লাগিয়ে দিতে পারতেন তা হোলে সেইটেই বোধহয় নারীর পক্ষে অধিক শোভন হোতো, তাঁরা যদি মদ্যপান, ধূমপান প্রভৃতি কোনও একটা মন্দ অভ্যাস পরিত্যাগ কোরে সেই সংযমের বিনিময়ে লব্ধ অর্থ এই সৎকার্য্যে

দান করতেন তা হোলেও তাঁদের জীবন ধন্য হোতে পারতো। অন্ততঃপক্ষে তাঁরা যদি নিজেদের মধ্যে একটা কমিটি কোরে অপ্রকাশ্য ভাবে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকদের নিকট হোতে বন্যার সাহায্যার্থে অর্থসংগ্রহ কোরে পাঠাতেন তা হোলেও কোনও ক্ষতি হোতো না, কিন্তু তাঁদের আজ এই দল বেঁধে প্রকাশ্য ভাবে রাজপথে বেরিয়ে গীত বাদ্য করতে করতে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করায় উপস্থিত ক্ষেত্রে প্রচুর অর্থাগম হচ্ছে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে এমন একটা ক্ষতি হোয়ে যাচ্ছে যেটা পূরণ হওয়া অত্যন্ত কঠিন।

দেশের শিক্ষিতা ভদ্রমহিলাগণ আজ সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছেন। বাংলাদেশ বোধহয় এখনও ভোলে-নি যে, শ্রীমতী বাসন্তী দেবী, হেমপ্রভা মজুমদার প্রভৃতি গরীয়সী রমণীরা একদিন দেশের কাজে অন্তঃপুরের বাহিরে বেরিয়ে এসে বাংলায় কি আগুন ছুটিয়ে দিয়েছিলেন! কিন্তু তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরে পতিতা নারীরা যদি এমন ঘন ঘন দলে দলেরাজপথে দেখা দেয় তা হোলে অদূরে ভবিষ্যতে দেশের সাধারণ লোকে আর নারীর আহ্বানের সম্মান রাখতে উৎসুক হোয়ে উঠবে না, কারণ এ-রকম ব্যাপারটা ক্রমশঃ তাদের অভ্যস্ত হোয়ে যাবে।

পরিশেষে আর একটা কথা শুধু বলতে চাই, অপ্রিয় হোলেও এটা খুব স্পষ্ট এবং সত্য কথা যে, এই গীতবাদ্যকারিণী ভিক্ষার্থিনী পতিতা নারীর দল আজ যে এই আশাতীত দান সংগ্রহ করতে পারছেন এর মূলে দাতাদের বন্যার পীড়িতের প্রতি সহানুভূতির চেয়ে এই শ্রেণীর নারীদের প্রত্যাখ্যান করলে পাছে অপমানিত বা লাঞ্ছিত হোতে হয় এই আশঙ্কাটাই খুব বেশী কাজ করছে। আর কতক—লোকে মুক্ত হস্ত হয়েছেন পাপের ছাপ মারা, সমাজ ও সংসার পরিত্যক্তা এই অভাগিনী নারীদের এমন একটা সৎকার্য্য দেখে খুসী হোয়ে তাদের উৎসাহিত করবার জন্যে।

অনেকে হয়ত বলবেন,—সে যাই হোক না কেন, বন্যা পীড়িতদের সাহায্য ভাণ্ডারেই তো টাকাটা এসে পৌঁছবে—তখন আমাদের ওসব দেখবার—আবশ্যক কী? ঠিক কথা, কিন্তু দেশকে বড় কোরে তুলতে হোলে দেশ-বাসীর চরিত্রকে আগে গড়ে তুলতে হবে এবং আজ আমাদের সেই কার্য্যভার তুলে নেবার সময় এসেছে বলেই—সাময়িক উত্তেজনার মোহে হিতাহিত বিবেচনাশূন্য হোয়ে কোনও কাজ করলে চলবে না। ভবিষ্যতের দিকে দৃঢ় লক্ষ্য রেখে আমাদের প্রত্যেকপদ অগ্রসর হোতে হবে।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে

১ম বর্ষ] ১৩৩০ [৯ম সংখ্যা

সচিত্র পাক্ষিক পত্র

কার্য্যালয়
২০৮।২এফ্ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রতিসংখ্যা
এক আনা

বার্ষিক মূল্য ২৵০
দুই টাকা দুই আনা।

১ম বর্ষ]　　১লা বৈশাখ, ১৩৩০　　[৯ম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

অষ্টম সংখ্যা "বৈঠক" প্রকাশিত হওয়ার পর নানা রকম বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় "বৈঠক" প্রকাশ বন্ধ করা হয়েছিল। আবার এ মাস থেকে বৈঠক প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, এবার নিয়মিত ভাবে চালান যাবে। কিন্তু ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে তা বলা যায় না, কাজেই আমরা শপথ কোরে কিছু বলতে পারি-না। যাঁরা "বৈঠকে"র নিয়মিত গ্রাহক তাঁদের কাছে এই অনিয়মের জন্য আমরা ক্ষমা চাইছি। আমাদের অবস্থা বুঝে যেন তাঁরা ক্ষমা করেন।

স্পষ্ট কথা

বাঙালী জাতটা একটা নাটুকে জাত। এই নাটকীয় ভাব আমাদের জাতীয় জীবনে দিনে দিনে যেন আরও স্পষ্টতর হোয়ে ফুটে উঠছে। আমাদের বিশ্ব বিদ্যালয়, আমাদের কংগ্রেস, কনফারেন্স, আমাদের প্রায় সমস্ত প্রতিষ্ঠানেই আসল কাজের চেয়ে অভিনয়ের মাত্রাই বেশী দেখতে পাই। অথচ অভিনয়ের সঙ্গে যেখানে আসল সম্পর্ক সেখানে অভিনয়ের নামে যা হোয়ে থাকে তা বাঙালীর থিয়েটার যাঁরা দেখেন তাঁরাই জানেন।

সম্প্রতি যশোরে বাংলা দেশের প্রাদেশিক কনফারেন্সের অধিবেশন হোয়ে গেছে।

বলা বাহুল্য যে, কনফারেন্সের প্রতিনিধিদের সুখ ও সাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা থেকে আরম্ভ কোরে সভার প্রস্তাব পেশ, পাশ ও সেই সম্পর্কে বক্তৃতাগুলি একেবারে নাটকীয় ভাবে পরিপূর্ণ! কনফারেন্সে প্রতিনিধি যতগুলি গিয়েছিলেন তাঁদের সেবা করবার লোক তার চেয়ে বেশী ছিল। অনেক রাঁধুনী এক সঙ্গে জড় হোলে যে ব্যাপার হয় এখানে তার কিছুই ত্রুটি হয়-নি। অভ্যর্থনা কমিটির ভাইস-চেয়ারম্যান ও স্বেচ্ছাসেবকদলের ভাইস-কাপ্তেনে চাপ্‌ড়া চাপ্‌ড়িও নাকি হয়েছিল।

মহিলাদের বসবার জায়গায় একখানা পাখা ছিড়ে পড়ে গিয়ে একটি মহিলার মাথা খানিকটা কেটে গিয়েছে। স্বদেশী ইঞ্জিনীয়ারের হাতের কাজ যে কি রকম ভদ্র-মহিলার সে অভিজ্ঞতা বোধহয় ইতিপূর্ব্বে ছিল না। যা হোক ভবিষ্যতে কনফারেন্সে যোগ দিতে হোলে তিনি যে অন্ততঃ পাখার নীচে আর বসবেন না, সে কথা নিশ্চয় কোরে বলা যেতে পারে।

সম্প্রতি আমরা ফোটো-প্লে-সিণ্ডিকেট কোম্পানীর বায়স্কোপ দেখতে গিয়েছিলুম। কোম্পানীটি এই নতুন আসরে নেমেছেন। তাঁরা যে পুস্তকটি অভিনয় করেছেন সেখানির নাম "দি সোল অব দি শ্লেভ"। এঁদের অভিনেত্রীরা ইউরোপীয় এবং অভিনেতারা বাঙালী। কোম্পানী নতুন, কাজেই অভিনয় সম্বন্ধে এখন বিশেষভাবে সমালোচনা করা সমীচিন হবে না। তবে বইখানির মধ্যে আগাগোড়া অসামঞ্জস্যে ভরা। বই নির্ব্বাচন সম্বন্ধে এঁরা যদি আরও একটু সাবধানতা অবলম্বন করতেন তা হোলে বড়ই ভাল হোতো।

তাজমহল ফিল্‌ম কোম্পানী—বাঙালীদের অন্যতম বায়স্কোপ কোম্পানী! কিছুদিন আগে এঁরা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আঁধারে আলো গল্পটি অভিনয় কোরে বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সম্প্রতি তাঁরা মানভঞ্জন নামে একটি নাটক অভিনয় করেছেন। তাজমহল কোম্পানী বিজ্ঞাপন দিয়েছেন যে, এটি রবীন্দ্রনাথের গল্প। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের "মানভঞ্জন" গল্পের সঙ্গে এঁদের অভিনীত পুস্তকের খুব কম অথবা একেবারে কোনো সম্পর্ক নেই বল্লেই চলে। রবীন্দ্রনাথের গল্পটি যেমন লেখা আছে তারই দু-এক জায়গায় (বায়স্কোপে যেখানে না হোলেই নয়) একটু পরিবর্ত্তন কোরে সুন্দর অভিনয় করা চল্‌ত। কিন্তু তাঁরা শিব গড়তে গিয়ে এ-ক্ষেত্রে বাঁদর গড়ে ফেলেছেন। বইয়ের সম্বন্ধে বাঙালী কোম্পানীগুলির আরও একটু বেশী নজর দেওয়া উচিত।

বাংলা দেশটি বেওয়ারিশ মাল হোয়ে দাঁড়িয়েছে। এ দেশের বাপ-মা নাই। বিদেশী সওদাগরেরা এখানে যে রকম আড্ডা গেড়েছে ভারতবর্ষের অন্য কোনো প্রদেশে এমন ভাবে বসতে পারে-নি। বিদেশ থেকে ডাকাতের দল এসে এখানে ডাকাতি করে। বিদেশী গুণ্ডারা কলকাতায় এসে কি রকম অত্যাচার সুরু করেছে তা কলকাতাবাসীর কাছে অগোচর নাই। শুধু তাই নয়, বাঙালীর একমাত্র যে অস্ত্র কলম, প্রতিযোগিতায় সে অস্ত্রও তাদের হাত থেকে খসে পড়ছে। সওদাগরী ও সরকারী দপ্তরে আজকাল ভিন্ন প্রদেশবাসী কেরাণীতে ভরপূর। হয়ত একদিন সমস্ত বাংলা দেশের লোককে ফিজিতে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে।

বাংলায় যে এত গুণ্ডা ও ডাকাতের অত্যাচার হয় তার প্রধান কারণ এই যে, এখানে গুণ্ডা ও ডাকাতেরা যত সহজে অত্যাচার করবার সুবিধা পায়, এত সহজে আর কোথাও তা সম্ভব হয় না। গ্রামের কোনো বাড়ীতে ডাকাত পড়লে গ্রামের অন্য লোকেরা চুপ কোরে বসে থাকে। দিনে দুপুরে সহরের বুকের ওপরে টাকা ছিনিয়ে নিলে রাস্তার লোকেরা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে যায়—এ ব্যাপার আর কোনো দেশে এত সহজে ঘটা অসম্ভব।

গুণ্ডা দমন করবার জন্য গুণ্ডা আইন হোলো বটে কিন্তু গুণ্ডারা যেন তাতে আরও বেশী উৎসাহিত হোয়ে পড়েছে। গুণ্ডামি কমে যাওয়া তো দূরের কথা, সাংঘাতিক রকমের গুণ্ডামি বেড়ে উঠেছে। সহর-বাসীদের কর্ত্তব্য এই বিষয়ে বিশেষ সজাগ হওয়া। তারা যদি সজাগ না হয় তা হোলে গুণ্ডা দমন করবার জন্য হাজার রকমের আইন হোলেও কিছুই হবে না।

চোর

(গল্প)

মুচির ছেলে সে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মুখে তার হাসি, প্রাণে তার বিমল আনন্দ—কণ্ঠে তার গান লেগেই আছে। কাজের তার অন্ত নেই, উপার্জ্জনেরও তার সীমা নেই—স্বাস্থ্যও তার তেমনি সুন্দর, পরিপূর্ণ, ভরপূর! সুখীর আর চাই কি?

তারই বাড়ীর পাশে ছিল একজন ধনী, সে ধনরত্নের গুরুভারে অকালবৃদ্ধ হয়ে পড়েছিল, তার মুখে না ছিল হাসি, অন্তরে না ছিল শান্তি, প্রাণে ছিল না গান। এক একদিন সে জুড়ি-গাড়ী হাঁকিয়ে সেই মুচির দোকানের সম্মুখ দিয়ে যায়, আর এক একটা বুক-ভাঙা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে ভাবে—এ কেমন কথা! এই হত-দরিদ্র মুচির ছেলে দিনের পর দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা মনের আনন্দে গান

গেয়ে চলেছে—আর আমি ? আমি লক্ষপতি, কোনো অভাব নেই আমার,—যখন যে বাসনা প্রাণে জাগছে মুহূর্ত্তে তা পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে ! তবু ত আমার অন্তরে একটু গান জেগে ওঠে-না !

একদিন সত্যি-স'ত্য মুচির দুয়ারে তার জুড়ি-গাড়ী এসে থামলো। মুচির ছেলে দু-হাত তুলে সেলাম ঠুকে হাসি মুখে এসে জিজ্ঞাসা করলে—কি চাই হুজুর ? জুতো সারাবেন ? হুজুর বললেন—না হে, না, আমি জানতে চাই বছরে তুমি কত টাকা কামাও ?

সে বললে—হুজুর, ছোটলোক আমরা, এত হিসেব-পত্তর কি আমরা রাখতে পারি ? আমরা দেখি সকাল থেকে সন্ধ্যা আমাদের কাজ কামাই না যায়। এই টুকুই বলতে পারি হুজুর, আমার কাজেরও অন্ত নেই, খাবারেরও অভাব নেই।

—আচ্ছা, বছরের হিসেব না বলতে পার দিনের হিসেব ত দিতে পারবে ?

—কোনোদিন বেশী পাই হুজুর, আবার কোনদিন কম পাই।

ধনী এই নির্ব্বোধ সরল মুচির কথায় হেসে বললেন,—এই নাও, হাত বাড়াও। কোনো-দিন তোমার অসুখ করতে পারে, সেদিন এ তোমার কাজে লাগবে।

মুচির ছেলে গুনে দেখলে থলিতে এক শ টাকা। সে ঘরের ভেতর মাটির নীচে ঐ টাকাটা পুঁতে রাখলে। এত টাকা এক সঙ্গে সে কোনদিন চোখেও দেখে-নি !

* * * *

চিন্তা ভাবনায় সে শুয়ে পড়ল ! দিনের বেলা বেশ কেটে যায়, কিন্তু রাত্রে ত ঘুম আসে না ! চোরের ভয় ! পাছে তার ঐ টাকাটা নিয়ে পালায় ! রাত্রে ইঁদুর নড়ে, বেড়াল লাফিয়ে ওঠে—মুচির ভয়, বুঝি বা কেউ তার টাকার পিছু নিয়েছে !

বেশীদিন সে সইতে পারলে না। একদিন সে ঐ টাকার থলি ধনীর চরণতলায় ছুঁড়ে ফেলে বললে—হুজুর এই নাও তোমার টাকা, —এ আমি চাইনে ;—আমার প্রাণের আনন্দ ফিরিয়ে দাও !

সংবাদপত্রের কথা

(শ্রীপ্রফুল্লকৃষ্ণ ঘোষ)

এ সংসারে ধনী এবং দরিদ্রের সমভাবে উপভোগ্য জিনিষ সংবাদপত্র।

আজ যদি এমন হইত যে দেশে কোন সংবাদপত্র নাই অথচ একজন ধনী বিলাসীর চিত্ত বিনোদনের জন্য আপন ব্যয়ে একটি দৈনিক সংবাদপত্রের ব্যবস্থা করিতে হইতেছে, তাহা হইলে বৎসরের শেষে দেখা যাইত তাঁর কোষাগার প্রায় শূন্য। কিছুদিন এ ভাবে চলিলে তাঁর কুবেরত্ব ঘুচিয়া যাইতে বিলম্ব হইবে না। সুতরাং বৎসর যাইতে না যাইতেই তাঁর খেয়াল মিটিয়া যাইবে।

পরিশ্রম, অর্থব্যয় এবং মস্তিষ্ক পরি-

চালনা করিয়া একখানা দৈনিক কাগজ বাহির করিতে হয়, তাহার তুলনায় দু-পয়সা, চার পয়সা মূল্য একেবারে কিছুই নয় বলিলেই হয়। অনেক সময়ই পত্রিকার যে দাম লওয়া হয়, শাদা কাগজখানির দামও তাতে পোষায় না। একজন প্রসিদ্ধ খবরের কাগজের সত্ত্বাধিকারী দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"শাদা কাগজগুলি ছাপার কালি মাখাইয়া নষ্ট করার জন্য ঐ আমাদের শাস্তি!

কিন্তু এই ক্ষতি সহ্য করিয়াও কেমন করিয়া এই খবরের কাগজগুলি টিঁকিয়া আছে তাহা ভাবিবার বিষয় বটে।

আমাদের দেশে কোন খবরের কাগজ ৮।১০ হাজার বিক্রি হইলেই আমরা খুব বেশী মনে করি কিন্তু য়ুরোপ আমেরিকায় ৮।১০ হাজার বিক্রিকে তারা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য করে-না—অমন কাগজ তারা জনসমাজে বাহিরই করে না। তাদের দেশে এক একখানা কাগজের লক্ষ লক্ষ গ্রাহক—লক্ষ লক্ষ বিক্রি।

যে কাগজের যত বেশী বিক্রি ক্ষতিও তার তত বেশী হওয়ার কথা, কিন্তু সমস্ত ক্ষতি পোষাইয়া যায় বিজ্ঞাপনের টাকা হইতে। বিজ্ঞাপনের জোরেই সব কাগজ শুধু টিঁকিয়া আছে নয়, লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ পর্য্যন্ত করিতেছে।

আমরা ক্ষুদ্র একখানা কাগজ বাহির করিতেই ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া পড়ি, কিন্তু সে দেশে বিরাট সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এক একখানা পত্রিকা কেমন সহজ ভাবে ছাপা হইয়া, ভাঁজ হইয়া, মোড়ক হইয়া বাহির হইতেছে, ভাবিতেও আনন্দ বোধ হয়। আজ সেই কথা লইয়াই একটু আলোচনা করিব।

বিলাতের ষ্ট্যাণ্ডার্ড (The Standard) নামে যে দৈনিক কাগজখানি আছে তাহারই পরিচালনার কথা ধরা যাক। পৃথিবীর এমন কোন দেশ নাই যেখানে তার সংবাদদাতা সংবাদের জন্য ওৎ পাতিয়া বসিয়া নাই। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের এমন কোন সহর নাই যেখানকার সামান্য সংবাদটি পর্য্যন্ত টেলিগ্রামে টেলিফোনে কিম্বা চিঠিতে ষ্ট্যাণ্ডার্ড আফিসে আসিয়া না পৌঁছিতেছে!

তারপর লেখক আছে, সমালোচক আছে। এই লেখক ও সমালোচকদিগের মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ আছে। যিনি যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তিনি সেই বিষয়ে লিখিয়া কিম্বা সমালোচনা করিয়া থাকেন। তার পর সভা-সমিতি হইতে বক্তৃতা প্রভৃতি সংগ্রহ করার জন্য রিপোর্টার আছে। এই সবের উপর আছেন সম্পাদক।

সে দেশে সংবাদের অভাব হয় না—মুস্কিল হয় সংবাদ বাছাই লইয়া। কোনটা রাখা হইবে আর কোনটা বাদ দেওয়া যাইবে তাহা বিচার করাই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

সম্পাদক সঙ্ঘ

পত্রিকার সুর, মতামত এবং উদ্দেশ্য সম্পাদক ঠিক করিয়া থাকেন। বিশেষ

সংবাদগুলি প্রধান সহকারী সম্পাদককে সংগ্রহ করিতে হয়। সাধারণ সংবাদের ভার একজন সহকারী সম্পাদকের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে—প্রতিদিন তাঁকে বড় বড় লোকদের সঙ্গে দেখা করিয়া উপস্থিত কোনও সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত সংগ্রহ কবিবার ব্যবস্থা করিতে হয়, কোনও বিশেষ ঘটনা তদন্ত করিয়া প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হয়।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ, খেলাধূলা, রঙ্গালয়, সহরের সংবাদ প্রভৃতির জন্য এক একজন সহকারী সম্পাদক রহিয়াছেন; তাঁহারা যাঁর যাঁর নিজের অংশটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার চেষ্টাতেই ব্যাপৃত থাকেন, গণ্ডীর বাহিরে কোন বিষয়ে চিন্তা বা চর্চ্চা করিয়া তাঁহারা নিজেদের সময় এবং শক্তির অপচয় করেন না।

আমাদের দেশীয় কাগজগুলির মধ্যে এমন একখানি পত্রিকাও দেখিতে পাই না যে, সে দেশের সামান্য একখানি ইংরেজী দৈনিকের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। সংবাদের বন্দোবস্ত নাই, লেখার বন্দোবস্ত নাই, নূতন তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা নাই। ৫০৲ বেতনের একটি সম্পাদককে হাড়-ভাঙ্গা খাটুনী খাটিয়া সম্পাদকীয় স্তম্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া, ইংরেজী সংবাদগুলির বাংলা তর্জ্জমা, রঙ্গরস, কার্টুণ প্রভৃতি সব কিছুই নিজের করিতে হয়। সুতরাং বেচারী পড়াশুনাই বা করিবে কখন, ভাবিবেই বা কখন? কাজেই আমাদের বাংলা কাগজগুলির ঐ দুরবস্থা।

আমার বিশ্বাস নূতন নূতন সংবাদ সংগ্রহ করিয়া, ভাল লেখার বন্দোবস্ত করিয়া একখানা ভাল বাংলা দৈনিক বাহির করিতে পারিলে অনেকে ইংরেজী কাগজ লওয়া বন্ধ করিয়া দিবেন—যাঁহারা সংবাদের জন্য সংবাদপত্র লইয়া থাকেন তাঁহারা ইংরেজী বাংলা বিচার করিবেন না। বাংলার ধন-কুবেরদের মধ্যে কেহ উদ্যোগী হইলে এ কাজ সহজে সম্পন্ন হইতে পারে।

সংবাদ সংগ্রহ

সংবাদ সংগ্রহের জন্য সে সব দেশে যে সকল এজেন্সি (News Agency) আছে, তাদের আপিসের সঙ্গে সংবাদপত্র আপিসের টিউবের বন্দোবস্ত আছে—কোনও সংবাদ আসিলে তৎক্ষণাৎ তাহা নকল করিয়া ঐ নলের ভিতর দিয়া ঐ কাগজগুলি এক এক আপিসে চালান দেওয়া হয়। নলের ভিতর কাগজ পুরিয়া Pump করিলে বাতাসের সাহায্যে তাহা যথাস্থানে যাইয়া পৌছে। একজন লোক শুধু এই সংবাদগুলি (tube message) সংগ্রহ করিয়া ঠিক সহকারী সম্পাদকের নিকট লইয়া যায়।

প্যারী, নিউ-ইয়র্ক প্রভৃতি বিখ্যাত স্থানগুলির সঙ্গে পত্রিকা আপিসের জন্য আলাদা টেলিগ্রাফের তার রহিয়াছে—টেলিগ্রাফ-অপিস প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় কয়েক ঘণ্টার জন্য বিখ্যাত পত্রিকাগুলিকে এই তার ব্যবহার করিতে দিয়া থাকেন।

সংবাদ বিতরণ

চিফ্ সহকারী সম্পাদক সংবাদগুলি লইয়া কর্ম্মচারীদের মধ্যে তাহা বিতরণ করিয়া দেন—তাহারা সেগুলি ভাষায় সাজাইয়া ফেলে। সংবাদ-সম্পাদক কোন্ বিষয়ের আলোচনায় কতটুকু স্থান যাইবে মোটামুটি তার একটা খস্ড়া প্রস্তুত করিয়া প্রধানের হাতে দিয়া যান। কিন্তু এ-সব স্থান বিভাগের বিশেষ কোন মূল্য নাই। হঠাৎ কোন লোমহর্ষণ ঘটনা, রেল-সংঘর্ষ, ভীষণ ভূমিকা কিম্বা কোন দেশবিখ্যাত মহাপুরুষের মৃত্যুসংবাদ যে কোনও মুহূর্ত্তে আসিয়া পৌছিতে পারে—তখন অন্য সংবাদ ফেলিয়া দিয়া তাহারই স্থান করিতে হয়।

বিশেষ কোন রাজনৈতিক সংবাদ রাত্রের শেষ মুহূর্ত্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়া পত্রিকার চেহারা একেবারে বদলাইয়া দিতে পারে। আমেরিকার নিউইয়র্ক হেরল্ড (The New York Herald) সংবাদ পত্রবাহী এক্স্প্রেস্ ট্রেণ ছাড়িবার মাত্র ১৫ মিনিট পূর্ব্বে খবর পাইল যে মহাত্মা গ্ল্যাডষ্টোনের মৃত্যু হইয়াছে। এত বড় একটা গুরুতর সংবাদ না দিতে পারিলে কাগজের মর্য্যাদাহানি ঘটে! কিন্তু সময় ত মাত্র ১৫ মিনিট! কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই গ্ল্যাডষ্টোনের ছবি, জীবনী সব ছাপা হইয়া ট্রেণ ছাড়িবার পূর্ব্বেই কাগজ ষ্টেশনে যাইয়া পৌছিল! বিখ্যাত লোকদের জীবনী সংবাদ-পত্র আপিসে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকা আপিসের লাইব্রেরীর একদিকের দেয়ালে শুধু এই দেশবিশ্রুত লোকদের জীবনী সজ্জিত রহিয়াছে।

কম্পোজ-ঘরে

সহকারী সম্পাদকগণ কোন্ বিষয় কোন্ অক্ষরে ছাপা হইবে তাহা লিখিয়া কম্পোজ ঘরে পাঠাইয়া দেন, সেখানে হাতাহাতি উহা ছাপাইবার জন্য প্রস্তুত করিতে বেশী বেগ পাইতে হয় না। ষ্টাণ্ডার্ড আপিসে গড়ে প্রতিরাত্রে ৭৫ জন কম্পোজিটার কাজ করে! অধিকাংশ কাজই লিনোযন্ত্রে (Linotype Machine) হইয়া থাকে। শুধু শেষ রাত্রে যে সব সংবাদ আসিয়া পৌছে তাহা তাড়াতাড়ি হাতে কম্পোজ করা হয়।

কম্পোজ শেষ হইয়া গেলে ফর্ম্মা আঁটা হয় এবং প্রত্যেকটি কলের সাহায্যে (lift) নীচে ফাউণ্ড্রীতে (Foundry) পাঠান হয়। রোটারী যন্ত্রে ছাপাইতে হইলে অক্ষরগুলি অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সাজাইতে হয়, কিন্তু লিনোযন্ত্রে সেরূপ সম্ভবপর হয় না, কাজেই এক একটি পৃষ্ঠা আবার ছাঁচে ঢালিয়া ঐ ভাবে বাঁকাইয়া লইতে হয়। যদি হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া কোন একটি পৃষ্ঠা নষ্ট হইয়া যায় সেই আশঙ্কায় প্রত্যেক পৃষ্ঠার দুইটি করিয়া ছাঁচ তোলা হয়।

মিনিটে ১৬০০ কপি

এ পর্য্যন্ত কাজ ধীরে ধীরেই চলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু একবার যন্ত্রের কবলে আসিয়া পড়িলে হুড়হুড় করিয়া কাজ অগ্রসর হয়। ষ্টাণ্ডার্ড প্রতি মিনিটে ৮০০ কপি ছাপা হইয়া, ভাঁজ হইয়া, গোণা হইয়া এক একটা প্যাকেট বাহির হইয়া আসে। জন কয়েক লোক ইহা সংগ্রহ করিবার জন্য নিযুক্ত থাকে। ছাপা এবং কালি ঠিকমত লাগিতেছে কি না তাহা দেখিবার জন্য লোক আছে এবং প্যাকেটগুলি লিফ্‌টে চাপাইয়া পাবলিশিং ঘরে পাঠাইবার জন্যও লোক আছে।

এই ষ্ট্যাণ্ডার্ড অপেক্ষাও দ্রুত ছাপা হয় এমন ছাপাখানাও বিলাতে আছে। ১২ পৃষ্ঠা খবরের কাগজ ঘণ্টায় ১ লাখ করিয়া দু-পিঠ ছাপা হইয়া, কা[illegible] হইয়া, ভাঁজ হইয়া, গোণা হইয়া প্রেস হইতে বাহির হইয়া আসে। অর্থাৎ ষ্ট্যাণ্ডার্ড যে বেগে ছাপা হয় তার চাইতে দ্বিগুণের বেশী বেগে এ প্রেস চলে—মিনিটে ১৬০০র চাইতেও বেশী ছাপা হয় এবং যে কাগজ এই প্রেসের ভিতর দিয়া চলে তার গতি ঘণ্টায় ৩৩ মাইল।

চিত্রে কিম্বা ভাষায় এই সব যন্ত্রের শক্তি এবং গতির পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নয়। যন্ত্র-দৈত্যের হট্টগোলে কান বধির হইবার উপক্রম হয়।

সহরে বিতরণ

আপিসের বাহিরে অসংখ্য গাড়ী এবং সাইকেল অপেক্ষা করিতে থাকে। পত্রিকা বাহির হইবা-মাত্র তাহা লইয়া তাহারা মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সহরময় ছড়াইয়া পড়ে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ফেরিওয়ালাদিগের নিকট কাগজ বিতরণ সাইকেলের সাহায্যে হইয়া থাকে। পত্রিকা আপিসের গাড়ী আছে—এজেণ্ট এবং পুস্তক-বিক্রেতাদের দোকানে দোকানে এই সব গাড়ীর সাহায্যে পত্রিকা বিতরণ করা হয়।

আয়-ব্যয়

এইরূপ এক একখানি পত্রিকা পরিচালনা করিতে কিরূপ খরচ লাগে আমরা তাহা অনুমান করা দূরে থাক ধারণাই করিতে পারি না। বিলাতের Daily Mail খানি ছাপিতে ৩০০ মণ কালি ১০,০০০ দশ হাজার মাইল লম্বা কাগজ খরচ হয়। কিন্তু খরচ যেমন হয়, আয়ও তার তেমনি। ও সব ব্যবসা বাণিজ্যের দেশ—বিজ্ঞাপনের মূল্য তারা বুঝে। আমাদের দেশের ব্যবসায়ীদের মত তাহারা বিজ্ঞাপনের খরচটাকে বাজে খরচ মনে করে না। কাজেই আমাদের দেশের মত বিজ্ঞাপনের অভাবে সে দেশের কাগজ উঠিয়া যায় না। বিজ্ঞাপনের জোরেই সে দেশের ঐ সব বড় বড় কাগজগুলি এমন ভাবে চলিতে সমর্থ হইতেছে।

আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, Standard, Evening Standard, St. James Gazette, Daily Express এবং আরো কতকগুলি মাসিক এবং সাপ্তাহিক কাগজ একই ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে। এই শক্তিশালী পুরুষের নাম আর্থার পিয়ারসন। আমাদের দেশেও হয়ত অমন শক্তিশালী পুরুষ রহিয়াছেন, কিন্তু শক্তি বিকাশের স্থানাভাব বশতঃ তাঁহাদের পরিচয় কেহ পাইতেছি না।

যে দু-একখানি বাংলা দৈনিক কাগজ আছে তাহাও ক্ষীণপ্রাণ,—ইংরেজী কাগজের তর্জ্জমা মাত্র! যাঁহাদের শক্তি, উৎসাহ এবং উদ্যম রহিয়াছে তাঁহারাও অর্থাভাবে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। বাংলার ধন-কুবেরগণ মুক্তহস্ত হইয়া দেশের এ অভাব পূরণের চেষ্টা করিলে দেশের ও দশের প্রকৃত উপকার করা হইবে, অথচ নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না। প্রথম যে অর্থ বাহির করিয়া দিবেন সময়ে সুদে আসলে তাহা ফিরাইয়া পাইবেন।

মমির অভিসম্পাত

টুটান খামেনের সমাধি-মন্দিরের শান্তি যারা নষ্ট করেছে তাদের জন্য বোধহয় কোথাও কোনো অভিসম্পাত লেখা আছে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরা দেখতে পাবে লর্ড কার্নারভনের মৃত্যুর মধ্যে ঐ অভিসম্পাতের বীজ লুকিয়ে আছে।

সার উইলিয়ম ফ্রান্সিস বাট্‌লার তাঁর আত্ম-জীবন চরিতে তাঁর এক পরিচিত বন্ধু সম্বন্ধে লিখেছেন,—'নীল নদ দিয়ে যাবার পথে তাঁর খেয়াল হলো সেখানকার কবর ভেঙ্গে মমি বার করতে হবে। যেই কথা সেই কাজ। এইখানে তিনি একটি অতি উৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর মমি উদ্ধার করে প্যাক করে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেন। তারপর তিনি শীকার খেলায় মত্ত হয়ে সোমালীল্যাণ্ডে চলে যান; সেখানে এক জংলী হাতী তার প্রাণ বিনাশ করে। তখন তাঁর মৃতদেহ আবিসিনিয়ার এক নদী মধ্যস্থ কোন দ্বীপে কবরস্থ করা হয়। বন্ধুবান্ধরা তাঁর মৃতদেহ ইংলণ্ডে তুলে নিয়ে যাবার মতলব করে লিখে পাঠান। কিন্তু এমন সময় এক ভীষণ বন্যা এসে সমস্ত দ্বীপ খানি এম্নি করে ভাসিয়ে নিয়ে গেল যে তারপর আর সে কবরের সন্ধানই খুঁজে পাওয়া গেল না।

এর মধ্যে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা মমির সঙ্গে যে সব কাগজ পত্র ছিল তাই পড়ে দেখতে পেলেন তাতে লেখা রয়েছে :—

(যে এই সমাধির শান্তি নষ্ট করবে দেবতারা তাকে পরিত্যাগ করবেন, আর তার মৃত্যুর পর নদীর জল প্রতিহিংসায় ফুলে উঠে বন্যার স্রোতে তার অস্থি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে,

আর তার দেহ ধুলো হয়ে আকাশে বাতাসে মিশে যাবে।)

বেচারী জানত না এতবড় অভিসম্পাত তার জন্ম ঐ মমির বুকে লুকিয়েছিল।"

সার উইলিয়ম একজন আমেরিকান পাদ্রীর বই—The Land and the Book থেকে আর একটা ঘটনার উল্লেখ করেছেন। সিডন থেকে একজন ফিনিসীয় রাজার মৃত দেহ উদ্ধার করে বিশেষ যত্ন সহকারে ফরাসী সম্রাট লুই নেপলিয়নের কাছে বাক্স-বন্দী করে পাঠান হয়। মমির যে পাথরের কফিন্ তার ঢাক্নার মুখে এই অভিসম্পাত লেখা ছিল—

"কোন রাজ কর্ম্মচারী বা অপর কেহ আমার এ কবর খুলবে না, আমার এই সমাধি-শয্যার আধার এই পাথরের কফিন কেউ সরাবে না। তা যদি কেউ করে, তবে দেবতারা সেই রাজার এবং কর্ম্মচারীদের মাথা কেটে ফেলবেন—শুধু তাই নয়, রাজাই হোক আর কেউ হোক তার ভবিষ্যৎ বংশ লোপ পাবে—সে বংশের বীজ আর কোথাও অঙ্কুরিত হবে না, কিম্বা ফলে ফুলে সুশোভিত হবে না—কারণ আমাকে আমার বিশ্রামের শান্তি থেকে টেনে এনে চলন্ত নদীর মত ছেড়ে দেওয়া হবে—এত হতভাগ্য আমি!"

মিশনারী লিখেছিলেন—'ফরাসী সম্রাট লুই নেপলিয়ানকে এই অভিসম্পাতের জন্য কোন প্রকার উদ্বেগ সহ্য করতে হবে না।

সার উইলিয়ম বাটলার লিখেছেন—'ঐ আমেরিকান মিশনারী যদি তাঁর ঐ লেখার পর আর বারো বৎসর মাত্র বেঁচে থাকতেন তবেই দেখতে পেতেন, ঐ অভিসম্পাত অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল কি না! লুই নেপলিয়নের কি দুর্দ্দশা ঘটেছিল তা ইতিহাস পাঠক মাত্রেরই জানা আছে। মিশনারী সাহেব আর কটা দিন বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই অন্য দিকে তাঁর কলম চালাতে হত।

কবির ক্রোধ

ওমর খৈয়মের বিখ্যাত ইংরেজী অনুবাদক এডয়ার্ড ফিটজেরাল্ডের কতকগুলি চিঠি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মিঃ এলডিস্ রাইট প্রকাশ করেন। তার ভিতর একখানা চিঠিতে লেখা ছিল—'মিসেস ব্রাউনীংএর মৃত্যু আমাকে খুবই আরাম দিচ্ছে,—ভগবানকে ধন্যবাদ আর Aurora Leighs এর মত কাব্য পড়বার দুঃখ ভোগ করতে হবে না। মিঃ ব্রাউনীং এই হৃদয়হীন উক্তি দেখে এতই চটে গিয়েছিলেন যে, 'এথিনিয়াম' পত্রে তিনি তার পাল্টা গাইলেন—তার শেষ ক-লাইনে ছিল :—

"Kicking you seems the
common lot of curs—
While more appropriate
greetiug lends you grace.

Surely to spit there
glorifies your face—
Spittnig form lips
once sanctified by hers."

এর বাংলা তর্জমা করা যেতে পারে এই ভাবে,—

'তোমার ভাগ্যে কুকুরেরই মত
পদাঘাত আছে লেখা,
ঐ সে যোগ্য সমাদরে তোমা
সুন্দর যায় দেখা।
থুথু দিলে ওই মুখের ওপরে
তব গৌরব বাড়ে,—
তাহারই পরশে পবিত্র করা
ঠোঁট যদি থুথু ঝাড়ে।"

ব্রাউনীং বেঁচে থাকতেই এমন একটা কথা সাধারণে প্রকাশ করে দিয়ে তাঁকে যে যে ব্যথা দেওয়া হয়েছে এটা বুঝতে পেরে মিঃ রাইট দুঃখিতও হলেন, একটু ভয়ও খেলেন। তিনি তাই তাড়াতাড়ি প্রকাশ্যে ত্রুটি স্বীকার করে বসলেন। তা দেখে মিঃ ব্রাউনীং একটু ঠাণ্ডা হয়ে তিনি তাঁর সনেট সংগ্রহের পরবর্ত্তী সংস্করণে ঐ কবিতাটা আর ছাপেন-নি। তিনি একথা স্বীকারও করেছিলেন যে ফিট্জেরাল্ডের চিঠি পড়ে এমন তাঁর রাগ হয়ছিল যে ঝোঁকের মাথায় ঐ কড়া জবাব লিখে ফেলেছিলেন। কিন্তু একথা তিনি কোনো দিনই স্বীকার করেন-নি যে, অমন লেখা তার পক্ষে অন্যায় হয়েছিল।

কানের বিচিত্র বোধশক্তি

ফোর্ডের মোটর গাড়ীর সঙ্গে আমাদের দেশের অনেকের পরিচয় আছে। মিঃ হেনরী ফোর্ড মোটর গাড়ীর কারবারে লক্ষপতি হয়ে উঠেছেন। এঁর সম্বন্ধে তাঁর এক বন্ধু আমেরিকার এক পত্রিকায় লিখেছেন—'কয়েক বছর আগে ডেট্রয়েটের ব্যবসায়ী-সঙ্ঘ সেণ্টমেরী নদীতে এক ষ্টীমার-বিহারের আয়োজন করেন। মিঃ ফোর্ড এই পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন।

ডেকের উপর বসে গল্প হচ্ছিল। হঠাৎ দেখা গেল মিঃ ফোর্ড কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে উঠেছেন;—পাশ দিয়েই আর একখানা ষ্টীমার যাচ্ছিল, মিঃ ফোর্ডের লক্ষ্য যেন সেই দিকে। তাঁর ভাব দেখে মনে হল যেন ঐ জাহাজখানির এঞ্জিনের চলন শব্দ তাঁর কানে ঝঙ্কার দিচ্ছে। তিনি বলে উঠলেন—'হাঁ, তাই ত, বছরখানেক আগে আমারি সাহায্যে যে ঐ এঞ্জিন তৈরী হয়েছিল, কিন্তু এ জাহাজে ত এটা বসান হয়-নি। বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন —'তুমি কি করে বুঝলে?' তিনি উত্তর করলেন—'আমি ওর আওয়াজ শুনলেই বুঝতে পারি। যারা ভালবাসে এবং বোঝে এঞ্জিন তাদের সঙ্গে মানুষের মতই কথা বলে। তারপর সন্ধান নিয়ে জানা গেল যে ঠিকই ঐ এঞ্জিন ফোর্ড সাহেবের সাহায্যে তৈরী হয়েছিল কিন্তু ঐ জাহাজের জন্য নয়।

কানের বাহাদুরী আছে বলতে হবে।

উকীলহীন দেশ

দেশে আইন আছে অথচ উকীল নেই, সেও কি সম্ভব? হাঁ, তা সম্ভব। এই পৃথিবীর এক কোনেই সে দেশ অবস্থিত, আর তা খুব দূরেও নয়। ইংরেজেরই রাজত্ব সেই দেশে—ইংরেজেরই আইন সে দেশে প্রচলিত, তবু সে দেশে উকীল নেই।

সে দেশের নাম ব্রিটিশ-উত্তর-বোর্ণিও। —এর আয়তন প্রায় আয়র্ল্যাণ্ডের সমান —এত বড় রাজ্যটাতে মাত্র একজন উকীল! কিন্তু তাই বলে কি আপিস আদালতের কাজ বন্ধ আছে! তা নয়, সে সব কাজ পূরাদমেই চলছে!

সে দেশে মামলা মোকদ্দমা বড় সহজে এবং অতি সামান্য ব্যয়ে মিটে যায়। মনে করুন টাবিকোর বাড়ী পাহাড় অঞ্চলে—সে তার প্রতিবেশী পুল্লঙ্গার কাছে পঁচিশটা টাকা পাবে,—একটা গরুর দরুণ। অনেক বলা কওয়াতে পুল্লঙ্গা যখন গ্রাহ্যই করলে না, তখন বাধ্য হয়েই টাবিকোকে আদালতের শরণাপন্ন হতে হল। পুলিশ সার্জ্জেণ্টের কাছে সে তার দুঃখের কথা জানালে—সার্জ্জেণ্ট সাহেব উপদেশ দিলেন কেরাণী বাবুর কাছে নালিশ রুজু করে দাও। কেরাণী বাবু একজন চীনাম্যান!

ঘটনা শুনে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শমন বার করবার হুকুম দিলেন। এই শমনের জন্য এবং এই মামলার অন্যান্য সব খরচ ধরে টাবিকোর লাগবে ৩৲ টাকা।

নির্দ্দিষ্ট দিনে উভয়পক্ষ সাক্ষী নিয়ে উপস্থিত হবে—জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটই বিচার করে থাকেন। তিনি প্রথম টাবিকোর সাক্ষীদের জবানবন্দি নেবেন, তার পর শুনবেন পুল্লঙ্গার কথা। জেরার পর জেরা করে ম্যাজিষ্ট্রেট সত্য উদ্ধারের চেষ্টা করবেন এবং তারপর রায় দেবেন। মামলা যদি জটিল হয় এবং অনেকদিন ধরেও যদি বিচার চালাতে হয় তবু টাবিকোর খরচ ৩৲ টাকার বেশী লাগবে না। মামলা যদি সে জিতে যায় তবে এই টাকাটাও সে পুল্লঙ্গার কাছ থেকে ফিরে পাবে। আর যদি হেরে যায় তবে ঐ তিন টাকাই তার ক্ষতি, ওর বেশী নয়। উকিলের বিল শুধ্‌তে তাকে আর হয়রান হতে হবে না।

আর একটা ঘটনার কথা শুনুন! মনে করুন গ্রামে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে লিমাঙ্গ তাড়ী খেয়ে তার পুরাণো শত্রু আন্‌সানের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছে। ঝগড়া ত ঝগড়া! মুখোমুখি ছেড়ে শেষকালে হাতা-হাতি—ঘুষোঘুষি! ফলে নাসিকা থেকে রক্ত পাত এবং ঘোলাটে চক্ষু।

তখন আন্‌সান্‌কে ছুটে ওপিসে যেতেই হবে—জেলা কোর্টকে ওরা 'ওপিস' বলে। এবার ফৌজদারী মামলা সুরু হল। ফলে লিমাঙ্গের জরিমানা হবে, তার খানিকটা

আনুসানকে দেওয়া হবে,—ঐ কীল হজম করার জন্য। এই ফৌজদারী মামলা চালাতে আনসানের খরচ লাগবে ১।/০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সে দেশে উকীল মোক্তার নেই বলেই ম্যাজিষ্ট্রেকে উভয় পক্ষের ওকালতী ব্যারিষ্টারী সব করতে হয়।

আমাদের বাংলা দেশ থেকে এই উকীল মোক্তারদের নির্ব্বাসন দিলে হয় না? অন্না-ভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ বাংলার তরুণ উকীল সম্প্রদায় শামলা মাথায় বটতলায় ঘোরা-ঘুরি না করে একবার চুপি চুপি ব্রিটিশ সোর্ণিওতে গিয়ে নসিবটা পরখ করে দেখে আসলে মন্দ হবে কি?

আমাদের সমাজ

সম্প্রতি কাশীতে একটা ঘটনা হোয়ে গেছে। একটি যুবক জাতিতে সে ব্রাহ্মণ, এদেশ থেকে বিয়ে কোরে স্ত্রী নিয়ে কাশীতে বাস করছিল। স্ত্রীর বাড়ীর লোকেরা বিয়ের সময় তাদের যা দেবে বলেছিল তা দিতে পারে-নি, যুবক তবুও বিয়ের রাতে একটা কেলেঙ্কারী না কোরে তাকে বিয়ে কোরে নিয়ে যায়। কিন্তু বাড়ীতে গিয়ে তার আর ততখানি উদারতা রইলো না, সেখানে সে তার স্ত্রীর অভিভাবকদের অন্যায় ব্যবহারের জন্য প্রথম প্রথম গঞ্জনা শেষে প্রহার পর্য্যন্ত আরম্ভ করলে। যুবকের পিতা বর্ত্তমান নেই, তার মাতা আছেন, তিনি পুত্রের অন্যত্র বিবাহ দেবার জন্য খোঁজ খবর করতে লাগলেন। কিন্তু ঘরে একটি বৌ আছে শুনে বরের তেমন দর পাওয়া যাচ্ছিল না বলে শুভকার্য্য তখনো সমাধান হয়-নি। এদিকে বৌ নিজে কিছু ঘরে আনে-নি এবং অন্য আর একটি বৌ যে কিছু ঘরে নিয়ে আসবে তারও অন্তরায় হোয়ে রইল এই কথা মনে কোরে শাশুড়ী দিনে দিনে পুত্রবধূর ওপরে আগুন হোয়ে উঠতে লাগলেন, এবং মধ্যে মধ্যে আহার বন্ধ করতে আরম্ভ করলেন। সেই পাড়ায় একটি আধাবয়সী লোক বাস করতেন, এই লোকটির সেই যুবকদের সঙ্গে আত্মীয়তা ছিল। যুবক একে খুড়ো বলে ডাকে। এই লোকটির কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে; মধ্যে মধ্যে দেশে যান, তবে বছরের মধ্যে বেশীর ভাগ সময়ে কাশীতেই বাস করেন। একদিন বৌ-টি ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হোয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে এই বাড়ীতে চলে আসে এবং তাকে সমস্ত কথা খুলে জানায়। পরের ঝক্কি এইভাবে মাথার ওপর এসে পড়ায় খুড়ো বেচারী তো প্রথমটা বিব্রত হোয়ে পড়লেন। তাঁর বাড়ীতে পরের যুবতী ভার্য্যা থাকবে অথচ বাড়ীতে অন্য কোনো স্ত্রীলোক নেই এই সব ভেবে চিন্তে তিনি বাবাজীকে গিয়ে সব কথা খুলে বলে বৌকে নিয়ে যেতে বল্লেন। কিন্তু বাবাজী বল্লেন—যে বৌ ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছে তার সঙ্গে আর তার কোনো সম্পর্ক নেই।

খুড়ো আর কি করেন, বৌটি তাঁর বাড়ীতেই রইলো, সে মলো কি বাঁচলো বাবাজী তার আর কোনো খোঁজই করলেন না।

মাস দুই পরে দেখা গেল যে বাবাজী আর একটি নতুন বৌ ঘরে নিয়ে এলেন।

ইতিমধ্যে খুড়োর সঙ্গে সেই মেয়েটির অবৈধ প্রণয় হয় এবং তারা দুজনে স্বামী স্ত্রীর মত বাস করতে থাকে। ব্যাপারটা সকলের কাছেই জানা হোয়ে যায় এবং খুড়ো এ বিষয়ে কোনো লুকোচুরীও করতো না।

এই রকম ভাবে প্রায় দু-বছর কেটে যায়। ইতিমধ্যে একদিন ভাইপো খুড়োর কাছে এসে বল্লে যে, তার স্ত্রীর সঙ্গে যে যেভাবে বাস করছে, তাতে তার নামে ফৌজদারী মামলা উপস্থিত করবে। খুড়ো উকিলের পরামর্শ নিয়ে জানলেন যে, ভাইপোর কথাই ঠিক। সে তার নামে নালিশ করলে আইন অনুসারে তার বিষম দণ্ড হবে। খুড়ো তাড়াতাড়ি টাকা চাপা দিয়ে তখনকার মতন ভাইপোর ক্রোধের শান্তি করলেন। ভাইপো তখনকার মতন শান্ত হলেন বটে, কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই আবার টাকা দাবী করলেন। বার পাঁচ ছয় এই ভাবে টাকা দেওয়ার পর ব্যাপার সুবিধা নয় বুঝে খুড়ো সেখান থেকে চম্পট দিলেন। এদিকে সেই যুবক সন্ধান কোরে কোরে আবার খুড়োকে গ্রেপ্তার করেছে ও এবারে বেশ মোটা টাকা আদায় করেছে—এই সর্ত্তে যে, ভবিষ্যতে আর তাকে টাকার জন্য জ্বালাতন করলে না।

পত্নী বিক্রয়ের আরও গোটা দুই ঘটনা আমরা জানতে পেরেছি। আমরা ক্রমে তা প্রকাশ করবো। 'বৈঠকে'র কোন পাঠক কিংবা পাঠিকা এই সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার সম্বন্ধে যদি কিছু বলতে চান আমরা সানন্দে তা পত্রস্থ করবো।

বার্লিনে অবনীন্দ্রনাথ

বাংলা দেশের শিক্ষিত সমাজের কাছে ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম বিশেষ ভাবে পরিচিত। তিনি যে কেবল রেখা দিয়ে ভাবের রূপকে বেঁধেছেন তা নয়, তাঁর ভাষাতেও ভাব বাঁধা পড়েছে। বাংলার এই শিল্পী ইউরোপেও বিশেষ ভাবে পরিচিত। সম্প্রতি বার্লিনের ন্যাশন্যাল গ্যালারীর উদ্যোগে একটা চিত্র শিল্প প্রদর্শনী খোলা হয়েছে। এই প্রদর্শনীতে যে সব চিত্র রাখা হয় প্রথমতঃ সেগুলি সেখানকার গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারীরা তার বিচার করেন। লক্ষ লক্ষ ছবি থেকে তাঁরা কয়েকটি মাত্র ছবি মঞ্জুর করেন। তার পরে তাঁরা যে ছবিগুলো মঞ্জুর করেন সেগুলো আবার আর একদল সমালোচকে মিলে বিচার করেন। এই দুবার পরীক্ষা উৎরে তবে তারা প্রদর্শনীতে স্থান পায়।

এবার আমাদের দেশের কয়েকজন চিত্রকরের চিত্র এই প্রদর্শনীতে স্থান

পেয়েছে। কলকাতা সহরের নামজাদা চিত্র সমালোচক শ্রীযুত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও বার্লিন-প্রবাসী অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার উদ্যোগ কোরে আমাদের দেশের এই চিত্র সেখানে নিয়ে গিয়েছেন। সেখান থেকে সংবাদ এসেছে ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্র দেখে সেখানকার সমালোচকরা মুগ্ধ হোয়ে গিয়েছেন। শুধু সমালোচক নয়, ধনী, দরিদ্র, সমালোচক, রসিক, অরসিক যারাই এই প্রদর্শনী দেখতে আসছে, সবার মুখেই এক কথা—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে?

জার্ম্মাণ গণক ঠাকুর

কলকাতার সহরে কলেজ ষ্ট্রীট, বৌ-বাজার লালদীঘির ধারে সব পশ্চিমা গণক ঠাকুরদের বসে থাকতে দেখা যায়। এরা বিশেষ কোরে নিরক্ষর অজ্ঞ লোকদের সামনে খড়ির আঁক কেটে তার ওপরে কড়ি ফেলে ভুত, ভবিষ্যত বর্ত্তমান বলে দিয়ে বেশ দু-পয়সা রোজগার করে। শুধু যে অজ্ঞ লোকেরাই এদের পাল্লায় পড়ে এমন নয়, অনেক লেখাপড়া জানা লোককেও তাদের সামনে বসে হাত দেখাচ্ছে এমন দৃশ্যও দুর্লভ নয়। হাত দেখান ও নিজের ভবিষ্যত জানবার ইচ্ছা যে শুধু আমাদের দেশের লোকেদেরই আছে তা নয়, এ দুর্ব্বলতা পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমানভাবে আছে। এমন কি ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশ যে জার্ম্মানি সেখানকার রাজধানী বার্লিন সহরের পথে এই রকম গণক ঠাকুর দাঁড়িয়ে থাকে আর তারা লোকদের ভবিষ্যত বলে দিয়ে বেশ দু-পয়সা রোজগারও করে।

বার্লিনের পথে আর একটি লোক থাকে সে যদিও গণক নয়, তবে সে গণকদের চেয়ে ঢের বেশী ওস্তাদ। এই লোকটি সামনে একখানা বড় টেবিল রেখে দেয় ও লোকজন জমলে কি সব অবোধ্য ভাষা উচ্চারণ কোরে ডান হাতের তর্জ্জনীর ডগাটা টেবিলের ওপরে চেপে ধরে। কিছুক্ষণ এই ভাবে ধরে রাখবার পর সে আঙুলটা তোলে আর সঙ্গে সঙ্গে সেই অতবড় ভারী টেবিল সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসতে আরম্ভ করে। এই ভাবে সে লোকদের মনে বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়ে বলে যে, সে এমন বিদ্যা জানে যাতে পরলোকের সমস্ত খবর জানতে পারা যায়। যাদের আত্মীয়-স্বজন পরলোকে গিয়েছে তারা যদি তাদের সম্বন্ধে কিছু জানতে চায়, অথবা তাদের কাছে যদি কিছু খবর পাঠাবার প্রয়োজন হয়, তা হোলে সে কাজ সে কোরে দিতে পারে। বলা বাহুল্য, প্রিয়-জন মরে গেলে লোকে স্বভাবতঃই তাদের সংবাদ জানবার জন্য আকুল হোয়ে থাকে। এই লোকটি টাকা নিয়ে ইহ-পরলোকের দূতগিরী করে। প্রত্যেক খবর পাঠাতে আর খবর আনতে আলাদা ফি লাগে। এই উপায়ে লোকটি প্রত্যহ বিস্তর টাকা রোজগার করে। আমাদের দেশের কেউ এখনো এ ব্যবসাটায় হাত দেয়নি, যদি কেউ তালমাফিক সুরু করতে পারে তা হোলে তার বেশ দু-পয়সা হোতে পারে।

মোপাসাঁর মৃত্যুর কারণ

ফ্রান্সের বিখ্যাত লেখক গী দ্য মোপাসাঁর নাম পৃথিবীর প্রত্যেক শিক্ষিত লোকই জানেন। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি পাগল হোয়ে গিয়েছিলেন, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পাগলা গারদেই মারা যান। তাঁর মত লোক হঠাৎ কেন যে পাগল হোয়ে গেলেন সে সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলে, কিন্তু আসল কারণ এখনো রহস্যের আবরণে আবৃত রয়েছে। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি এক নারীর সম্পর্কে এসেছিলেন। এই নারী সম্বন্ধে অনেক কানাঘুষা শুনতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু কেউ স্পষ্ট কোরে কিছুই বলে-নি। Francois Tassart মোপাসাঁর চাকর ছিল। সে ১৮৮৩ থেকে ১৮৯৩ পর্য্যন্ত তাঁর সেবা করেছিল। Tassart ১৯১১ অব্দে মোপাসাঁ সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেছিল। এই পুস্তকে সে এই নারীটি সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানের সঙ্গে গুটিকতক কথা লিখেছে! সাবধানে লিখিলেও তার লেখার ভিতর দিয়ে এই নারীর ওপরে তার ক্রোধ ফুটে বেরিয়েছে। মোপাসাঁ ১৮৯১ অব্দে বড়দিনের সময় তাঁর মার কাছে গিয়ে থাকবেন বলে কথা দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি সেখানে না গিয়ে দুইজন রমণীর সঙ্গে অন্য জায়গায় চলে যান। এই দুইটি নারীর মধ্যে একজন সেই নারী। এইখান থেকে ফিরে এসেই তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষন বিশেষরূপে ফুটে উঠতে থাকে। এখান থেকে ফিরে দুই সপ্তাহের মধ্যে তিনি দুই-দুইবার আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেন। Tassart বলে যে, সেদিন রাত্রি বেলা সে ও তার মনিব 'Bel Ami' নামক জাহাজে ভ্রমণ করছিলেন এমন সময় মোপাসাঁ ছুটে এসে তাকে বল্লেন যে, তিনি গলায় ছুরি দিয়েছেন। মোপাসাঁর সর্ব্বাঙ্গে রক্ত। Tassart তখুনি ডাক্তার ডাকিয়ে তাঁর ক্ষতস্থান সেলাই করবার বন্দোবস্ত কোরে দিলে। এরই কয়েকদিন পরে আর এক রাত্রে তার মনিব হঠাৎ চীৎকার কোরে উঠলেন—যুদ্ধ বেধেছে! তিনি মনে করেছিলেন যে, জার্ম্মানির সঙ্গে আবার ফরাসীদের লড়াই বেধে গিয়েছে।

এর পরেই তাঁকে পাগলা গারদে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়। পাগলা অবস্থায় তিনি দিন রাত মনে করতেন যে, চারিদিক থেকে শত্রুরা তাঁকে আক্রমণ করতে আসছে। একবার তিনি একটা বিলিয়ার্ড খেলার বল ছুঁড়ে আর একটি পাগলের মাথায় মেরে তাকে খুন করে ছিলেন আর কি! কখনো বা তাঁর মনে হোতো যে, তিনি বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন। সে সময় তিনি এমন সব বড়লোকী চাল ছাড়তেন যা দেখে হাসি সামলানো দায় হোতো। এই সময় তাঁর মেজাজটা একটু ভাল থাকতো। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি বড়লোকী মেজাজে কাটাচ্ছিলেন এবং এই মেজাজটা থাকতে থাকতে মৃত্যু এসে তাঁর সমস্ত যন্ত্রণার অবসান কোরে দিয়ে গেল। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুলাই তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়।

১ম বর্ষ] ১৩৩০ [১০ম সংখ্যা
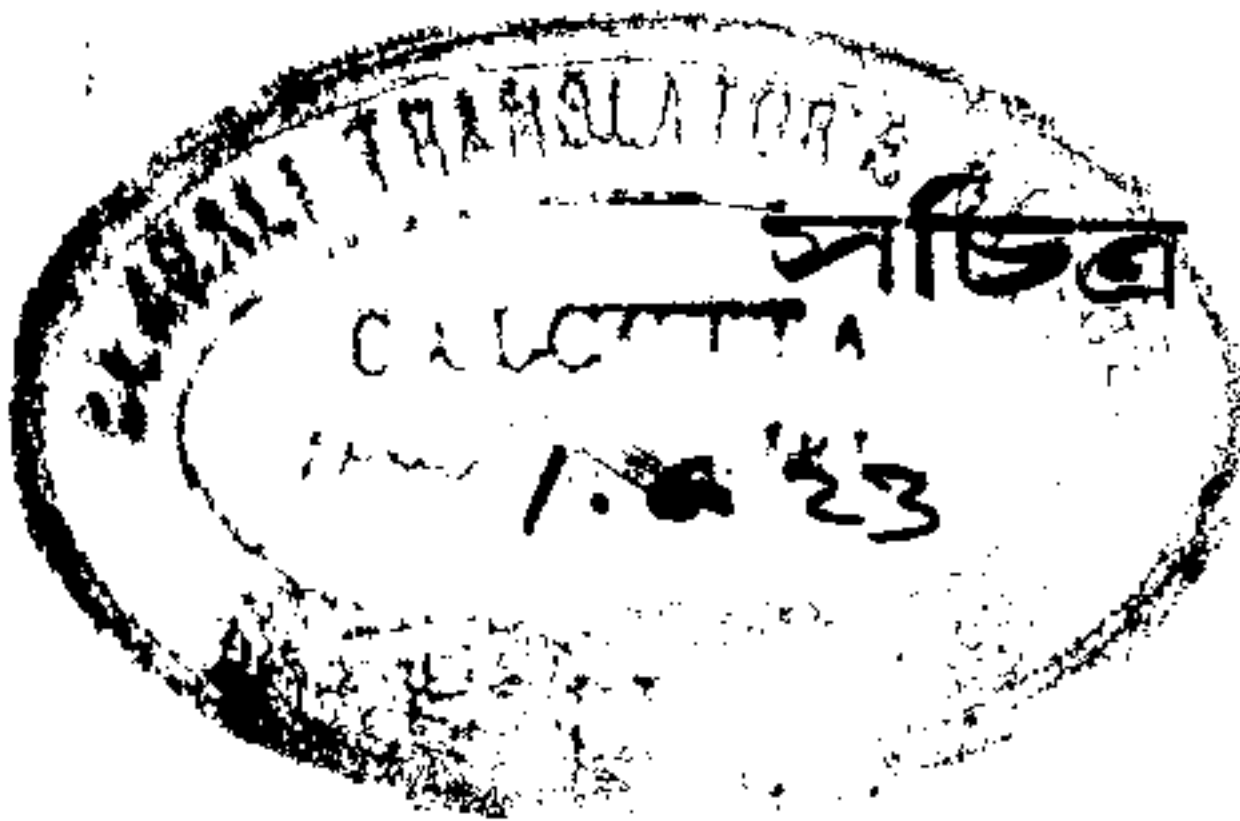
বৈঠক

সচিত্র পাক্ষিক পত্র

কার্য্যালয়
২০৮।২এফ, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রতিসংখ্যা
এক আনা

বার্ষিক মূল্য ২৵০
দুই টাকা দুই আনা।

১ম বর্ষ] ১৫ই বৈশাখ, ১৩৩০ [১০ম সংখ্যা

স্ফাটকথা

রাশিয়া থেকে প্রায়ই সংবাদ আসে যে, সেখানকার লোকেরা খেতে পাচ্ছে না, শীতে তাদের ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে, আরও অনেক রকম সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, যে সব কথার আলোচনায় সন্ধ্যের আড্ডাটি বেশ সরগরম হোয়ে ওঠে। সে সকল সংবাদ সত্য হোতে পারে, মিথ্যাও হোতে পারে ; সত্য মিথ্যায় জড়ান হোতে পারে। তার মধ্যে সত্য কথা বেশী কি মিথ্যাকথা বেশী তাও বোঝবার উপায় নেই। যাঁদের হাত দিয়ে এ সব সংবাদ আমরা পাচ্ছি, তাঁরা যে হরিশ্চন্দ্র নন, তার প্রমাণ আমরা একাধিক বার পেয়েছি, কাজেই সংবাদগুলি গ্রহণ করবার আগে একটু নুনের ছিটে না দিয়ে গ্রহণ করতে মন চায়-না।

রাশিয়ার সংবাদ সত্য হোক আর মিথ্যা হোক, সংবাদগুলি এমন ভাষায় প্রকাশ করা হয় যে, তা পড়ে আমরা আঁৎকে উঠি। এ ব্যাপারে সংবাদদাতা ও গ্রহীতা দুই দলেরই বাহাদুরী আছে। যাঁরা সংবাদ পাঠান তাঁরা এমন ভাষায় তাকে সাজিয়ে তোলেন যে, তা পড়লে মানুষের মন স্বতঃই আঁৎকে না উঠে থাকতে পারে না। আর আমরা অর্থাৎ সংবাদ যারা পড়ি তারা আঁৎকে উঠি বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। আমরা মানুষ কিনা, তাই মানুষের প্রতি আমরা ঐটুকু কর্ত্তব্য কোরেই খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ি।

কলকাতার সহরে যাদের বাস, তাঁদের মধ্যে ক-জন লোক জানেন তা বলতে পারি না, একবার যদি তাঁরা চেষ্টা করেন তা হোলে অতি সহজেই জানতে পারেন যে, সহরে কত হাজার লোক গৃহহীন! রাত্রি বারোটার পর যদি কেউ হাওড়া পুলের পরের রাস্তায় বেড়াতে বের হন, তা হোলে তিনি দেখতে পাবেন যে, ফুট-পাথের দু-ধারে কাতারে কাতারে লোক পড়ে

ঘুমোচ্চে। এই সব লোক কোথা থেকে এল, কোথায় তাদের জন্ম, কে তাদের পিতা মাতা, কোথায় এবং কি উপায়ে তাদের খাওয়া চলে, প্রত্যহ খাওয়া পায় কি না, যদি কেউ এ সংবাদ জানতে চেষ্টা করেন তা হোলে বুঝতে পারবেন যে, এখানকার অবস্থা রাশিয়ার অবস্থার চেয়ে কোনো অংশেই ভাল নয়।

——

আমরা শীতের দিনে দেখেছি, এরা সেই হিমে উদার আকাশের তলায় নিরাবরণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কেউ বা শতচ্ছিন্ন পরণের বস্ত্রখানি খুলে সর্ব্বাঙ্গে মুড়ি দিয়েছে, কেউ বা ময়রার দোকানের উনুনের মধ্যে আধখানা দেহ প্রবেশ করিয়ে দিয়ে শীত নিবারণ করছে। দশ বছর আগে যে দৃশ্য দেখেছি এখনও সেই দৃশ্য দেখ্‌ছি। আজ রাশিয়ার দুঃখ দুর্দ্দশার সংবাদ সংবাদপত্রে যে রকম ইনিয়ে-বিনিয়ে লেখা হচ্ছে, এখানকার কোনো সংবাদ পত্র এই সহরের এই দুর্দ্দশার কথা তেমন কোরে প্রকাশ করে-নি। আমাদের দেশের বড় বড় দাতাকর্ণদের কর্ণে এই সব গরীবদের হাহাকার কখনো পৌঁছয় না।

——

এই তো সহরের অবস্থা। পল্লীগ্রাম অর্থাৎ "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি"র অবস্থা আরও শোচনীয়। সেখানে শীত গ্রীষ্মে সমান জলকষ্ট। ব্যাধি, মৃত্যু, অনাহার, অজ্ঞতা সেখানে রাশিয়ার চাইতে কম নেই। সব থেকে বড় দুর্দ্দশার কথা এই যে, সেখানকার লোকেরা বেশ সন্তুষ্ট চিত্তে জীবন যাপন করছে। ভারতবর্ষের একজন গবর্ণর জেনারেল এঁদের এই অবস্থা দেখে কুমীরের কান্না কেঁদে বলেছিলেন—The pathetic contentment of the starving millions. সে গবর্ণর জেনারেল চলে গেলেন, কত গবর্ণর জেনারেল এলেন আর লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়ে দেশে গেলেন কিন্তু এখানকার অবস্থা ঘুচ্‌ল না।

——

অবস্থা ঘোচাবার চেষ্টা না করলে প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়-না। আজ অসহযোগীদের একদল স্বেচ্ছাসেবক প্রতিজ্ঞা করছেন মৃত্যু পর্য্যন্ত নিরুপদ্রব থেকে আইনভঙ্গ করবেন বলে, আর একদল চেষ্টা করছেন কাউন্সিলে ঢুকে ইঞ্জিনের কল বিগড়ে দেবেন বলে। কিন্তু আজ যদি লক্ষ স্বেচ্ছা সেবক একদিনে জালিয়াঁবাগের মত আর কোনো বাগে প্রাণ দেয় অথবা একদল গিয়ে সত্যই যদি শাসনযন্ত্রের ইঞ্জিনটা বিগড়ে দিতে পারে তা হোলে দেশ থেকে জল কষ্ট, ব্যাধি, অজ্ঞতা দূর হবে কি?

——

পাঞ্জাবে হিন্দু মুসলমানে প্রেমটা বড় বিশ্রী আকার ধারণ করেছে। নেতারা বলছেন যে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ এত বেড়েছে যে,

কেউ কাউকে সহ্য করতে পারছে না। তাঁরা এক বৈঠক কোরে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা প্রেমের বন্ধন স্থাপন করতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাতে তাঁরা কৃতকার্য্য হোতে না পেরে ফিরে গিয়েছেন। বৈঠক কোরে যদি প্রেম স্থাপন করা যেত তা হোলে আজকের নেতাদের আর এ কাজে হাত দিতে হোতো না। কারণ এ সম্পর্কে এত সভা সমিতি বৈঠক ইতিপূর্ব্বে হোয়ে গেছে যে, এতদিনে সে প্রেম বেশ নিবিড় হোয়ে উঠ্‌ত। বৈঠক কোরে এ জিনিষ হয় না বার বার সে কথা প্রমাণিত হোয়ে গিয়েছে।

হিন্দুই হোন আর মুসলমানই হোন, ধর্ম্মের গোঁড়ামী না ছাড়তে পারলে এ প্রেম স্থায়ী হওয়া কথনো সম্ভব নয়। দেশের স্বার্থের পায়ে যদি লৌকিক ধর্ম্মকে বলি দিতে পার তবেই এ প্রেম সম্ভব তা না হোলে ওসব কথা তোলাই বৃথা। আমাদের নেতারা যে এই সহজ কথাটা বোঝেন না এমন কথা বলে তাঁদের বুদ্ধির ওপর কটাক্ষ করতে সাহস করি না, তবে এই অতি সত্য কথাটি প্রকাশ কোরে বলবার সাহস যে কারো নেই সেটা অতিশয় ভয়ে ভয়ে প্রকাশ করতে হচ্ছে। কথাটা শুনতে যতই অপ্রিয় হোক না কেন, এটা সত্য কথা। চাণক্য-শাস্ত্রে যদিও অপ্রিয় সত্য বলতে বারণ করা হয়েছে, তবুও ঘটনাচক্র এমন অবস্থায় পৌঁচেছে যে, এ কথা প্রকাশ না কোরে আর উপায় নাই।

প্রেম পরীক্ষা

দক্ষিণ আমেরিকার সুন্দর সন্ধ্যা। পরিষ্কার নক্ষত্রখচিত আকাশের নীচে জুয়ান গার্সিয়া একটি বাড়ীর বাইরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। ঐ বাড়ীতে থাকে কুমারী জুয়ানীতা। গার্সিয়ার সঙ্গে জুয়ানীতার পরিচয় নেই,—তবু গার্সিয়া দাঁড়িয়ে আছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্চে, রাস্তা দিয়ে বিচিত্র জন প্রবাহ চলে যাচ্চে, চারিদিকের বাড়ীর জানালা দিয়ে বাতির আলো ঠিক্‌রে এসে রাস্তায় পড়ছে, কত তরুণ তরুণী বারান্দার রেলিং ধরে গল্প করছে, গার্সিয়ার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই—আর এই যে সে এম্নিভাবে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকেও কারো দৃষ্টি নেই।

এ ত সে দেশে নূতন কিছু নয় কিম্বা অদ্ভুতও কিছু নয়। দক্ষিণ আমেরিকার উরুগুয়ে প্রদেশে সন্ধ্যার পর এই মধুর দৃশ্যের অভিনয় হয়ে যাচ্চে—সে দেশের তরুণ সম্প্রদায় এম্নিভাবে রাতের পর রাত তাদের প্রিয়ার প্রতীক্ষা করে থাকে।

একটা সপ্তাহ কেটে গেল, আজ পর্য্যন্ত জুয়ানীতা গার্সিয়ার দিকে ফিরে চাইলে না—বাক্যালাপ ত দূরের কথা। প্রতিদিন সে যায়—জুয়ানীতার পিছু পিছু ধীরভাবে,

বিনীতভাবে তার বাড়ীর দুয়ার পর্য্যন্ত চলে আসে—তারপর অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। দূরে গির্জ্জার ক্রুশে বিদ্যুতের আলো ঝিল্‌মিল্ করে ওঠে, আর তার পেছনে ট্রামগাড়ী আলোকে জ্বল্ জ্বল্ করতে করতে ছুটে যায়।

সাতদিন পরে জুয়ানীতা তার দিকে চেয়ে একটু হেসেছে—সুতরাং আশা আছে। পর দিন মাথা নেড়ে অভিবাদন জানালে, তারপর কথা ফুটল।

তারপর ছ-মাস কানাকানি আলাপের পালা! সেগুলি সহজ কথা? জুয়ানীতা থাকবে তার ঘরের বারান্দায় থামের আড়ালে আর গার্সিয়া থাকবে রাস্তার কোন ল্যাম্প পোষ্টে হেলান দিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে!

ছ-মাস অগ্নি-পরীক্ষার পর অন্তরের ব্যাকুলতা যখন তীব্র হয়ে আসবে, তখন জুয়ানীতা বেশ করে প্রসাধন করে, কুচকুচে কালো চুলের বেণী এলিয়ে দুয়ারের কাছে নেমে আসবে,—মাত্র একটি ঘণ্টার জন্য—এই একটি ঘণ্টা গার্সিয়া তার আনন্দের স্বর্গ হাতের কাছে পেয়ে—

ভুবন ছাঁকিয়া তাহার লাগিয়া
আনিবে প্রেমের ভাষা,
সোহাগে আদরে হাতখানি ধরে
জানাইবে ভালবাসা!

জুয়ানীতার মা, বাবা, ভাই বন্ধু যে কেউ সে পথ দিয়ে যাক না কেন দরজার আড়ালে ঐ তরুণ তরুণীর দিকে কেউ দৃষ্টিপাত করবে না। তাদের দেখতে পাওয়াটা সে দেশে নিতান্তই অভদ্রতা!

* *

দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেল জুয়ান গার্সিয়ার মা বাবা জুয়ানকে সঙ্গে করে সামাজিক নিয়মানুসারে জুয়ানীতার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন। সাদর সম্ভাষণ, আদর অভ্যর্থনা চল্ল, জুয়ানীতার পরিবারের সকলের সঙ্গে এদের পরিচয় হয়ে গেল। এদের আসার কথা আগেই জানা ছিল কাজেই জুয়ানীতার মামা, মামী পিসি, খুড়ো জ্যেঠা, নিকট, দূর সকল রকম আত্মীয়েরা এসে জুটেছেন। সমবেত সকলে তখন ঘিরে বসে 'মাটে' পাতার রস (চায়ের মত) রূপোর চামচ দিয়ে পান করলেন। এই সামাজিক অনুষ্ঠানটি আগাগোড়া বাহ্যিক নিয়ম আচারে পূর্ণ।

এর পর সপ্তাহে একদিন করে গার্সিয়া এ বাড়ীতে আস্‌তে পারে। দুয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে প্রেমের অভিনয় আর নয়। এখন থেকে জুয়ানীতার সঙ্গে গার্সিয়াকে আর একলা থাকতে দেওয়া হবে না—জুয়ানীতার মা, ভাই, বোন, বা আর কোন আত্মীয় সব সময় সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। গার্সিয়া ইচ্ছা করলে জুয়ানীতাকে নিয়ে থিয়েটার কিম্বা বায়স্কোপ দেখতে যেতে পারে, কিন্তু যার খুসি একজন সঙ্গে যাবে। পাকা দেখার (enga-

gement) পর তুজনকে পাঁচ মিনিটের জন্যও আর নিভৃতে থাকবার উপায় নেই।

এই কঠোর অগ্নি-পরীক্ষার পর জুয়ানীতার সঙ্গে গার্সিয়ার বিয়ে হয়ে গেল।

এম্নিভাবে এত কষ্ট করে একটা বিয়ে বাগাতে হয় বলে সে দেশের বিয়ে বড় ভাঙে না। এমন ঝকমারী করে যদি বিয়ে করতে হত তবে আমাদের দেশের অনেক যুবকেরই আইবুড় থাকতে হোতো। এমন অসীম ধৈর্য্য যে কারোই নেই একথা বলতে পারি না—তবে তেমন দৃষ্টান্ত বিরল!

— ভানু —

চীনা বিনয়

একজন সম্পুর্ণ অপরিচিতের কাছে চিঠি লিখতে হলে একজন চীনাম্যান আরম্ভ করবে—'হে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা! মানব জীবনের যত সুখ স্বচ্ছন্দতা সব আপনার উপর বর্ষিত হউক, ইহাই আপনার নিরীহ তুর্বল কনিষ্ঠের একান্ত অভিপ্রায়।'

নিজের পরিবারের সম্বন্ধে কোন কথা বলতে গেলে আমাদের দেশে অতি বিনয়ী কেউ কেউ যেমন বলে থাকেন—'আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট'—সেই রকম তারাও বলে—'আমরা ক্ষুদ্র পিপীলিকা।'

খামের ওপর লিখবে—'আমার সামান্য কুটীর হইতে আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতার গৌরবময় মুক্তার প্রসাদে পৌছে।' আমাদের দেশে মুসলমানদের কথায়বার্ত্তায় এমন বিনয় প্রচলিত আছে—যেমন—'মেরা গরীবখানা, আপ্‌কা দৌলতখানা।'

তারপর,—

'মহামহিম মহাপ্রাণ উদার জ্যেষ্ঠভ্রাতা যিনি সম্মানের উচ্চস্তরে ধাপে ধাপে উঠিতেছেন তৎসমীপে—'

বিনয়ের চূড়ান্ত সীমা দেখা যায় চিঠির শেষভাগে—"নিম্ন স্বাক্ষরকারী, আপনার একান্ত বাধ্য মর্কট, মহামহিমের কৃপালাভাকাঙ্খায় হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছে যে, মহাত্মা দয়াপরবশ হইয়া এই হত দরিদ্রের জীর্ণগৃহে পদার্পণ করিয়া পিপীলিকাদিগকে ধন্য করিবেন।'

তারপর বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইবেন তিনি যিনি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অক্ষরে নাম স্বাক্ষর করতে পারবেন—সে স্বাক্ষর অবোধ্য হোক তাতে ক্ষতি নেই।

—"ভানু"—

ভবিষ্যতের জীবন-সঙ্গিনী

একজন বিশিষ্ট অভিজ্ঞ বিবাহিত ব্যক্তি জানিয়াছেন যে, ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গিনীকে বেছে নেবার আগে মেয়ের মার দিকেই

বিশেষ নজর রাখা দরকার। এই নিয়মে কাজ করলে ভবিষ্যতের পারিবারিক জীবন দুঃখময় হবার সম্ভাবনা কম।

সম্মুখে যে দীর্ঘ কর্ম্মময় জীবন পড়ে আছে, বিয়ের আগে সে কথা ভুলে গেলে চলবে না—কারণ এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে মেয়ের স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটবেই ঘটবে,—তখন দেখতে পাবে যে, সে তার নিজের মত হয়-নি—তার মার মত হয়েছে!

বর্ত্তমান দেখে যদি বিয়ে করতে হয় তবে ত পত্নী নির্ব্বাচন সোজা। কিন্তু যদি তুমি তোমার সঙ্গিনীটি ভবিষ্যতে কেমন হবে তাই জানতে চাও, তবে তার মায়ের দিকে তাকাতে হবে। মায়ের চরিত্র যদি সুন্দর এবং মধুর হয় তবে তুমি নিশ্চিন্ত হতে পার এই ভেবে যে, ঐ বয়সে তোমার পত্নীটিও ঐ রকমের হবে।

আর একটা কথা জেনে রাখা ভাল,—বাইরের সাজ পোষাক কিম্বা রূপের মোহে ভুলে কখনো বিয়ে করতে যেয়ো না। মেয়ে দেখার প্রথা আমাদের দেশে আছে কিন্তু সেটা কোন কাজের দেখা নয়। মেয়েকে সাজিয়ে গুজিয়ে একটা জড়পিণ্ড কাপড়ের পুঁটুলী তৈরী করে দশজন অপরিচিতের সামনে এনে হাজির করে দিলে বলির ছাগ শিশুর মত ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকাই তার পক্ষে স্বাভাবিক, নিতান্ত সাহস যার বেশী সে দু-এক কথার জবাব দিতে পারে। এই থেকে আগন্তুক ভদ্রলোক মেয়ের বাপই হোন, আর ভ্রাতাই হোন—মেয়ে সম্বন্ধে সঠিক কোনো ধারণাই করতে পারেন না—তিনি এই টুকুই শুধু বুঝতে পারেন যে, মেয়েটি দেখতে কেমন, কালো কি ফরসা কানা কি খোঁড়া, কালা কি বোবা—এই পর্য্যন্ত। তার আসল যে জিনিষটি স্বভাব—পরিবারের সুখ দুঃখ যার ওপর নির্ভর করে, সে জিনিষটি দেখা হয়ে ওঠে না।

সে জিনিষটি দেখতে হলে তাকে স্বাভাবিক অবস্থায়, সে কি ভাবে চলা ফেরা করে, তাই দেখতে হবে,—তাকে কেউ দেখছে এ কথা সে টের পেলে হুঁসিয়ার হয়ে যাবে, আর লজ্জার আবরণে তার স্বভাবটা ঢেকে ফেলবে; কাজেই সে যেন জানতে না পায় এম্নিভাবেই লুকিয়ে লুকিয়ে সব দেখতে হবে।

খোঁজ নিয়ে দেখবে বেলা কয়টা পর্য্যন্ত সে ঘুমোয়, কাপড় চোপড় গায় ঠিক থাকে কি না, চুলগুলো বেশ পরিপাটি করে রাখে না এলোমেলো হয়ে যায়, কাপড় জামা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে কি না, গায়ে হাতে পায়ে ময়লা জমে থাকে কি না? আর সবার ওপর দেখতে হবে সে তার মায়ের সঙ্গে কি ভাবে কথাবার্ত্তা বলে,—যদি সে তার মায়ের সঙ্গে খিট্‌খিট্ করে, কথায় কথায় রুক্ষ জবাব দেয়, ঠিক জানবে সে তোমাকে খাতির করবে না—কারণ স্বভাব যায় না মলে।

কিন্তু যদি তুমি দেখতে পাও যে সব সময় সে বেশ পরিপাটি হয়ে থাকে, চুলগুলো এলোমেলো হয় না, কাপড় জামায় ধুলোকাদা লাগে না, গা-হাত-পা নোংরা নয়, মুখে সব সময় হাসি লেগে আছে, মায়ের সঙ্গে কথা বলতে হেসে হেসেই কথা বলে, মা রাগ করে কোন কথা বললেও সে নীরবে হাসি মুখেই তা সহ্য করে যায়, মাকে সকল কাজে সাহায্য করে, ভাই-বোনদের সঙ্গে দুষ্টুমী করে, কিন্তু তাদের ভালবাসে খুব—এমন রত্ন যদি পাও—দেখতে সে সুন্দরী না হোক আমি তাকে রত্নই বলব—অমন রত্ন হেলায় হাত ছাড়া কোরো না।

—ভানু—

বিধি ও বিধাতা

(গল্প)

(১)

শ্রীকান্ত সেদিন অনেকক্ষণ ইতস্তত করে অনেকবার সামনের বারান্দাটায় পায়চারি করে শেষে যা থাকে অদৃষ্টে বলে একেবারে সুরমার বাবা গজেন বাবুর বসবার ঘরে ঢুকে পড়ল এবং কোনও রকম ভূমিকা না করেই বলে ফেল্লে—আমি আপনার কন্যার পাণি প্রার্থী।

গজেন বাবু তখন ঘরের মধ্যে এক-খানা ইজি চেয়ারে বসে তাঁর অতি প্রিয় কবি ওয়র্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্যগ্রন্থ পড়ছিলেন। শ্রীকান্তর কথা শুনে বইখানি মুড়ে চশমাটি খুলে তার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন—তোমার কথা শুনে আমি আজ খুব খুসি হলুম। তুমি সব রকমেই আমার কন্যার যোগ্য পাত্র, কিন্তু এ বিবাহে একটা বাধা আছে শ্রীকান্ত!

শ্রীকান্ত চম্‌কে উঠে বল্লে—সে কি! কি বাধা রয়েছে জিজ্ঞেস করতে পারি?

গজেন বাবু তাঁর সামনের চৌকীখানা দেখিয়ে দিয়ে গম্ভীর ভাবে বল্লেন—এইখানে বোসো। তোমাকে স্পষ্ট করে সব কথা বলছি শোনো—

শ্রীকান্ত যন্ত্রচালিতের মত নির্দিষ্ট আসনের ওপর গিয়ে বসল, গজেন বাবু অধিকতর গম্ভীর কণ্ঠে বল্লেন—আমরা যে ব্রহ্মের উপাসক এ কথা বোধ হয় তোমার অবিদিত নেই! কিন্তু তুমি পৌত্তলিকের সন্তান। আমার কন্যাকে গ্রহণ করতে হলে তোমাকে আমাদের স্বধর্ম্মে দীক্ষিত হতে হবে।

—কেন গজেন বাবু, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী স্ত্রী-পুরুষের কি বিবাহ হতে পারে না?

—সে হতে পার্‌তো, যদি এদেশে সেরূপ কোনও বিবাহ বিধি প্রচলিত থাকতো। তা যখন নেই, তখন হয় তোমাকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হতে হবে, নয়ত হিন্দুমতে পত্নী গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু আমার কন্যার বিবাহ যে

শেষের মতে হতে পারে না, এ কথা আশা করি তোমাকে আর দ্বিতীয়বার বলবার প্রয়োজন হবে না।

আচ্ছা, আমি যদি আমাদের বিবাহ তিন আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রী করে নিই তাহলে তো আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ না করেও সুরমাকে বিবাহ করতে পারি।

—পারো ; কিন্তু আমি সে সর্ত্তে তোমাকে কন্যা সম্প্রদান কর্ত্তে প্রস্তুত নই। পৌত্তলিকতার পঙ্কিলতা ধুয়ে মুছে তুমি যদি নির্ম্মল হতে না পারো, তাহলে সুরমাকে লাভ করবার আশা হৃদয়ে পোষণ কোরো না।

—বেশ আমি তাহলে পবিত্র খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে আমার পৌত্তলিকতার পাপ প্রক্ষালন করে আস্‌বো—

—কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ শ্রীকান্ত যে, আমি ও আমার কন্যা খৃষ্ট সমাজভুক্ত নই সুতরাং আমাদের সমাজের বাইরে এ বিবাহ হতে পারে না।

—আপনাদের সমাজ কি এত অনুদার ?

—এখানে তো উদারতার কোনও প্রশ্ন আসছে না এটা হচ্ছে যে সমাজ বিধি। আমি যে সম্প্রদায়ভূক্ত এবং যে সমাজের মধ্যে বাস করছি তাকে যদি অস্বীকার করি বা তার বিধি নিয়ম যদি অগ্রাহ্য করি তাহলে আমার পক্ষে সেটা সমাজের শত্রুতা সাধন করা হবে। প্রত্যেক সমাজের লোকই যদি তাদের স্ব স্ব সমাজকে না মেনে চল্‌তে চায় তাহলে যে আর সমাজের বন্ধন থাকে না, শৃঙ্খলা থাকে না।

এই সময় সুরমা ঘরে ঢুকে বল্লে—বাবা আপনার জলখাবার আনবো কি ? শ্রীকান্ত সুরমাকে দেখেই উত্তেজিত ভাবে বল্লে —বেশ আমি তবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে ব্রাহ্মমতেই সুরমাকে গ্রহণ করতে সম্মত হচ্ছি। বলে সে সুরমার একটা হাত ধরে গজেন বাবুকে প্রণাম করলে। গজেন বাবু তাদের মাথায় হাত রেখে বল্লেন — উত্তম, তোমরা আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

(২)

শ্রীকান্ত ও সুরমার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবার পরদিন গজেন বাবু বল্লেন—শ্রীকান্ত, আজ তোমাদের বিবাহটা রেজেষ্টারী করে এস।

শ্রীকান্ত আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—কেন ! রেজেষ্টারী করার তো আর কোনও প্রয়োজন নেই। আমি তো ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করে ব্রাহ্মমতে ও ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করেছি।

—তাহোক, তবু রেজেষ্টারী করে রাখা ভাল, আইনের চক্ষে তাহলে তোমাদের এই বিবাহ সুসিদ্ধ হয়ে থাকবে।

—ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করাটা তাহলে বে-আইনী ব্যাপার বলুন !

—আহা তা কেন, তুমি নিতান্ত বালক

দেখছি। বলি, ভবিষ্যতে যদি কোনরূপ বৈষয়িক গোলযোগ উপস্থিত হয়, রেজেষ্টারীটা করা থাকলে আর কোনও হাঙ্গামা নেই।

—বৈষয়িক গোলযোগই বা উপস্থিত হবে মনে করেছেন কেন? পূজ্যপাদ আচার্য্যের সম্মুখে অসংখ্য নিমন্ত্রিত ভদ্রমণ্ডলী ও ভদ্র মহিলাদের সম্মুখে ভগবানের নাম নিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করে আমি যখন আপনার কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেছি তখন তো এ বিবাহ আর আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারবো না।

গজেন বাবু দু-একবার ঢোক গিলে একটু যেন কুণ্ঠিত হয়ে বল্লেন—বলি, আমরা না হয় অস্বীকার নাই করলুম, কিন্তু দেশের রাজবিধি যে সেটা মানবে না তার কি উপায় করছ?

—আমাদের ধর্ম্ম-বিবাহ যদি বৈদেশিক রাজবিধি না মান্‌তে চায় তাহলে আমরা সে বিধিকেই অগ্রাহ্য করবো বিধাতাকে অস্বীকার করবো না।

—কিন্তু সংসারে থাকৃতে হলে এবং বিদেশী রাজার অধীনে বাস করতে হলে তার বিধিকে অগ্রাহ্য করাটাতো ঠিক বুদ্ধিমানের কাজ হবে না শ্রীকান্ত!

—বুদ্ধিমানের কাজ না হলেও অন্তত সেটা অমানুষের কাজ হবে না, আপনি একজন পরম নিষ্ঠাবান সত্যাশ্রয়ী ভক্ত ব্রাহ্ম, আপনি কি আমাকে উপদেশ দেন যে, আমাদের এই পবিত্র মিলনটি রেজেষ্টারী করাতে গিয়ে আমি কাপুরুষের মত আমার ধর্ম্ম ও ঈশ্বরকে অস্বীকার করে আসবো! জীবনের এই নূতন পথে চলতে গিয়ে যাত্রার প্রারম্ভেই আমি এত বড় একটা অসত্যকে অবলম্বন করবো!

গজেন্দ্র বাবু এবার অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বল্লেন—তোমার ধর্ম্ম ও ঈশ্বরকে আমি অস্বীকার করতে বলছি না শ্রীকান্ত! আমি চাচ্ছি যে, আইনের চক্ষে আমার কন্যা তোমার উপপত্নী বলে পরিচিত না হয় এবং তোমাদের সন্তান যাতে জারজ বলে উল্লিখিত না হয় তারই একটা সুব্যবস্থা করা?

শ্রীকান্ত গভীর আক্ষেপের সঙ্গে বল্লে—স্বধর্ম্মে আপনার একটুও আস্থা নেই দেখে আশ্চর্য্য হলুম গজেন্দ্র বাবু! অথচ আপনারই একান্ত সনির্ব্বন্ধতায় আমি আপনার ধর্ম্মকেই সত্য বলে গ্রহণ করেছি, কারণ আমি বিশ্বাস করি যে, যে কোনও ধর্ম্মেরই আন্তরিক অনুসরণ করলে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে পৌঁছোতে পারা যায়। বিভিন্ন ধর্ম্মমত সেই পরম ব্রহ্মের মন্দিরে গিয়ে ওঠবার বিভিন্ন পথ মাত্র! সে যাই হোক এখন আপনাকে আমি দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, সত্য উত্তর দিন—আপনি কি সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন?

—হ্যাঁ, সর্ব্বান্তকরণে!

—তাহলে, আমাদের এই বিবাহ যে তাঁর

চক্ষে কিছুমাত্র অবৈধ নয় এ কথাটা আপনি সর্ব্বান্তঃকরণে মানতে পারছেন না কেন ?

—কারণ আমি একজন সামাজিক জীব, এবং কতকগুলি রাজবিধির অধীন বলে !

—তাহলে বিধাতার চেয়ে বিধিই আপনার কাছে অধিক মান্য ?

—আমিও দুই-ই সমান ভাবে মানি !

—অর্থাৎ আপনি কোনোটাই মানেন না ! কারণ বর্ত্তমান অবস্থায় একটাকে মানতে গেলে আর একটা অস্বীকার করা ছাড়া আর অন্য উপায় নেই ! যাই হোক আপনার শোচনীয় অবস্থা দেখে আমি বড়ই দুঃখিত। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ আমার স্ত্রীকে উপপত্নীর আখ্যা দিলেও এবং আইন আমার পুত্র কন্যাকে জারজ নামে অভিহিত করলেও আমি আমার ধর্ম্ম ও বিধাতাকে অস্বীকার করে কোনও দিনই এ বিবাহ রেজেষ্টারী করাবো না জানবেন। এই বলে শ্রীকান্ত যখন ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল গজেন্দ্র বাবু তাকে ডেকে বল্লেন—তাহলে এটাও তুমি জেনে যাও শ্রীকান্ত যে, আমি জীবিত থাকতে আমার কন্যা কোনও দিনই তার ওই আইনের চক্ষে অবৈধ স্বামীর সাহায্য করবে না। যতদিন না তুমি বিবাহ রেজেষ্টারী করাতে সম্মত হচ্ছ, ততদিন সুরমা আমার এখানেই অনূঢ়া কন্যার মতই অবস্থান করবে বুঝলে ?

ঈষৎহাস্য করে শ্রীকান্ত বল্লে—ভুল করেছেন গজেন বাবু ! আমার স্ত্রী যে চিরদিন তার স্বামীর ছন্দানুবর্ত্তিনী হয়েই চলবে এ বিশ্বাস আমার আছে ! পিতার অন্যায় ও মূঢ়তার সে কিছুতেই অনুমোদন করবে না। এতকাল ধরে দেখে শুনে আমি যে একজন অযোগ্যা নারীকে আমার জীবন-সঙ্গিনীরূপে বরণ করিনি এটা আপনি নিশ্চিত জানবেন।

এই সময়ে সুরমা কি প্রয়োজনে সে ঘরে প্রবেশ করতেই গজেন্দ্র বাবু বল্লেন—সুরমা কোনও কারণে আমার পুনরায় অনুমতি না পাওয়া পর্য্যন্ত এই উদ্ধত অর্ব্বাচীন যুবকের সঙ্গে তোমার সমস্ত সম্বন্ধ আজ থেকে একেবারে ছিন্ন না হক অন্ততঃ বিচ্যুত রাখতে হবে বুঝলে ?

সুরমা কোনও উত্তর দেবার আগেই শ্রীকান্ত বল্লে,—সুরো, তোমার পিতাকে প্রণাম করে আমার সঙ্গে চলে এসো—যেখানে বিধাতার চেয়ে বিধি বড় সেখানে তোমার আর একমুহূর্ত্ত অবস্থান আমি ইচ্ছা করি-নি—বলে শ্রীকান্ত দ্বারের দিকে অগ্রসর হলো !—

ক্রোধে ক্ষোভে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হোয়ে বসে গজেন্দ্রবাবু দেখলে তাঁর কন্যা সুরমা সত্য-সত্যই তাঁকে প্রণাম করে তার স্বামীরই পশ্চাদনুসরণ করলে !

শ্রীমানবেন্দ্র সুর

রং এর ক্ষমতা

ডাক্তারদের মতে রং মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের উপর অদ্ভুত কাজ করে। লাল রংটা ভারী

উত্তেজক। লাল কাগজে মোড়া ঘরে থেকে অনেককেই ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয়েছে। এই লাল রং বদলে সেখানে হল্‌দে, সবুজ কিম্বা পিঙ্গল রংএর ব্যবস্থা করে স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখা গিয়েছে।

ফটোগ্রাফাররা দেখতে পেয়েছেন যে, ডার্ক রুমে (Dark Room) লাল রং ব্যবহার করে করে অনেকের স্বভাব বিগড়ে গিয়েছে, কিন্তু ঐ ডার্ক রুমে লাল আলো বদলে কমলা রং ব্যবহার করে দেখা গিয়েছে যে তাদের ঝগড়াটে, খিট্‌খিটে, অশান্ত স্বভাবের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

ছেলেমেয়েদের ওপরই লাল রংটা কাজ করে বেশী। সাণ্ডে স্কুলের (Sunday School) এক মাষ্টারকে লাল কার্পেটে মোড়া একটা ঘর শিশুদের ক্লাস (Infant Class) করবার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। ফলে ছেলেরা দুর্দান্ত এবং অবাধ্য হয়ে ওঠে! কারণটা অনুমান করে লাল কার্পেটটার বদলে একটা কোমল সবুজ কার্পেট আনা হল। কয়েক দিনের ভিতরেই দেখা গেল ছেলেরা বেশ শান্ত হয়েছে।

ভায়লেট (বেগুনী) রংটা হচ্ছে শোক-দুঃখের নিদর্শন। এর সংশ্রবে কিছুদিন থাকলে মানুষ একেবারে নিস্তেজ অবসন্ন হয়ে পড়ে।

বোলশেবিক গবর্ণমেণ্ট এই মর্ম্ম বুঝতে পেরে কয়েকটা ঘর ভায়লেট রংএর পাথর দিয়ে [illegible] রাজনীতি ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন তাঁদের ধরে এনে ঐ বেগুনী ঘরে আটক করে বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। নীল কিম্বা ভায়লেটের চেয়ে আলো তরঙ্গ যার কম এমন কোন আলোর ধারা সেই ঘরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না—ফল দেখতে পাওয়া যায়, যে একদিন তীক্ষ্ণ খরধার চতুর পালি-টিসিয়ান ছিল, যাঁর ভয়ে গবর্ণমেণ্ট কম্পমান হয়ে উঠেছিল, তাঁর মনের এম্নি দুরবস্থা ঘটেছে যে, কঠিন সমস্যা ত দূরের কথা দৈনন্দিন জীবনের সামান্য বিষয়ের মীমাংসাই করে ওঠবার ক্ষমতা তাঁর নেই।

ঝরোকা-ই-দর্শন

লোকের কাছে নিজকে এবং নিজের বই-গুলিকে সর্ব্বদা জাহির করবার প্রয়োজনীয়তা ভিক্টর হুগো যেমন বুঝতে পেরেছিলেন তেমন আর কেউ পারে-নি। তাঁর সম্বন্ধে প্রত্যেক খুঁটি-নাটি খবরটি পর্য্যন্ত সংবাদ পত্রে প্রকাশ করে দিতেন—তাঁর দীর্ঘজীবনের একটা ঘটনাই শুধু তিনি চেপে যেতে চেয়েছিলেন। সে ঘটনাটি এই—বয় ডি বুলোঁতে ঘোড়া ছুটিয়ে যাবার সময় তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিট্‌কে পড়ে যান। এ খবরটা কিছুতেই তিনি সংবাদ-পত্রে প্রকাশ হতে দিতে চান নি! পাছে লোকে তাঁকে অনাড়ি ঘোড়-সোয়ার মনে করে! [illegible]

এ ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে আর যত খবর বেরুত তাতে তিনি খুসীই হতেন। যখন তিনি দেখলেন যে, জনসাধারণ তাঁর দর্শন পাবার জন্ত বড় ব্যাকুল, তাই জীবনের এক অংশে তিনি ছোটখাট কবিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে প্রতিদিন বৈকালে ঠিক একই সময়ে তাঁর বাড়ীর অলিন্দের ওপর এসে দাঁড়াতেন। সমবেত জনমণ্ডলী জয়ধ্বনি করে উঠত আর তিনি মস্তক সঞ্চালন করে তাদের অভিনন্দন সাদরে গ্রহণ করতেন। প্যারীতে বহুদিন পর্য্যন্ত এ একটা দর্শনীয় দৃশ্য ছিল।

আমাদের দেশে মোঘল বাদশাদের সময়ে সমবেত প্রজামণ্ডলীকে সম্রাটগণ প্রসাদের জানালা থেকে এইরূপ দর্শন দান করতেন—ফার্সিতে এই জানলাকে 'ঝরোকা-ই-দর্শন' বলা হত। সম্রাট এসে জানালার পাশে দাঁড়াতেন, আর সমবেত জনসমুদ্র 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' বলে জয়ধ্বনি করে উঠত, আর সম্রাট তাদের অভিনন্দন হস্ত সঞ্চালন করে গ্রহণ করতেন।

এখনো আমাদের কোন কোন জনপ্রিয় ব্যক্তির পায়ের আঙুল মট্‌কাবার খবরটি পর্য্যন্ত সংবাদ পত্রে বেরোয়।

ফিল্ম শিল্পীদের অর্থ

বায়স্কোপের ফিল্মে যাঁরা ছবি দেন সেই শিল্পীদের অনেকেই অগাধ অর্থ অর্জ্জন করেন। সেই অর্থ তাঁরা কি ভাবে খরচ করেন তা জানবার কৌতূহল অনেকেরই হয়।

এই চলনচিত্র-অভিনেতাদের ভিতর মিস মেরী পিকফোর্ডই সব চেয়ে ধনবতী, তারপর সেসিল ডি মিল্লে, তারপর চার্লি চ্যাপলিস, নর্ম্মা টলম্যাজ এবং মেরী মাইল্‌স মিণ্টার।

মেরী মিণ্টার তার অগাধ ধনের কতকটা একটা ধোলাই কারখানায় খাটাচ্চেন—কালিফোর্ণিয়াতে বিস্তর সম্পত্তিও তিনি করেছেন।

নর্ম্মা টলমেজ নিউইয়র্কের একটা রেস্তোরাঁর আধাআধি মালিক। সেসিল ডি মিল্লে এবং অনিতা ষ্টুয়ার্ট তেলের কারবারে টাকা খাটিয়ে অর্থাগমের নূতন পথ করেছেন।

জ্যাকি কুগান আজকাল কলকাতার বায়স্কোপ দর্শকদের কাছে খুবই পরিচিত। পৃথিবীতে এর চেয়ে ধনী বালক আর নেই। এর মা বাপ এর অগাধ ধনরাশি কাজে খাটাচ্চেন, কাজেই সারাজীবন বসে খেলেও একে কোনদিনই দারিদ্র্যের মুখ দেখতে হবে না। ছেলেমানুষ কিনা, তাই এর নানারকম খেয়াল আছে। যেমন ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতির পিঠে চড়ে বেড়ান—মোটরকার সংগ্রহ—এই সব দিয়ে মস্ত একটি আস্তাবল সে সাজিয়ে রেখেছে।

মিস পিকফোর্ড যে শুধু ধনই সঞ্চয় করছেন তা নয়, স্বাদেশিকতায় তাঁর প্রাণ উদ্বুদ্ধ। আমেরিকার গবর্ণমেণ্টকে এবং লিবার্টি লোনে (স্বাধীনতা প্রয়াসীদের ধনভাণ্ডার)

৪৫,০০, পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকার উপর তিনি দিয়েছেন। চার্লি চ্যাপলিনের অধিকাংশ টাকা নানা ব্যাঙ্কে সুদে বাড়ছে। তা ছাড়া তিনি প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ টাকা খরচ করে একটা বাড়িও তৈরী করেছেন।

মিঃ গ্রিফিথ বোধহয় ইচ্ছা করলে এদের সকলের চেয়ে বেশী অর্থ সঞ্চয় করতে পারতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁর চোদ্দ একর জমি আর তিনটি মাত্র সুটের (পোষাক) বেশি আর কিছুই নেই! গাঁটের পয়সা খরচ করে তিনি নতুন নতুন ফিল্ম তৈরি করেন—ডগ্লাস ফেয়ারব্যাঙ্কেরও এই অদ্ভুত খেয়াল রয়েছে।

লোকের ধারণা, এই অভিনেতা এবং অভিনেত্রীগণ ভোগ বিলাসে জলের মত অর্থ ব্যয় করে থাকেন, কিন্তু এ ধারণা ভুল। অর্থ খরচ করা হিসাবে তাঁরা যে শুধু হুঁসিয়ার তা নয়, কি উপায়ে তাঁদের সেই সঞ্চিত অর্থ সুদে আসলে বেড়ে উঠবে সেদিকেও তাঁদের খেয়াল যথেষ্ট। মিস পিকফোর্ড এখনো নিজে বাজারে গিয়ে নিজের জিনিসপত্র কিনে আনেন। হ্যারোল্ড লয়েডের মত লোকের একখানা ফোর্ড-গাড়ি পর্য্যন্ত নেই—তিনি যান-বাহনে চড়া অপেক্ষা পায়ে হেঁটে চলাই বেশি পছন্দ করেন।

আমাদের সমাজ

সম্প্রতি আলিপুরে একটা মামলা হোয়ে গেছে। খবরটা আমাদের সমাজপতিরা পেয়েছেন কি না জানি না। বৈঠকের পাঠকদের অবগতির জন্য আমরা সংবাদটি প্রকাশ করছি।

কালিন্দী দাসী, মা বাপ বোধ হয় তার দেহের রং দেখেই মেয়ের এই নাম রেখেছিলেন। বয়স তার তেরো বৎসর, সে আদালতে নালিশ করে যে, বিয়ের পর তার স্বামী সেই একবার তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিল। শ্বশুর-বাড়ী থেকে সে সেই যে বাপের বাড়ীতে ফিরে এসেছে, তার স্বামী আর তাকে নিয়ে যাবার নামও করে-না। কিছুদিন অপেক্ষা করবার পর সে তার বাবাকে নিয়ে শ্বশুর-বাড়ী যায়। কিন্তু তার স্বামী দীনবন্ধু সর কার তাকে দরোয়ান দিয়ে রাস্তায় বার কোরে দেওয়ায় সে আবার ফিরে আসে। সে আদালতে তার স্বামীর নামে খোরপোষের জন্য নালিশ করেছিল। সে বলে যে, তার স্বামী বড়লোক তাকে সেই বড়লোকের স্ত্রীর মত থাকতে হোলে মাসে অন্ততঃ পঞ্চাশ টাকা খরচ পড়বে।

দীনবন্ধু সরকারের বাড়ী কলকাতার উপকণ্ঠে ঢাকুরিয়ার গ্রামে। এই ব্যক্তি সত্যিই বড়লোক। কারণ সে আদালতে হাকিমের

কাছে বলেছে যে, কালিন্দী যে সব কথা বলছে তার একটি বর্ণও সত্য নয়। তার মত বড় লোক কি কখনো ঐ রকম একটা কালো মেয়েকে বিয়ে করতে পারে!

কিন্তু হাকিম তার যুক্তি না মেনে কালিন্দীকে মাসে ত্রিশ টাকা খোরপোষের জন্য দিতে হুকুম দিয়েছেন, আর বলে দিয়েছেন যে, যতদিন সে সাবালিকা না হবে ততদিন সে যেন ঐ ত্রিশ টাকাতেই তার খরচ চালিয়ে নেয়।

বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, হাকিম দীনবন্ধুর কথা বিশ্বাস করেন-নি, কালিন্দীর কথাই বিশ্বাস করেছেন। তা না করলে দীনবন্ধুর প্রতি কালিন্দীকে মাসে ত্রিশ টাকা কোরে দেবার হুকুম হোতো না। আমরা আইনের মার প্যাঁচ বুঝি না; কিন্তু সাধারণ বিবেচনায় আমাদের মনে হয় যে, আদালতে মিথ্যা কথা বলার জন্য দীনবন্ধুর কঠোর সাজা হওয়া উচিত ছিল। তাকে দেখে ভবিষ্যতে তার মতন দুর্বৃত্তরা যাতে শায়েস্তা হোতে পারে আদালতের এমন ব্যবস্থা করা উচিত ছিল।

দীনবন্ধুর কথার হালচাল দেখে মনে হয় যে, কালিন্দীর রংয়ের জন্যই তাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করতে তার আপত্তি। দীনবন্ধুর চেহারাটা একবার দেখতে ইচ্ছে করেছে। দীনবন্ধু অথবা তার অভিভাবকেরা যখন বিবাহের স্থির করেন রংয়ের সমস্যার তখনই সমাধান হোয়ে যাওয়া উচিত ছিল। বিবাহের পরে রংয়ের কথা মনে হওয়া ঠিক নয়। আর বিবাহের আগে কালিন্দীকে বর অথবা বরপক্ষের কেউ দেখে-নি এ কথা আমরা কেমন কোরে বিশ্বাস করি, বিশেষ দীনবন্ধুরা যখন ধনী।

আমাদের বিশ্বাস যে কালিন্দীর অভিভাবকেরা তার রংয়ের খেসারতটা বিয়ের সময় ধরেই দিয়েছিলেন। হোতে পারে যে। বর সে রংয়ের কথাটা একেবারেই জানত না। বিয়ের পরে কনের রং দেখে তার ওপরে তার বিতৃষ্ণা হয়েছে।

কালিন্দীকে যদি দীনবন্ধু কখনো গ্রহণ না করে তাহোলে যাতে তার আবার বিয়ে হোতে পারে সমাজের সে রকম ব্যবস্থা করা উচিত।

রোগী—ডাক্তার আমায় দীর্ঘজীবন লাভ করার ঔষধ দাও।

ডাক্তার—তুমি মদ খাও?

রোগী—না

ডাক্তার—সিগারেট?

রোগী—তাও না।

ডাক্তার—তুমি থিয়েটার দেখ?

রোগী—রাত্রি জাগাকে আমি ঘৃণা করি।

ডাক্তার—তুমি দীর্ঘজীবন লাভ কোরে কি করবে বাপু?

মিথ্যে কথার বাজী

বৈশেখ মাসের ঠিক-দুপুরে একদল ছেলে এক গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে মহা কলরব

লাগিয়েছে। হরি বাবু সেই সময় ছাত্র পড়িয়ে বাড়ীতে ফিরছিল। দুপুর বেলা এই ছেলে গুলো লেখাপড়া না কোরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হল্লা করছে দেখে তার পিত্তি চটে গেল, সে একটু এগিয়ে এসে বল্লে—ছোকরারা এখানে দাঁড়িয়ে কি করছ, যাও না বাড়ীতে গিয়ে লেখাপড়া কর-না গিয়ে, তোমাদের কি বাপ-মা নেই।

ছেলেদের মধ্যে একজন একটু মুরুব্বী ভাবে এগিয়ে হরি বাবুকে বল্লে—মশায় আমরা বড় বিপদে পড়েছি—

হরি—কি বিপদ!

ছেলে—এইখানে আমরা একটা টাকা কুড়িয়ে পেয়েছি। টাকাটা সবাই একসঙ্গে দেখতে পেয়েছিলুম, কাজেই কে নেবে সেটা সাব্যস্ত না হওয়ায় আমরা ঠিক করলুম যে আমাদের মধ্যে যে সব থেকে বেশী মিথ্যে কথা বলতে পারবে সে-ই টাকাটা পাবে। আমরা সবাই একটা কোরে মিথ্যে কথা বানিয়ে বলেছি, কিন্তু কারটা যে সব থেকে উঁচিয়ে গিয়েছে তা বিচার করবার লোক খুঁজে পাচ্ছি না। আপনি যখন এসে পড়েছেন তখন দয়া কোরে আমাদের বিচারটা কোরে দিয়ে যান।

ছেলেটীর কথা শুনে তো রাগে হরিচরণের চোখ মুখ লাল হোয়ে উঠ্‌ল।

সে বল্লে—হতভাগা ছেলেরা এই বয়সে এই রকম বুদ্ধি হচ্ছে? তোমাদের বয়সে এ সব কথা আমি ভাবতেও পারি-নি।

হরিচরণের কথা শুনে ছেলেরা একবার পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে; তারপর সেই মুরুব্বীগোছের ছেলেটী হরির হাতে টাকাটা দিয়ে বল্লে—নিন্ মশায়, বাজীটা শেষকালে আপনিই মেরে নিলেন।

মেয়ে গুণ্ডা

বাংলা দেশে ধমক দিয়ে গুণ্ডামি ডাকাতি করা চলে এবং চলেও আসছে তাই। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই গুণ্ডা ও ডাকাতেরা পুরুষ মানুষ। সম্প্রতি এখানে এক অভূতপূর্ব্ব কাণ্ড ঘটে গিয়েছে।

সম্প্রতি হাওড়ার চার্চ্চ রোড দিয়ে একজন বাঙালী বীর বাড়ী ফিরছিলেন, এমন এতওয়ারিয়া ও আমিনা নাম্নী দুজন স্ত্রীলোক তাকে আক্রমণ করে। প্রথমে তারা লোকটীর কাছে টাকা চায়, কিন্তু সে টাকা দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় এতওয়ারিয়া তার হাত-দু-খানা চেপে ধরে আর আমিনা তাকে উত্তম মধ্যম বেশ কিছু দিয়ে তার কাছ থেকে একটা সোনার ছোট তাল ও সাতাশটি টাকা কেড়ে নিয়ে লম্বা দেবার যোগাড় দেখছিল, এমন সময় সেই ব্যক্তির চীৎকার শুনে সেখানে পুলিশ কনষ্টেবল এসে পড়ে। পুলিশ এতওয়ারিয়া ও আমিনাকে গ্রেপ্তার কোরে নিয়ে গিয়েছে। আদালত থেকে তাদের সাজা না দিয়ে পুরস্কৃত করা উচিত।

রঘুনন্দন মোক্তারের অভিনন্দন

গতবারের "বৈঠককে" "কবির ক্রোধ" শীর্ষক একটা সংবাদ বেরিয়েছিল। "সোণার বাংলা"য় কবে দাশুরথী রায়ের ক্রোধের একটা নমুনা বেরিয়েছে। আমরা সেটি উদ্ধৃত কর্‌লুম। তাঁকে একবার একজন মোক্তার "কবিওয়ালা" বলায় তিনি নীচের কবিতাটি লিখে তার জবাব দিয়েছিলেন।

ফেরি করা ফড়ে-তুমি শুট্‌কি
এবং মোক্তার
দণ্ডবিধির ভ্রূ-পাত পড়ে
ছট্‌কে হলে মোক্তার
আইনের যে 'মাইন' তুমি
বেহায়ারি হদ্দ
পুঁচকে আনি মূল্য তোমার
পেঁচি মাতাল বদ্ধ।

প্রাইমারী ফেল, নাইক ভাল
বর্ণমালার জ্ঞানটা
মুখটা তোমার দরাজ বটে
অধিক দরাজ কানটা।
খোস্তা খেকো দন্ত-বিহীন
বৃদ্ধ ঢোঁড়া সর্প
কামড়াতে চায় বিষটা কোথায়
বৃথাই রে তোর দর্প।
শিবের গায়ে ফেলবে থুতু কে
আর তুমি ভিন্ন
চড়াই চেয়ে জিতেন্দ্রিয়,
কেঁচোর চেয়ে ঘৃণ্য।
নর নহ যে বানর তুমি
অধিক কি আর বলবো
চাবুক খেকো মোষের ঘাড়ে
বৃথায় ঘৃত ঢলবো।
সময় পেলে জিভটা এবং কাণটা
তোমার মাপ্‌বো
কাণ মলাটা খেলাৎ দিলাম
যেটা তোমার প্রাপ্য।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে
শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থীর দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বৈঠকের নিয়মাবলী

বৈঠকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ দুই টাকা দুই আনা; ভিঃ পিঃ মাশুল স্বতন্ত্র। প্রতি সংখ্যার জন্য এক আনা। নমুনারও মূল্য লাগে। যে কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া চলে। মূল্য সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়।

রিপ্লাইকার্ড কিংবা টিকিট না পাঠাইলে কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রবন্ধাদি বৈঠকের দুই পৃষ্ঠা বড় জোর আড়াই পৃষ্ঠা অপেক্ষা দীর্ঘ না হয়। টিকিট পাঠাইলে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে কিনা তাহা জানানো হয়। মনোনীত অথবা অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত পাঠান হয় না।

যদি কোন গ্রাহক বৈঠক না পান তো ৭ দিনের মধ্যে আমাদের খবর দেবেন। নচেৎ অপ্রাপ্ত সংখ্যা দাম দিয়া লইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন

মলাটের চারের পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যা—৮৲
অন্যান্য পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যা—৬৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—৩৷৷৹
কলমের প্রতি ইঞ্চি একবৎসরের চুক্তিতে প্রতিসংখ্যা—১৲
কলমের প্রতি ইঞ্চি প্রতিসংখ্যা—২৲
বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়

ম্যানেজার বৈঠক
২০৮।২ এফ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
এজেণ্ট :—শ্রীপরেশনাথ মিত্র
১৩২নং বাগমারি রোড, কলিকাতা

ঘরে ইংরেজ বন্দীদের যে পুরেছিল সে ছাড়া অন্য কেউ দায়ী হোতে পারে না।

ভারত গবর্মেণ্ট প্রকাশ করেছেন যে, যে গাড়ীতে এই কাণ্ড হয়েছিল—সার্জেণ্ট এণ্ডরুজ খালি সেটি থেকে কোনো সুযোগে বন্দী পালাবার উপায় নেই এইটে দেখেই নিশ্চিন্ত হয়েছিল। ঐ গাড়ী মানুষের ব্যবহার্য্য কিনা সেটাও তার দেখা উচিত ছিল। অবশ্য ভারত গবমেণ্ট এই কথা বলে খুব উদারতা দেখিয়েছেন। উদারতার খাতিরে একথাও বলা চলে যে, যে লোকটি ইংরেজ বন্দীদের অন্ধকূপে ঢুকিয়েছিল তার কেবল বন্দী পালাবার পথ নেই এইটুকু দেখেই নিশ্চিন্ত হওয়াটা উচিত হয়-নি, অতগুলো লোককে একটা ঘরে পুরলে তারা বাঁচবে কিনা সেটাও তার বিবেচনা করা উচিত ছিল। কিন্তু যাই হোক যার দোষেই বন্দীরা মারা যাক্ না কেন, মালবারে এবার গবমেণ্টের খরচায় একটা মনুমেণ্ট তৈরি কোরে দিতে হচ্ছে, নইলে লালদাঘির অন্ধকূপের মনুমেণ্টটা আর শোভা পায় না।

পরলোকে মতিলাল

অমৃতবাজারের মতি ঘোষ মারা গিয়েছেন। মতিবাবু বহুদিন থেকেই শয্যাশায়ী হোয়ে কষ্ট পাচ্ছিলেন, মৃত্যু এসে তাঁর সমস্ত যন্ত্রণা লাঘব কোরে দিয়েছে। মতিলাল প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরে অমৃতবাজার পত্রিকার সংস্রবে ছিলেন এবং এই পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি কায়মনবাক্যে অমৃতবাজার পত্রিকা ও দেশের সেবা কোরে এসেছেন। এজন্য তাঁকে বহুবার আদালতে যেতে হয়েছে কিন্তু বরাবরই তিনি সেখানে নির্ভীকতার ও স্পষ্টবাদিতার পরিচয় দিয়ে এসেছেন। মতিবাবুর জীবনের কথা মনে করতে গেলে অনেক কথাই মনে পড়ে। তাঁর অগ্রজ শিশিরকুমারের কথা, মনে পড়ে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও "বেঙ্গলীর" কথা, মনে পড়ে, স্বর্গীয় কালী প্রসন্ন কাব্যবিশারদের এবং আরও অনেকের ও অনেক ঘটনার কথা। তার জীবনের সঙ্গে বাংলা দেশের ও ভারতবর্ষের এই পঞ্চাশ বছরের সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের কথাও মনে পড়ে। দেশের মঙ্গলের সঙ্গে তিনি নিজের মঙ্গলকে কখনো জড়িয়ে ফেলেন নি। তাঁর পরিচালিত পত্রিকাকে ছাপিয়ে তিনি নিজে কখনো বড় হোতে চান-নি। তাই তাঁর সহযোগীরা আজকে কেউ স্যর কেউ বা মন্ত্রী কিন্তু তিনি যে মতি ঘোষ সেই মতি ঘোষই থেকে গেলেন। অমৃতবাজার পত্রিকা ছিল তাঁর প্রাণ, তাই সে পত্রিকা আজ মাদ্রাজী মাড়োয়ারীর হাতে চলে যায় নি। কাঠের টাইপ দিয়ে একদিন যে পত্রিকা ছাপা হয়েছিল সেই পত্রিকার জন্য আজ রোটারী মেশিনের ফরমাস্ দেওয়া হয়েছে। মতিলাল ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম যুগের একজন নেতা ছিলেন। এ যুগের নেতাদের মধ্যে অনেকেই কালের প্রভাবে দেশবাসীর অন্তর থেকে দূরে চলে গিয়েছেন কিন্তু তিনি আমরণ দেশেরই প্রতিনিধি ছিলেন। মৃত্যুর সময়ে তাঁর ৭৫ বৎসর বয়স হয়েছিল। এই দীর্ঘকালের অধিকাংশ সময়ই তিনি দেশের সেবায় কাটিয়ে গিয়েছেন। এই সেবা করতে গিয়ে তিনি নিন্দিতও হয়েছেন প্রশংসাও পেয়েছেন—কিন্তু আজ তিনি নিন্দা ও প্রশংসার অনেক দূরে। আমরা এই পরলোকগত মহান আত্মার তর্পণ করি, স্তুতি করি আর কামনা করি যে যুগে যুগে যেন তাঁর মতন লোক আমাদের দেশে জন্ম গ্রহণ কোরে দেশকে উন্নতির পথে চালিত করে।